পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদ পত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২ প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—রঞ্জন ধর, ভারতীয়, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪ প্রকাশক— ঐ, ঐ

৫ সম্পাদক—অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

৭ পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা —

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনীলকুমার বসু (মৃত), ১৩ এল,মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণকুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, মার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাংশু মৈত্র, (মৃত) ১।১।১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১৩। বিনয় ঘোষ (মৃত) ৪৭।৩, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২। ১২। সত্যজিৎ রায় ফ্ল্যাট ৮, ১।১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, (মৃত). ৪৮৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯।এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬। ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২ বি, সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা' ৫২, গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত) পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবেদিতা দাশ (মৃত), ৫৯বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩সি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা ১৯। ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলকাতা ২০। ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-

৭২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন্দ্র রায়, ১০।৭, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লি। ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বসু (মৃত), ২০০এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা ১৯। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা ৪০। ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি. বি, সি, রোড, জলপাইগুড়ি। ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত), ১৯. ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯। ৩৭। রনজিৎ মুখার্জি, পি, ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা ৪০। ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় ভবন, নয়াদিল্লি। ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, (মৃত) ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা ২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, (মৃত), ১।এ, মহীশূর রোড, কলকাতা ২৬। ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা ৭। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা ২৯। ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১২।১. ব্লক-ও নিউ আলিপুর, কলকাতা ৫৩। ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ১২। ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্লাট-বি-সি-৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা ৬। ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা ৬। ৪৬। বিষ্ণু মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন কলকাতা-১৯। ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২, ১৬, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত (মৃত), ২. যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪৯। সুরেন রায়চৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২।

আমি রঞ্জন ধর এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

স্বাঃ রঞ্জন ধর

২০. ৩. ৯২

পরিচয়

৬১ বর্ষ ৮-৯ সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল ১৯৯২ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৯৮-৯৯

ভ্রম সংশোধন

অনবধানতাবশত পরিচয়-এর বর্ষক্রম ও ক্রমিক সংখ্যা মুদ্রণে ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিচে সঠিক, বর্ষক্রম ও ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হলো —

সংখ্যা	সংশোধিত বর্ষ	ক্রমিক সংখ্যা
আগস্ট—অক্টোবর ৯১	—৬১ বর্ষ	১—৩ সংখ্যা
নভেম্বর—ডিসেম্বর ৯১	—৬১ বর্ষ	৪—৫ সংখ্যা
জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি ৯২	—৬১ বর্ষ	৬—৭ সংখ্যা

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও কার্যালয়/দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

আই. এম. এফ ঋণ—পথের শেষ কোথায়?

পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আই. এম. এফ, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার—এই শব্দ তিনটি গত প্রায় একবছর ধরে ভারতের জনজীবনকে যেভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, ঠিক এমনভাবে সম্ভবত এর আগে আর কখনও করে নি। কারণ, আই. এম. এফ থেকে ঋণ গ্রহণ করার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা নিয়ে নানা আশঙ্কা ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। অথচ এই ঋণ যে এই প্রথম নেওয়া হলো তা নয়। এর আগেও নেওয়া হয়েছে এই ঋণ এবং সেই ঋণের পরিমাণ কম ছিল, তা ও নয়। আই. এম. এফ ছাড়া অন্যান্য আন্ত-র্জাতিক সংস্থা—যেমন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকেও ঋণ নেওয়া হয়েছে। তাহলে এবার এত সোরগোল কেন?

সংক্ষেপে বলা যায়, একদিকে যেমন আছে ভারতীয় অর্থনীতি গত এক দশক ধরে যে সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই ঋণ নেওয়ার যৌক্তিকতা, তেমনি অন্যদিকে আছে এই ঋণ নেওয়া জনিত আনুষঙ্গিক ও অর্থনৈতিক সামাজিক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা, এবং কেন্দ্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব—অর্থাৎ এক সংখ্যালঘু সরকারের অস্তিত্ব। সরকার-বিরোধী সাংসদের সংখ্যা বর্তমান অবস্থায় না থাকলে, আই. এম. এফ ঋণের ব্যাপারে সরকারপক্ষকে এতটা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিতে হতো না। বারংবার সংসদে যতটা, বাইরে তার চেয়ে অনেক বেশি এই ঋণের অবশ্যম্ভাবিতার কথা, এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় অর্থনীতির এক বিরাট ধাপে উন্নীত হওয়ার প্রতিশ্রুতি সরবে ঘোষণা, এই আত্মরক্ষামূলক চিন্তারই প্রতিফলন। অবশ্য অন্য একটা সন্দেহ পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান সরকার, বিশেষত তার অর্থমন্ত্রী নিজেই, এই ঋণ, তার ব্যবহার এবং তার সম্ভাবনা সম্পর্কে যেমন আশঙ্কার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, তেমনি তাঁর সহকর্মীদের মন থেকেও দূর করতে পারেন নি আশঙ্কার কালো মেঘ।

উদ্বেগের কারণ স্পষ্টতই ঋণ নয়—ঋণের পরিমাণ, ঋণের সঙ্গে জড়িত নানাবিধ শর্ত। সেই শর্তাদি মেনে নেওয়ায়, রাজনৈতিক সার্বভৌমতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার যতটা না সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক সংকট ও তজ্জনিত অস্থিরতা সৃষ্টির

সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি। ভারতের মতো দরিদ্র ও জনবহুল দেশের পটভূমিকায় 'গ্লোবালাইজেশন অব্ দি ইকনমি'—অর্থাৎ অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণের ধারণা ও তার প্রয়োগ, দেশকে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করবে, না আরো বেশি পরমুখাপেক্ষী করে তুলবে—উদ্বেগ তা নিয়ে। অর্থনৈতিক কাঠামোকে পুনর্গঠনের নামে প্রায় সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে এরই ফল। 'প্রাইভেটাইজেশন' শব্দের মূল প্রবণতা স্পষ্টই প্রকাশিত। এতদিনের স্বীকৃত পথ—সরকারী ক্ষেত্রের অধিকতর ভূমিকা—এখন আর কার্যকর থাকছে না। অন্তত, তা আর বাড়তে দেওয়া হবে না। উদ্বেগ এই পথ-পরিবর্তনে। যদি বলা হয়, ভারতে চার দশকের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ব্যবহারিক ফল হলো—সংখ্যায় ও আয়তনে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার (যার মূল কারণ একের পর এক রুগ্ন বেসরকারী শিল্পসমূহের অধিগ্রহণ), আর সম্পদ ও মুনাফাবৃদ্ধিতে বেসরকারী ব্যক্তিগত মালিকানার রমরমা—তাহলে খুব একটা মিথ্যে বলা হবে না। 'প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ' আছে এবং বহালতবিয়তেই তা বিদ্যমান। এখন তাকে আরও বাড়াতে হবে এবং সরকারী ক্ষেত্রের বিনিময়েই বাড়াতে হবে।

আই এম এফ. থেকে প্রয়োজনে ঋণ নেওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত, আই. এম এফের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো প্রয়োজনে সদস্য রাষ্ট্রকে ঋণ দেওয়া। সেই ঋণভাণ্ডার সংগ্রহে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রের নিজস্ব অংশ আছে। সমস্যা হলো, আই. এম. এফের সদস্য অনেক। ঋণের দাবিদারও তাই অসংখ্য। কাজেই কোনো বিশেষ দেশের ঋণের উপর মাত্রা আরোপ, সংস্থার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই জরুরি। ঠিক একই কারণে, কতটা ঋণ নেওয়া হচ্ছে এবং তা কতদিনের জন্য—এই প্রশ্ন খুবই অপরিহার্য। আর তাই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ঋণ অনেকদিনের জন্য চাওয়া হলেই তার উপর আরোপ করা হয় নানা শর্ত। পরিমাণের সঙ্গে ও সময়ের সঙ্গে সেই শর্তাদি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়। সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্যদের প্রয়োজনে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাকে টিকিয়ে রাখার এছাড়া উপায় নেই। হঠাৎ প্রয়োজন হলো—আর দশ হাজার কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দিলাম, তা যে কারণেই হোক না কেন, এই 'দেবীলাল-পদ্ধতি'তে আর যাই হোক, কোনো অর্থ লেনদেন সংস্থাকে বাঁচানো যায় না।

শর্তাদি আরোপের এই ব্যবহারিক দিক ছাড়া আর একটা দিকও আছে। তা আসছে আই. এম. এফ-এর অংশীদার সদস্যদের দখলদারীর দিক

থেকে, অর্থাৎ আমেরিকা, জাপান, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, সুইটজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইতালি প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলোর দিক থেকে। অন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে এই সমস্ত ধনী রাষ্ট্রের অংশীদারীত্বই অধিকতর ('কোটা')। কাজেই তাদের দখলদারী ক্ষমতা অধিকতর এবং তা সংগত কারণেই প্রতিফলিত হয় ঋণদানের সময় তাদের বাণিজ্যস্বার্থ প্রসারে। এখানেই আসে ব্যাপকতর উন্মুক্ত অর্থনীতির প্রসঙ্গ, অর্থাৎ 'গ্লোবালাইজেসন'। এছাড়াও থাকে ঐ সমস্ত দেশ থেকে অধিকতর আমদানির এবং ঋণগ্রাহী রাষ্ট্রের বাজারে বহুজাতিক সংস্থার (মাল্টিন্যাশনালস) অবাধ প্রবেশের প্রসঙ্গ। সমস্যাটা হচ্ছে, কোনো কোনো দেশ ঋণ নেয় তার নিজস্ব বাণিজ্যস্বার্থ রক্ষায় এবং অদূর ভবিষ্যতে তা প্রসারের আশায়। সুস্থ বাণিজ্যবুদ্ধি ও জাতীয় চেতনা তাতেই প্রকাশিত।

আসল দ্বন্দ্ব : অধিকতর রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যস্বার্থ এবং তার পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও অনেক দরিদ্র রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যস্বার্থের মধ্যে। এই দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমতা বা ভারসাম্য আনার শুভ চেষ্টা, না একের বিনিময়ে অন্যের শ্রীবৃদ্ধি—এ একরকম পারস্পরিক দর-কষাকষি ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দর-কষাকষির ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে, এখানেও তাই। ক্ষমতার জয় সুনিশ্চিত। যে-দেশ বিপাকে পড়েছে, ঋণ ছাড়া যার গতি নেই, তার অবস্থা সহজেই বোধগম্য।

মুশকিল হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যস্বার্থ কোনো স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি-নিরপেক্ষ বিষয় নয়। ঐ বাণিজ্যস্বার্থ সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতির (ম্যাক্রো-ইকনমিকস) নিরিখেই বিচার্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেন কোনও রাষ্ট্রের সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন শক্তির গতিপ্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের জাতীয় আয়, তার উৎপাদন ব্যবস্থা, তার বিভিন্ন ক্ষেত্রগত বণ্টন এবং ঐ বণ্টনের মাধ্যমে সমস্ত জনসাধারণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন ও তার বিকাশ ঐ গতিপ্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রেই, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি মেটাবার উদ্দেশ্যে নেওয়া আই. এম. এফ ঋণ, একদিকে তাদের ঋণের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়েছে, অন্যদিকে উৎপাদন হ্রাস, মাথাপিছু আয় হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অমঙ্গলের

কারণ হয়েছে। 'ব্যানানা রিপাবলিকস্' কথাটার আভিধানিক ব্যাখ্যাই হলো বৈদেশিক ঋণভারে জর্জরিত মধ্য আমেরিকার ছোট ছোট রাষ্ট্রসমূহ।

এত সব সত্ত্বেও ভারত ঋণ নিয়েছে এবং সেই ঋণের মোট পরিমাণ, অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কথাবার্তায় যা বোঝা যাচ্ছে, দাঁড়াবে প্রায় আট হাজার মিলিয়ন ডলার। দীর্ঘকালীন এই বিরাট পরিমাণ ঋণে স্বভাবতই বিভিন্ন শর্ত সংশ্লিষ্ট। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও ভারসাম্য আনার জন্যই এই ঋণ-পরিকল্পনা। এর তাৎপর্য হলো, বিভিন্ন দ্রব্য, সেবামূলক কাজ এবং ইতিমধ্যে নেওয়া ঋণ ও তার উপর সুদমেটাতে প্রতিবছর আমাদের যা ব্যয় (বলা বাহুল্য বৈদেশিক মুদ্রায়), তার থেকে রপ্তানিজাত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য খাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয় কম। এই কারণেই আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঘাটতি। এই ঘাটতি অবশ্য নতুন কিছু নয়। দশকের পর দশক এই ঘাটতি নিয়েই আমরা চলেছি। কোনো বছর কম, কোনো বছর বেশি। কখনো বা তা পৌঁছেছে সংকটজনক পর্যায়ে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই সংকটজনক অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো আই. এম. এফ থেকে ঋণ। ফলত, ঋণের পরিমাণ বেশি এবং সময় দীর্ঘ। শর্তাদি আরোপও তাই অবশ্যম্ভাবী।

ঘাটতি তো আছে। অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার জন্য আমাদের চাহিদা (উল্লিখিত বিভিন্ন খাতে আমাদের ব্যয়) এবং তার যোগান (উল্লিখিত বিভিন্ন খাতে আমাদের আয়) পরস্পর তাল রেখে চলতে পারছে না। এ অবস্থায় চাহিদা কমাতে হবে বা যোগান বাড়াতে হবে কিংবা একই সঙ্গে দুটোই করতে হবে। এরই সহজ এবং অবিলম্বে কার্যকর উপায় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে ঐ বিশেষ দেশের (যার লেনদেনে ঘাটতি রয়েছে ; মুদ্রার মূল্য হ্রাস—অন্যতম বিশেষ শর্ত। অবাধ বাণিজ্য নীতির এটাই হলো সমাধানের পথ। আশা করা হয়, আমেরিকান ডলার, ব্রিটিশ পাউণ্ড ও জাপানি ইয়েনের তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময়মূল্য কমার ফলে, একই ডলার বা পাউণ্ড ইত্যাদিতে ঐ সমস্ত দেশের নাগরিকগণ অধিকতর ভারতীয় জিনিস কিনতে পারবে। ফলে, তাদের ভারতীয় দ্রব্যাদি কেনার ঝোঁক বাড়বে। এই কারণে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ এতই বাড়বে যে, তা একক প্রতি কম দামজনিত লোকসান মিটিয়েও অতিরিক্ত কিছু আয়েও সাহায্য করবে। অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়বে। অন্যদিকে, ডলার, পাউণ্ড ইত্যাদির মূল্য টাকার তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সমস্ত দেশ থেকে আমদানিকৃত

দ্রব্যাদির জন্য একক-প্রতি বেশি দাম দিতে হবে। ফলে দেখা যাবে আমদানি হ্রাসের প্রবণতা। অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কমবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে অনুকূল পরিবেশে এ ধরনের যুক্তিতে কোনো খাদ নেই। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মুদ্রামূল্য হ্রাস করেছেন—দু'দফায় শতকরা প্রায় বাইশ ভাগ। ১৯৯২-৯৩ এর বাজেট প্রস্তাবনা সংসদে পেশ করার সময় সরকার পক্ষের নিষ্পাপ স্বীকৃতি—মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর আমাদের রপ্তানি বাড়েনি। প্রাক্-বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ঘটেছে তারই প্রকাশ।

দাম কমলে চাহিদা বাড়বে—এই সূত্রটি প্রাথমিক চিন্তায় যতটা সহজগ্রাহ্য মনে হয়, পরবর্তী চিন্তায় আর তা থাকে না। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষের প্রশ্ন আছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহের প্রশ্ন আছে, পরিবর্ত দ্রব্যাদির প্রশ্ন আছে ইত্যাদি। তাছাড়া, চাহিদা না হয় বাড়লো। তখন অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর তাগিদে অধিকতর যোগানের প্রয়োজন যেমন ঘটবে, তেমনি দেখা দেবে আরও বেশি উৎপাদনের প্রয়োজন। তা দিয়ে আদৌ এটা সম্ভব হবে, না-কি যোগান বৃদ্ধির পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। এর উপর রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সংরক্ষণের দিকে ঝোঁক। দাম কমিয়ে আমরা অন্যদেশে আমাদের দ্রব্যের বিক্রি বাড়াবার চেষ্টা করলেই তো হবে না। অন্যদেশ তা মেনে নেবে কিনা তা ভেবে দেখার দরকার আছে। সর্বোপরি, এটা স্বীকৃত যে, বিশ্বব্যাপী এক মন্দাভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাদ্দাম হোসেনের 'মাদার অব্ অল ওয়ারস'-এর আদলে ননী পালকিওয়ালা যাকে বলেছেন 'মাদার অব্ অল রিসেশনস্'। আমাদের দ্রব্যের বাজার নিশ্চয়ই তার আওতার বাইরে নয়।

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য আই. এম. এফ. ঋণ—এই গোটা ব্যাপারটা মোটামুটি তিনটি ঘটনা বা পদ্ধতি বা কৌশলের, যেভাবেই বলা হোক না কেন, মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তা হলো—'ডিভ্যালুয়েশন' (মুদ্রার অবমূল্যায়ন), 'গ্লোবালাইজেশন্' (জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণ), এবং 'প্রাইভেটাইজেশন' (ব্যক্তিগত মালিকানা বা বেসরকারীকরণ)। আই. এম. এফ. ঋণের অন্যতম বিশেষ শর্তও এই তিনটি। মুদ্রামূল্যহ্রাস কলমের খোঁচার ব্যাপার। রাতারাতি এটা করা হয়েছে। অন্য দুটি নীতি প্রবর্তনের, কখনো বা পরিবর্তনের প্রশ্ন—দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা মূলস্রোত থেকে সরে আসার বা তার গতিপথ

সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়ে ভিন্নস্রোত সৃষ্টির চেষ্টা সংগত কারণেই কিছুটা সময়-সাপেক্ষ।

প্রাসঙ্গিক কারণেই কয়েকটা কথা এসে যায়। যেমন, মনে আসে 'কমনওয়েলথ অব্ ইনডিপেন্‌ডেণ্ট স্টেটস্'-এর আবির্ভাব প্রসঙ্গটি। গর্বাচভের অতিউৎসাহী 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' তো খোদ গর্বাচভকেই উৎখাত করেছে। ১৯১৭ সালের মহান বিপ্লবজাত সোভিয়েত রাশিয়া চলে গেছে ইতিহাসের আড়ালে। অন্যান্য পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিও পরিত্যাগ করেছে তাদের দীর্ঘ কালের অনুসৃত পথ। পূর্ব জার্মানি মিশে গেছে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে। 'আয়রন লেডি' মার্গারেট থ্যাচার-এর স্থানে বসেছেন জন মেজর। আমেরিকা কথিত 'থিপ অব্ বাগদাদ' হয়েছেন অভিমন্যু বধে নূতন প্রযুক্তি প্রয়োগের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। এসবই কিন্তু আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য ও ধনতন্ত্রবাদের প্রায় অপ্রতিরোধ্য এক ভূমিকা। ফলে, জন্ম নিয়েছে নতুন ধারণা—'মার্কেট ফ্রেণ্ডলি ইকনমি'—বাজার সহায়ক অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানের দুর্বার অগ্রগতি সেই বাজার সহায়ক অর্থনীতির ধারণা সম্পূর্ণ উদার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কের ধারণায় পরিণত হতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি গড়ে ওঠা 'ইয়োরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি' বা 'কমন মার্কেট'-এর ঘোষিত অভ্যন্তরীণ অবাধ বাণিজ্য ও বাহ্যিক সংরক্ষণের পরিকল্পনা সেই ধারণাকে তেমন কলুষিত করতে পারে নি।

'গ্লোবালাইজেশন' এবং 'প্রাইভেটাইজেশন'-এর জন্য আমাদের এতটা ব্যতিব্যস্ত হওয়া—আই. এম. এফ. ঋণের শর্ত আরোপের ফলশ্রুতি হিসেবেই দেখা হোক, আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ঘটনাবলির অপরিহার্য প্রভাব হিসেবেই দেখা হোক, কার্যকারণ সম্পর্কে বিশেষ তফাৎ ঘটছে না। বাইরের চাপে দেশের অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী কিছু করা হয়েছে, সরকারে অধিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই জনসমক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সন্দেহের অবকাশজনিত সুযোগের (বেনিফিট অব্ ডাউট) ভিত্তিতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, অবাধ বাণিজ্য নীতির অমোঘ প্রভাবই এই দুই প্রবণতার পেছনে রয়েছে, তবুও তা আমাদের বহু প্রশ্ন, বহু সমস্যা এবং সম্ভাবনার সম্মুখীন করে।

১৯৯১-এ ক্ষমতায় আসার পর নরসিমা রাও সরকার, বিশেষ করে তাঁর অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, একের পর এক এমন অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন যার

নীতিবাক্য হলো 'ট্রেড, নট এইড' (ঋণ নয়, বাণিজ্য) এবং লক্ষ্য হলো রপ্তানির প্রসার। দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যের সাফল্য এবং তার জাতীয় অর্থনীতিতে সেই সাফল্যের শুভ প্রভাব অনেক সময়ই এ-ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। রপ্তানি প্রসারের নিমিত্ত আমদানি, বিশেষত প্রযুক্তির হস্তান্তরকে অবাধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে রপ্তানি বাড়বে ও বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়বে। আই. এম এফ ঋণের উপযুক্ত ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও রপ্তানি বৃদ্ধির সাহায্যে ঋণের বোঝা হ্রাস করা যাবে। শুধু সরকারী ঋণ নয়, তার পাশাপাশি সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে বেসরকারী ঋণেরও। এমনকি বহুজাতিক সংস্থা সমূহেরও অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগ সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানার ও তার নিয়ন্ত্রণ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিরও অভাব ঘটেনি। 'ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট বণ্ড', এন. আর. আই বিনিয়োগকে সর্বপ্রকার করমুক্তির আশ্বাস, বাইরে থেকে সোনা আনার জন্য বিশেষ উৎসাহ, টাকার আংশিক বিনিময় যোগ্যতা স্বীকার করা ইত্যাদি হলো সেই পথের দিশারী।

জাতীয় অর্থনীতি আন্তর্জাতিকীকরণের এত ব্যাপক ব্যবস্থা, এত কম সময়ের মধ্যে চার দশক ধরে সযত্নে লালিত মূলস্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী পথে পদক্ষেপ যে যথেষ্ট সাহসের পরিচয়—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বের দরবারে ভারতের এই পরিবর্তন রীতিমত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবেই ইতিমধ্যে অভিনন্দিত এবং এর ফলে আই. এম. এফ. থেকে অচিরেই আরো ঋণ পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। কটূক্তি মনে হলেও এটাই সত্য যে, কেন্দ্রে সংখ্যালঘু সরকার না থাকলে একধাপে এতটা এগোনো সম্ভব হত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার, যার আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে, তার পক্ষে এরকম বাজিমাৎ করার মতো চাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব। নরাসিমা রাও এবং তাঁর ছত্রছায়ায় ডক্টর মনমোহন সিং জাতীয় অর্থনীতি নিয়ে এক ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েছেন। এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িত। যে-কোনো ঝুঁকির ক্ষেত্রে যেমন ঘটে এখানেও তাই—অর্থাৎ ফল যে-কোনো দিকেই যেতে পারে।

উদ্বেগটা এখানেই। মুদ্রামূল্যহ্রাসের লক্ষ্য একই ছিল। যে সমস্ত কারণে তা সফল হয়নি তার সবই বর্তমান এবং এই প্রসঙ্গে সমানভাবে কার্যকর। দক্ষিণ কোরিয়া সফল হলেও লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার বহু রাষ্ট্রের

ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। তাছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া যখন আরম্ভ করেছিল সেই সময়ের আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। নতুন প্রযুক্তিসম্পন্ন যে সমস্ত রপ্তানি বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, তার অনেক ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়াই হবে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের এক প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বী। সর্বোপরি দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর কর্মনিষ্ঠা (ওয়ার্ক কালচার) আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি প্রার্থিত স্তরে রয়েছে। এর সঙ্গে আসে 'কাউন্সিল ফর মিউচুয়াল ইকনমিক এ্যাসিসটেন্স' অঞ্চলের (অর্থাৎ পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলোর) সঙ্গে, বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা। ভারতের বর্হি-বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল এই অঞ্চলে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পটপরিবর্তনের ফলে এর সবটাই রয়েছে এক চূড়ান্ত অনিশ্চিত অবস্থায়।

ধরে নেওয়া যাক, আমাদের চেষ্টা সফল হলো, অর্থাৎ উৎপাদন বাড়ল, এবং সেই উৎপাদনের একটা অর্থবহ অংশ রপ্তানিও করা গেল। ফলে, বৈদেশিক বিনিময়মুদ্রার সংকুলান হলো এবং তার সাহায্যে গৃহীতঋণ ও তার উপর সুদের পরিমাণই শুধু মেটানো গেল তাই নয়, মজুত হিসেবেও অতিরিক্ত কিছু থাকল। তাহলেও অন্য সমস্যা দেখাদিতে পারে। এটা হলো দ্বৈত অর্থনৈতিক কাঠামোর সমস্যা (ডুয়ালিজম)—যা ঔপনিবেশিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রপ্তানিপ্রবণ উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রসারের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাশাপাশি দু'ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উৎপাদন কাঠামো সৃষ্টি হতে পারে। একদিকে নতুনতর প্রযুক্তি সম্পন্ন আধুনিক রপ্তানিনির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থা, অন্যদিকে চিরাচরিত অনগ্রসর কৃষিভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থা। এটা কিন্তু একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। একদিকে বহুজাতিক সংস্থার সাদর আমন্ত্রণ, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির বেঁচে থাকার মাধ্যম ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে তেমন বিশেষ কোনো প্রয়াসের অভাব, সেই বিচ্ছিন্নতা আরও প্রকট করে তুলতে পারে।

বর্তমান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও টেলিভিশনের যুগে সেই বিচ্ছিন্নতা ভয়ংকর এক সামাজিক সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে লুট, রাহাজানি, মারদাঙ্গা, আগুন লাগানো ইত্যাদি যা চলছে তার কতটা ধর্মের কারণে কিংবা জাতপাতের কারণে, আর কতটা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে

না পাবার খেদ, অথবা উন্নয়নজাত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকার তিক্ত অনুভূতির কারণে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সদ্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশলে সেই অনুভূতি আরও গভীর, আরও কঠিন রূপ নিতে পারে।

এবার আসা যাক প্রাইভেটাইজেশনের প্রসঙ্গে। 'প্রাইভেটাইজেশন' কথাটা নূতন কিছু নয়। প্রাইভেটাইজেশন বলতে যদি 'প্রাইভেট সেক্টর', অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্র বা বেসরকারী ক্ষেত্র বোঝায়, তবে তার বিকাশের পথ ভারতীয় অর্থনীতিতে রুদ্ধ ছিল না। টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, আম্বানি তারই প্রমাণ বহন করে। ১৯৪৮-এর মিশ্র অর্থনীতি-ভিত্তিক শিল্পনীতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিকাশের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখেছিল। বলা হয়েছিল, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র হবে পরস্পরের পরিপূরক, পরিবর্ত নয়। বস্তুত, বেসরকারী মালিকানায় শিল্প সৃষ্টির ঝোঁক রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রে বর্তমান সরকার আসার পর শিল্পনীতির বিভিন্ন পরিবর্তন এবং বাজেটে ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহদান যেভাবে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, ঠিক ততটা এর আগে দেখা যায়নি।

গত চার দশকের উপর সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা যতটা আশা করা হয়েছিল, তা আদৌ পাওয়া যায়নি। একের পর এক সরকারী প্রতিষ্ঠান চলে গেছে লোকসানের খাতায়, কখনো বা রুগ্ন শিল্পের তালিকায়। তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে, এই সমস্ত শিল্পের একটা অংশ তুলে দেওয়া হবে ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে। আগে যেমন কিছু ছিল সরকারী ক্ষেত্রে এখনো তাই থাকবে এবং তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নতুনতর প্রযুক্তি ব্যবহারে যা করা দরকার তাই-ই করা হবে। আর কিছু অংশ পুরোপুরি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন মনে হলে বন্ধ করে দেওয়া হবে। 'একজিট' পলিসি, 'রিনিউয়াল ফাণ্ড' ইত্যাদি ধারণার জন্ম এখানেই। বলা হয়েছে, পরিকাঠামোগত শিল্পসমূহ ছাড়া আর সবই বেসরকারী ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রাইভেটাইজেশনের প্রতি এই আকর্ষণ কতটা অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি আর কতটা নানাবিধ চাপসৃষ্টির ফল, জনমানসে তা মোটেই স্পষ্ট নয়। হতে পারে, আই এম এফ প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক রাষ্টসমূহ দ্বারা পরিচালিত, তারা বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্বাসী, কাজেই এই প্রবণতা আই. এম. এফ আরোপিত। এটাও হতে পারে, রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাইভেটাইজেশন করা সহজ, কেননা এ ব্যাপারে

সরকার মোটেই সংখ্যালঘু নয়, সরকার পক্ষের সঙ্গে এখানে একই স্বার্থে সামিল প্রধান বিরোধী পক্ষ। রাজনৈতিক দল সমূহ বিভিন্ন শিল্পপতির অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় শিল্প মালিকরা তার প্রতিদান চাইছে। সম্ভবত সরকার নিজের আয় ও ব্যয়ে তাল রাখতে পারছেন না, তাই নিজের দায়িত্ব কিছুটা কমাতে চাইছেন। শ্রমিক-স্বার্থে সামাজিক নিরাপত্তামূলক অনেক রীতিনীতি মেনে চলার বাধ্যবাধকতায় বাণিজ্য-স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক পদক্ষেপ সরকারের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে সেই চাপ অনেক কম।

এখানেও আসে নানারকম প্রশ্ন। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সফলকাম না হওয়ার পেছনে শিল্প সম্পর্কে সংঘাত কতটা দায়ী, আর কতটা পরিচালন-ব্যবস্থার ত্রুটি (তা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণেই হোক কিংবা পরিচালন-দক্ষতার অভাবেই হোক), সে বিষয়ে পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। রুগ্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অনেকেগুলিই হলো রুগ্ন বেসরকারী শিল্পকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের ফল। বর্তমান রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ—যার অধিকাংশ রয়েছে বেসরকারী ক্ষেত্রে। কাজেই বেসরকারী ব্যক্তিগত মালিকানা বর্তমান সংকটমুক্তির একমাত্র পথ—এহেন চিন্তার পেছনে যুক্তি যদি কিছু থাকে, তা যতটা রাজনৈতিক ততটা অর্থনৈতিক নয়। আমেরিকার অনেক বড় বড় শিল্প নিজস্ব চেষ্টায় টিকে থাকতে না পেরে জাপানিদের হাতে চলে গেছে। 'ম্যাক্সওয়েল' এর মতো ব্যবসায় টাইকুনকেও কপর্দকহীন ঘোষণা করতে হয়েছে। 'অ্যাম প্যান'-এর মতো সংস্থাকে গুটিয়ে নিতে হয়েছে। ১৫০ বছর পর 'পাঞ্চ' ম্যাগাজিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এসব ঘটনা বেসরকারী মালিকানার উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করে না। তাছাড়া, বেসরকারী বলতে যেমন টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, মাহীন্দ্র, আম্বানি প্রভৃতি বোঝায়, তেমনি রাম, শ্যাম, যদুকেও বোঝায়। প্রথমোক্তদের সঙ্গে ইঁদুর দৌড়ে দ্বিতীয়দের স্থান কোথায়? এর উপর আছে বহুজাতিক সংস্থা। 'নার্স দি বেবি, প্রোটেক্ট দি চাইল্ড, ফ্রি দি এ্যাডাল্ট'—জাতীয় শিল্প সম্পর্কিত এই নীতির প্রয়োগে, আমাদের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কোনো শিল্পই আর আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করার মতো সাবালকত্বে পৌঁছায় না, সরকারের সংরক্ষণের আড়ালে থাকতে চায়। এর সমাধান নিশ্চয় এই নয় যে, সরকারের দরকার নেই, সংরক্ষণের দরকার নেই, কোনো রকম বিশেষ

উৎসাহ ও অনুপ্রেরণারও দরকার নেই। মুষ্টিমেয় কিছু সংস্থা বিভিন্ন ব্যবস্থার সাহায্যে, সরকারের বদান্যতায় বা অক্ষমতায়, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় একসঙ্গে বহুক্ষেত্রে জোটবদ্ধতার মাধ্যমে ('ইনটার লকিং অব্ মার্কেটস) উৎপাদন শক্তির একটা বড় অংশ ইতিমধ্যে নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আর তার সামনে প্রায় নগ্ন অবস্থায় প্রতিবন্ধীর মতো অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক ও পরিচালক—যারা মূলধন সংগ্রহে, কাঁচামাল সংগ্রহে, প্রযুক্তি হস্তান্তরে এবং বিক্রির বাজারেও প্রতিবন্ধী। সম্পূর্ণ স্বাধীন বেসরকারী উদ্যোগের অর্থ হলো, এই দুই গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক বাজারের কথা মাথায় রেখে দৌড়াতে বলা। এর ফল বলাই বাহুল্য। উদ্বেগ এইখানে। শুধু তাই নয়, প্রাইভেটাইজেশনের মূল লক্ষ্য মুনাফাবাজির ধাক্কা শেষ পর্যন্ত পড়তে পারে কৃষিতেও। সেখানে ব্যয়বহুল সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তির অবারিত প্রয়োগে অল্প কিছু ধনী, প্রায় ধনতান্ত্রিক খামারের প্রাধান্য ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিতে পারে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে। ভিন্ন ভিন্ন নামে দুর্বলতর জনসমষ্টির উপকারের লক্ষ্যে অসংখ্য প্রকল্প নিয়েও শেষ পরিণতি হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস আর ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি। একটা 'গ্লোবালাইজড' অর্থনীতিতে, একটা সম্পূর্ণ 'প্রাইভেটাইজড' অর্থনীতিতে এই প্রবণতা বাড়তে বাধ্য।

আমাদের মতো জনবহুল দেশে সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতি-সংক্রান্ত কোনো আলোচনায় কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ আসতে বাধ্য। এখানেও উদ্বেগ। জনসংখ্যা বাড়ছে, কাজের তাগিদে লোকও বাড়ছে। শিল্প প্রসারের সাহায্যে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিয়ে আনার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। কর্মহীনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে। পুরনো, অচল এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন গণ্য করে বেশ কিছু শিল্প আমরা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি। অন্যদিকে, আধুনিকতম প্রযুক্তির সাহায্যে উন্নতমানের উৎপাদনের চেষ্টায় আমরা বদ্ধপরিকর। এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কর্মহীনতা অধিকতর বৃদ্ধি, যা ইতিমধ্যেই প্রায় ভয়ংকর। আঠারো বছরের বেশি কোনো যুবক বা যুবতীকে শুধু ভোটের অধিকার দিয়ে অনন্তকাল শান্ত ও সংযত রাখা যাবে না। কাজের সুযোগও দিতে হবে।

পরিশেষে পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে যে, আই. এম. এফ থেকে বিরাট পরিমাণ ঋণ নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনে ঘাটতি এবং দেশের সামগ্রিক আয় ও ব্যয়ে ঘাটতি দূর করা, অন্তত কমিয়ে

আনা। ১৯৯২-৯৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতি কমানোর প্রস্তাবও করা হয়েছে। আশা করা হয়েছে, এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে। ২৯ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করা হয়েছিল। একমাস পরেও দেখা গেছে পাইকারি ও খুচরা মূল্যসূচক কমার কোনো লক্ষণ নেই বরং বেড়েছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দিক থেকে মূল্যবৃদ্ধির চাপ আরো অনেক বেশি আশঙ্কাজনক।

বাজেটে বলা হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য বাজেট ঘাটতি কমানো দরকার। বাজেট ঘাটতি কমানোর অন্যতম উপায় হলো ভরতুকির পরিমাণ হ্রাস। কিন্তু দুর্বলতর জনসমষ্টির স্বার্থে খাদ্যে ভরতুকি কমানো সম্ভব নয়। আবার অধিকাংশ গরীব চাষীর স্বার্থে সারে ভরতুকি তুলে দেওয়া বা কমানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে খাদ্য শস্যের সংগ্রহ মূল্য বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে ন্যায্য মূল্যের দোকানে সরবরাহ করা দ্রব্যাদির মূল্য। সর্বোপরি, সারে ভরতুকি, সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি, কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের কম দাম, কারণে-অকারণে কৃষি ঋণ মকুব ইত্যাদি সহায়তা সত্ত্বেও কৃষিজাত আয় আয়করের আওতার বাইরে। অথচ, করদানে উৎসাহ ও উৎপাদনে দক্ষতা—উভয় দিক থেকে দরকার করের হার কমানো এবং কর আরোপের পরিধি বাড়ানো। বাজেটে অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা কমানো হয়েছে। আই. এম. এফ. ও অন্যান্য উৎস থেকে নেওয়া ঋণ কিন্তু বাহ্যিক ঋণের বোঝা অনেক বাড়িয়ে দিল। এর অর্থ পরিষ্কার—বিদেশী দ্রব্যের মতো বিদেশী ঋণ অধিকতর আকর্ষণীয়।

পাশাপাশি রয়েছে চমকপ্রদ বিভিন্ন খবর। যেমন, দেশের শিল্প-সংস্থা 'ভেল্'-এর পরিবর্তে সুইডিশ 'ফার্ম' আশিয়া ব্রাউন বোভারি-কে ইলেকট্রিক্যাল লোকোমোটিভস্-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই ফার্ম নাকি পেয়েছে গান্ধার পাওয়ার প্রজেক্ট-এর দায়িত্ব। বোফর্স বিতর্ক ছিল, আছে এবং থাকবে। চেলিয়া কমিটির রিপোর্ট, জনগণের নির্বাচিত সাংসদগণ যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, তা সম্পূর্ণ করমুক্ত। সাংসদগণ রাজস্থানে যেতে প্রস্তুত ছিলেন 'প্যালেস অন হুইলস্' এর বিলাসিতায়। তাঁরাই আবার বাণিজ্য করছেন রাজধানীতে তাঁদের বাসস্থান নিয়ে।

দেশের অর্থনৈতিক সংকট চরম অবস্থায়। মুক্তির উপায় হিসেবে আই. এম এফ. ঋণের জন্য সমস্ত শর্ত মানার অঙ্গীকার সহ অর্থমন্ত্রী বারবার আমেরিকায় যাচ্ছেন। জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত উল্লিখিত দুই দৃশ্যের অসংগতি সাধারণ মানুষকে এক চূড়ান্ত হতাশাবোধ ও ভয়ংকর উদ্বেগের

মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। প্রশ্ন জাগে, আই. এম. এফ. ঋণ, 'ডিভ্যালুয়েশন', 'গ্লোবালাইজেশন', 'প্রাইভেটাইজেশন' ইত্যাদির লক্ষ্য জাতীয় অর্থনীতির উত্তরণ, না বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সাধন ? কার্টুনিস্টের ভাষায়—গোল্ড স্পটের পরিবর্তে লেহার পেপসির শীতল পানীয়, না ডোবার জলের বদলে ট্যাঙ্কের পানীয় জল ? পথের শেষ কোথায়—দক্ষিণ কোরিয়ার সাফল্যে, না ব্যানানা রিপাবলিক্' গুলোর অনিশ্চয়তায় ?

ঘর্মাক্ত

জর্জ আমাদো

[জর্জ আমাদোর জন্ম ১৯১২ সালে ব্রাজিলের দক্ষিণ বাহিয়ায়। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল একজন সাংবাদিক হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে গল্প-উপন্যাস লেখা। শ্রমিক, সাধারণ মানুষ ও নিগ্রোদের জীবনের কাহিনী ও সামাজিক অন্যায়-অবিচার তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। তাঁর বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্যাব্রিয়েলা, ক্লোভ এবং সিনামোন, হোম ইস দ্য সেলর, ডোনা ফ্লোর অ্যাণ্ড হার টু হাসব্যাণ্ডস, টেন্ট অব মিরাকল্‌স ইত্যাদি। তিনি সেখানকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬-এ তিনি ব্রাজিলিয়ান কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কমিউনিস্টদের উপর সরকারী দমননীতি শুরু হলে তিনি ব্রাজিল থেকে বিতাড়িত হন।]

সিও জো লক্ষ্য করল—লোকটি তার পিছনে-পিছনে উপর থেকে নেমে আসছে। দরজা পর্যন্ত এসে তার দিকে মুখ করে সে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। তার গরম নিশ্বাস সিও জো-র মুখে এসে পড়ছিল। রাত্রিটা ছিল যেমন ভাপ্‌সা তেমনি গুমোট। সমুদ্রের দিক থেকে কোনো হাওয়া বইছিল না। কিন্তু এর মধ্যেও যেন লোকটি শীতে কাঁপছিল। সে কথা বলছিল তার দুটো হাত ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে। তার চোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি, আর চিবুকটা অদ্ভুত ধারালো।

'মশায়, আপনি এ-বাড়িতে থাকেন—তাই না?'

'হ্যাঁ—চারতলায়।' জবাব দিতে দিতে সিও জো লোকটির দিকে নজর দেয়।

'এখানকার ভাড়া কি খুব বেশি?'

'বেশি! হ্যাঁ, সে তো বটেই। কিন্তু এর থেকে কমে আর কোথায় পাওয়া যায়?'

'সেটাই তো সমস্যা। কম ভাড়ার মধ্যে কি কোথাও পাওয়া যাবে না?'

প্রশ্নটা করার সময় লোকটির চিবুক যেন আরো ধারালো হয়ে ওঠে, দু চোখে ফুটে ওঠে একঠা অদ্ভুত অসহায়তা। সিও জো-র চোখে দৃষ্টি রেখে সে আবার বলে ওঠে. 'তার মানে, আপনি বলছেন এর চেয়ে কমে পাব না!'

'আপনি কি চিলেকোঠার পাশের কুঠরিটার খোঁজ নিয়েছেন ?'

'নিয়েছি বৈ কি। খালি নেই।'

লোকটি উদাস দৃষ্টি মেলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনও তার দু' হাত পকেটের মধ্যে। শরীরে শীতের কাঁপুনি। হঠাৎ সে বলতে থাকে, 'কী আর বলব মশায়, যে-ঘরটায় এখন থাকি, তার দু'মাসের ভাড়া বাকি। বাড়িঅলা একেবারে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে দিনরাত। সংসারে আমরা চারজন— আমি, আমার স্ত্রী মারিয়া আর দুটো বাচ্চা। বাড়ি ছাড়তে হলে এদের নিয়ে যে কোথায় উঠব ভেবে পাচ্ছি না। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, হয়তো আমাদের ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরুতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

শেষের কথাগুলো সে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করে। সিওজো নিরুত্তর। এ অবস্থায় কি বলা যায় তার মাথায় আসে না। তাছাড়া তার নিজের অবস্থা! লোকটির চেয়ে কি বেশি ভাল ? খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল লোকটিকে। চোখের উপর টুপিটাকে টেনে দিয়ে সে আবার বলতে শুরু করে, 'আমি একটা কারখানায় কাজ করতাম। তিন মাস হলো সেটা বন্ধ হয়ে গিয়ে যত গণ্ডগোল। খুঁজে খুঁজে একেবারে হয়রান, আজ অবধি কোনো কাজ জোটাতে পারলাম না। আমার স্ত্রী অনেক চেষ্টার পর ধোপাখানায় একটা কাজ পেয়েছে। নিতান্তই সামান্য মাইনে, তবু এটুকুই এখন ভরসা। আজই বাড়িটা ছাড়তে হবে কিনা, তাই খুব কম ভাড়ার মধ্যে একটা বাড়ি না পেলে চারজন মানুষ কোথায় যে উঠব জানি না। ভাড়া, তার উপর আবার চড়া অ্যাডভান্স, বলুন, এ কি দেওয়া সম্ভব ?'

লোকটি তার পকেটে রাখা হাত দুটোয় ঝাঁকুনি দেয়। সিও জো-র দৃষ্টি তখনও তার মুখে আবদ্ধ। এখন সে বলে, 'পিছনের পাড়াটায় খোঁজ নিয়েছেন ? এক-আধখানা সস্তার ঘর থাকতেও পারে।'

'না নেই। ও-দিকটাও দেখে এসেছি।'

নিজের কথা ভেবেই লোকটির জন্য বিশেষভাবে সহানুভূতি অনুভব করে সিওজো। সাহায্য করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তার সাধ্য নেই। তবু আপনা থেকে একটা হাত পকেটে ঢুকে একটা আধপেনি কয়েন স্পর্শ করে, যদি কিছুটাও কাজে লাগে ওর। কিন্তু কয়েনটা বের করতে গিয়ে পারে না। সে বুঝতে পারে, সাহায্যের পরিমাণ এত অকিঞ্চিৎকর যে এটা দিলে লোকটিকে অপমানই করা হবে শুধু।

লোকটি শেষবারের মতো একবার বাড়িটার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মাপ করবেন।'

সে পথের দিকে পা বাড়ায়। চলতে চলতে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়, বোধহয় একটুখানি ভেবে ঠিক করে নেয় কোন দিকে যাবে। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে যে রাস্তাটা, সেই রাস্তা ধরে সে হাঁটতে থাকে। সিও জো স্থির দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল চলমান লোকটির দিকে। তখনও যেন তার দুর্বল শরীর শীতে কাঁপছে। তার চোখে ভাসছিল লোকটির ধারালো থুত্‌নিটা, কানে ঠেকছিল তার ক্লান্ত ও হতাশ কণ্ঠের উচ্চারিত কথাগুলো, মুখে এসে লাগছিল তার গরম নিঃশ্বাস। লোকটির জন্য সহমর্মিতা দেখাতে গিয়ে এতক্ষণ নিজের অবস্থার কথাটা মনে পড়েনি সিও জো-র। কিন্তু এখন, লোকটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর, হঠাৎ করেই সে ফিরে এল নিজের জগতে, নিজের অবস্থাও তো সেই লোকটির চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। আর ঠিক এই ভাবনাটা তাকে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেও সেই লোকটির মতোই কাঁপুনি শুরু হলো অনিশ্চয়তা, ভয় আর আশঙ্কায়।

সিও জো নিজেও যে এখন পর্যন্ত এ-মাসের বাড়ি-ভাড়ার টাকা জোগাড় করে উঠতে পারেনি। আর বাড়িওলি যা একজন মহিলা! মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবতেই ভয় লাগে। মহিলা একজন ইতালিয়ান। সব সময় থাকে ঘাড় আর হাতঢাকা পোশাক পরে। পোশাকটা দেখতেও অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক লম্বা, চলবার সময় মাটিতে লুটিয়ে থাকে। এই বেঢপ লম্বা মহিলাটির সবগুলো দাঁত বাঁধানো, পায়ে কালো জুতো আর চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। দেখলেই মনে হবে ভীষণ নাক উঁচু ভাব। সারা বাড়িতে একমাত্র ফার্নাণ্ডেজ ছাড়া আর কারুর সঙ্গে ভাড়ার তাগাদা দেওয়া ছাড়া কখনো কথা বলবে না। আর ফার্নাণ্ডেজকেও সামনাসামনি হলে বড়জোর 'হ্যালো' বলা, এর বেশি নয়। কখনো যদি কাবাকা গিয়ে তার দরজার সামনে দাঁড়ায়, নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে ওর হাতের পাত্রের মধ্যে একটা নিকেলের কয়েন ছুঁড়ে দেয়। এই উপেক্ষা একজন ভিখিরিও বুঝতে পারে, সে মুখে ধন্যবাদ দিলেও যাবার সময় নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—'ভগবান করুন, একদিন যেন সিঁড়ি থেকে পড়ে তোর ঘাড় ভাঙে, কুত্তী কোথাকার!' ভিখিরির কাণ্ড দেখে এক পশারিণী নিগ্রো মেয়ে হেসে লুটোপুটি খায়। কিন্তু ইতালিয়ান মহিলাটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। তার আবার প্রেতাত্মা সম্পর্কিত একটা অনুশীলনচক্রে খুব যাতায়াত আছে। সে ওখানে মিডিয়ামের কাজ করে। যখন আত্মা তার

উপর ভর করে, লোকে বলে, সে তখন কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে, নাচে, গান করে নিজের ভাষায়। তার মুখ দিয়ে সবসময় দুর্নীতিগ্রস্ত পুরোহিত আর নষ্ট চরিত্রের মহিলাদের প্রেতাত্মারা নিজেদের বিকৃত জীবনের কেচ্ছা-কাহিনী শোনায়, কিছুটা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে। মনে হয়, খারাপ আত্মাদের ভীড়ে ভাল আত্মারা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেও পেরে ওঠে না। নইলে এক-আধজন ভাল আত্মা কি আর নেই!

সেদিন ইতালিয়ান মহিলাটি বাড়ী ভাড়ার তাগাদা দিতে সিও জো'র ঘরের সামনে এসে উপস্থিত। বাইরের দিক থেকে দরজায় হাঁটুর ধাক্কার শব্দ শুনেই সিও জো ভয়ে জড়সড়। তারা সাড়া না পাওয়ায় ঘনঘন ধাক্কা পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে তার নাম ধরে বিকট চিৎকার। সিও জো বুঝলো তার রেহাই নেই। সে বিনীত কণ্ঠে সাড়া দিল এবার, 'এক মিনিট, ম্যাডাম।' দরজা খুলেই সে মুখোমুখি হলো মহিলার। তার দুই হাত পিছনে, মুখে মৃদু হাসি। সিও জো'র চোখে-মুখে ভ্যাবাচ্যাকা ভাব. সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মহিলার চোখে দৃষ্টি রেখে।

'এই যে, খুব তো গা ঢাকা দিয়ে রয়েছ। আজ কত তারিখ খেয়াল আছে? পাঁচ তারিখের মধ্যে দেবার কথা, আর আজ আঠার তারিখ। এই নাও তোমার বিল, ভাড়াটা আগে দিয়ে দাও।' মহিলা বিল দেয়, সিও জো তার হাত থেকে বিলটা নিয়ে বলে, 'ম্যাডাম, দয়া করে আমাকে আর একটু সময় দিন। অন্ততঃ আর একটা সপ্তাহ।'

মহিলাটি বোধহয় আশা করেছিলো আজ নিশ্চয় টাকাটা পাবে। এখন সিও জো'র কথা শুনে পলকের মধ্যে তার মুখের শুকনো হাসিটা মিলিয়ে যায়। কঠিন হয়ে ওঠে মুখটা। সেদিক থেকে দৃষ্টি নামিয়ে হাতের বিলটার দিকে তাকায় সিও জো—ভাড়ার ফিগারটা তখন তার চোখের সামনে যেন সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। সে আবার বলে 'কি করব বলুন, আমার আগের কাজটা নেই। চেষ্টা করছি, এর মধ্যে নিশ্চয় একটা পেয়ে যাব। আর কয়েকটা দিন সবুর করুন।'

'না।' কঠিন রূঢ় কণ্ঠে মহিলা বলে, 'আর সবুর করতে পারব না। যথেষ্ট করেছি। দেখা হলে এই একটা কথাই তো তুমি বলে আসছ।'

'কাজটা চলে গেল, তাই বড্ড বিপদে পড়েছি। একটু দয়া করুন।'

'ও-সব শুনে আমার কি লাভ? আমাকে ট্যাক্স দিতে হয় না? খেতে হয় না? দয়া দেখালে আমার চলবে কেমন করে?'

কিছুক্ষণ দু'জনের কারুর মুখে কথা নেই। শুধু মহিলার কথার রেশ ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। নিস্তব্ধতা হঠাৎ ভেঙে যায় একটি বাচ্চার কান্নার শব্দে। সিও জো যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করে, সে তার দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'ম্যাডাম, নিশ্চয় শুনেছেন, গত সপ্তাহে আমার স্ত্রীর একটি ছেলে হয়েছে। তাই এত খরচ, ঠিক সামলে উঠতে পারছি না। চাকরিটা না থাকায় আরো মুশকিল হয়েছে।'

'আমাকে ও-সব শুনিয়ে কোন লাভ হবে না।' মহিলা নির্বিকার কঠিন স্বরে জবাব দেয়, 'তোমার ব্যাপার তোমাকেই সামলাতে হবে। আর যদি না পারবে, তবে বলি, ছেলের বাপ হবার সাধ কেন অত? থাক ও-সব কথা। ভাড়া যদি দিতে পারবে না, তুমি আমার ঘর ছেড়ে দাও। আজই। নইলে, তোমার জিনিসপত্র ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে, মনে রেখো।' কথাগুলো উচ্চারণ করেই ইতালিয়ান মহিলাটি সোজা হেঁটে চলে গেল। সিও জো'র স্ত্রী তখন বাচ্চার পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে বুঝতে পারছে, ভয়ংকর বিপদ আসন্ন। কিন্তু সিও জো এখন বেপরোয়া। তার পক্ষে সম্ভব নয় ঘর ছেড়ে দেওয়া। তাই তাকে ইতালিয়ান মহিলাটির দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এ ছাড়া উপায় কি?

অনেক রাত করে সিও জো ঘরে ফেরে। সারাদিন কাজ অথবা ঘরের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ঘোরাঘুরিই সার, জুটোর একটাও মেলে না। এমন কি কারুর কাছ থেকে সামান্য ধারকর্জও নয়। জীবনটা তার কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। একেবারে নরকের জীবন। আর এর জন্য অনেকখানি দায়ী ওই বাড়ীওলি ইতালিয়ান মহিলা। সিও জোর স্ত্রীকে সে বাথরুমে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না। সেদিন তাকে জোর করে বাথরুম থেকে বের করে দিয়েছে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে কি চিৎকার—'বেরোও, বেরোও বলছি। তুমি বাথরুম ব্যবহার করতে পারবে না।' ভাড়া না দেওয়ার শাস্তি। জলও বন্ধ। বাচ্চাটাকে চান করানোর জন্য বাড়ীর পিছনে ধোপীখানায় নিয়ে যেতে হয়। জুলুম এখানেই থেমে থাকে না। সিও জোর স্ত্রীকে পায়খানার দিকে যেতে দেখে মহিলা ছুটে গিয়ে পায়খানার দরজা তালাবন্ধ করে দেয়। এভাবে সব দিক থেকে তাদের বেকায়দায় ফেলে বাড়ী ছাড়াতে উঠেপড়ে লেগে যায় সেই হিংস্র প্রকৃতির মহিলা। ফলে সিও জোর ঘরখানা হয়ে ওঠে নোংরা ময়লা আর পেচ্ছাবের গন্ধে ভারী। এই নরকের মধ্যে তারা থাকতে বাধ্য হচ্ছে, তবু ঘর ছাড়তে পারছে না, এমনি অসহায় অবস্থা তাদের।

একদিন গভীর রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় সিও জো নিশ্চিত ছিল যে বাড়ীওলি মহিলা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। সিও জো দরজার সামনে এসে চমকে ওঠে। ঠিক তার অপেক্ষায় মহিলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে এত রাত পর্যন্ত।

'গুড ইভনিং!' কাচুমাচু হয়ে উচ্চারণ করতে হয় সিও জোকে।

'তুমি বোধহয় এ-সময় আমাকে আশা করনি —তাই না?' মহিলা একটু সরে গিয়ে সিও জোকে সরে ঢুকতে দেয়। সিও জো নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে নিঃশব্দে।

মহিলাটি আবার বলে, 'তুমি কি এক্ষুনি আমার ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারবে? যদি না পার, কাল পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।'

'কিন্তু ম্যাডাম…'

মহিলা সিও জোকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তেড়ে ওঠে, 'আর কিন্তু টিন্তু নয়, টাকাটা দিতে পারলে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে বুঝে গেছি, তুমি একটি অপদার্থ, নিস্কর্মা, মাতাল। তোমার মত ভ্যাগাবণ্ডকে কে কাজ দেবে? তোমার মত লোকের জন্ত আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। তোমার উপযুক্ত জায়গা হল রাস্তা, সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।'

'কিন্তু আমার স্ত্রীর অবস্থাটা ভাবুন—' এবারও সিও জো তার কথা শেষ করতে পারে না।

'তোমার স্ত্রী!' বিদ্রূপে ঝলসে ওঠে ইতালিয়ান মহিলাটির কণ্ঠস্বর, 'ও তো একটা শূকরী। যা নোংরা আস্তাকুড় বানিয়ে রেখেছে ঘরটাকে। পেচ্ছাবের গন্ধে ঘরের পাশ দিয়ে মানুষ যেতে পারে না।'

মহিলার কথাগুলো তীরের মতো এসে সিও জোর বুকে বেঁধে, তবু সে নিজেকে সংযত রাখে, আশ্রয়টুকু হারাবার ভয়ে। মহিলা আবার বলে, 'শোন, তোমার স্ত্রীটি যা কুঁড়ে, ওর পক্ষে একটা কাজই করা সম্ভব। এ অবস্থায় আর সব মেয়েরা যা করে ও-ও তাই করতে নেমে পড়ুক রাস্তায়। পুরুষ ধরে ধরে টাকা রোজগার করুক, হিল্লে হয়ে যাবে। কাজটা ও ভালই পারবে।'

সিও জোর শরীরের সব রক্ত মাথায় গিয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে। সে চোখ পাকিয়ে তাকায় মহিলার দিকে, দৃষ্টি থেকে আগুন ঠিকরে বেরয়। একটা অপ্রতিরোধ্য আক্রোশ তাকে অন্ধ করে দেয়। নিজের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে ঘুসি পাকিয়ে হিংস্রভাবে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইতালিয়ান মহিলাটির

উপর। দেখতে দেখতে মহিলাটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু সে যখন দেখল সিও জো থেমে নেই, ওর দুই হাত শক্ত হয়ে এগিয়ে আসছে তার গলা লক্ষ করে, তখন আতঙ্কে নীল হয়ে গেল তার মুখ, সে সমস্ত শক্তি একত্র করে উঠে দাঁড়াল এবং সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল বিদ্যুৎগতিতে। এতক্ষণে সিও জোর সম্বিৎ ফিরে এল। সে বুঝতে পারল, পুলিশ আসতে আর দেরী নেই। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে অভ্যাসমত সে নিজের দাড়িতে আঙুল বুলোতে লাগল।

এরপর সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে তার ব্যতিক্রম হল না এ ক্ষেত্রেও। পুলিশ এবং সংবাদপত্রগুলি ইতালিয়ান মহিলাটিকেই সমর্থন জানাল। ঘটনাটি অন্যরকম রূপ পরিগ্রহ করল, আর এই সুযোগে ইতালিয়ান মহিলার দারুণ পাবলিসিটি জুটল সংবাদপত্রে। তার আঠারো বছর বয়সের একটি ছবি সংগ্রহ করে সংবাদপত্রগুলি ছাপালো।

আদালতের পক্ষে সিও জোকে দোষী প্রমাণিত করা কঠিন হল না। তার জেল হল, আর ঘরে বিছানা, চেয়ার, কাপড়জামা ইত্যাদি যা ছিল সব নীলাম করে বকেয়া ভাড়ার যতটা সম্ভব আদায় করা হল। বাচ্চাটাকে নিয়ে সিও জোর স্ত্রী কোথায় গেছে সেই সম্পর্কে জানার কোন আগ্রহ কারুর রইল না।

অনুবাদ ঃ রুমা ধর

নির্মল সামন্ত দাহ হচ্ছে

অমল আচার্য

মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে কামিনী দেবী, যিনি দুমাস ধরে তাঁর আটাত্তর বছরের পচন-ধরা দেহটা নিয়ে এই বিছানায় শুয়ে চৈতন্যে-অচৈতন্যে নাগাড়ে রোগযন্ত্রণা ভোগ করেছেন, বাড়িশুদ্ধ লোকের কখনো বিরক্তি কখনো অভিশাপ কুড়িয়েছেন, একবিন্দু সহানুভূতি বা দরদ থেকে অবিরাম বঞ্চিত থেকেছেন, সবার অজান্তে পার্থিব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে প্রয়াত। বড়ই নিঃশব্দে, শব্দহীন বাতাসের মত চলে যাওয়া। এই চলে যাওয়ার মধ্যে স্পষ্টতই প্রকাশিত নীরব অভিমান, যে অভিমান নিশ্চিত প্রকাশ পেত যদি তাঁর আশে-পাশে এমন কেউ থাকত যে বুঝত তাঁর বেদনাটা কোথায়, কষ্টটা কোথায়, জীবনের শেষ প্রহরে তিনি তবু একটুক্ষণ কেন বাঁচতে চান? না, শেষ মুহূর্তে তাঁর পাশে তেমন কেউ ছিল না, থাকার প্রশ্রয় পায়নি যদি তেমন কেউ থেকেও থাকত, হয়ত ছিল, অবশ্যই ছিল বিশ্বাস করতেন কামিনী দেবী—কেননা, মৃত্যু যখন তাঁর শীর্ণ বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল, দুর্বল হৃদপিণ্ডটা যখন ক্রমাগত ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ার যন্ত্রণায় অস্থির দাপাদাপি করতে করতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছিল তখন কামিনী দেবী শেষবারের মত চোখ খুলেছিলেন, ঘোলাটে চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টি তুলে ধরেছিলেন ছবিটা বরাবর, স্বামীর যে-ছবিটা ঠিক তাঁর মাথার ওপর দেওয়ালে টাঙানো আর অস্থিচর্মসার ফ্যাকাশে কাঁপাকাঁপা হাতটা বাড়িয়ে স্পর্শ পেতে চেয়েছিলেন তাঁরই শরীর থেকে, মাংস থেকে, রক্ত থেকে, নাড়ি থেকে উৎপন্ন আরেকটা মানুষের—যাকে মানুষী ভাষায় বলে সন্তান, মানবিক সম্পর্কে বলে সন্তান, যার নাম রেখেছিলেন নির্মল। না, তাঁর আবেগকাঁপা হাত স্পর্শসুখ পায়নি নির্মলের। না পেয়ে হাতটা মরে গিয়েছিল, মরে গিয়েছিল প্রাণটা, মরে গিয়েছিল একটা মানুষ, সবার অলক্ষ্যে অমনো-যোগের উপেক্ষায়। বড় মায়া থেকে গিয়েছিল, যা চোখের কোণে দুবিন্দু জল হয়ে শীতলতায় জমাট বাঁধতে গিয়েও ফেটে যায়—যা এখন শুকনো রেখায় প্রত্যক্ষ। শব্দহীন বাতাসের মত চলে গেলেন কামিনী দেবী। একসময় নিশঃব্দে। নিঃশব্দ প্রয়াণ ঘটল কামিনী দেবীর।

আর এই সময়টা দিয়েই মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে একটুক্ষণের জন্য চোখ

বুঁজেছিল বেলা। বেলা এ বাড়ির অনাত্মীয়া, মাসমাইনের সারাক্ষণের আয়া, কামিনী দেবীর। থাকত বাগনান। পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হয়। ঘরামির বউ বেলা বিধবা হয়ে অকূলে ভাসল। অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে, লোভ-প্রলোভন ডিঙিয়ে যখন ছেলেটাকে কুড়ি বছরের যুবক করে তুলল, ছেলেটা ক্ষেতখামারে কাজ করে উপার্জন করতে শিখল, তখনই এক টিপটিপানি বৃষ্টি-ঝরা রাতে মা বিষহরি তার টগবগানো উষ্ণ তাজা রক্তে গরল ঢেলে দিল, গরলের ঝাঁঝালো ক্রিয়ায় ঢলে পড়ল ছেলে আলের ওপর। ছেলের শোকে বেলা পাগল হয়ে কাটাল কয়েক বছর। মহাকাল হরণ করে মানুষের শোক-তাপ-দুঃখ, ক্রোধ-প্রতিহিংসা, মানুষ মহাকালের গর্ভে জন্ম নেয় নতুন মানুষ হিসেবে, মানুষ তাই ধারাবাহিকভাবে অতিক্রমণ করে স্মৃতি থেকে বিস্মৃতিতে, বিস্মৃতি থেকে সহনশীলতায়, অতঃপর স্বাভাবিকতায়। বেলাও···। তবে বেলা দেশ ছাড়ল।

কলকাতা যেন ত্রাণ দপ্তর, আবাসন দপ্তর, কর্ম দপ্তর—এই তিন দপ্তরের সম্মিলিত ভূ-খণ্ড। ভাসতে ভাসতে এসে এই ভূ-খণ্ডে উঠে দাঁড়ালেই আশ্রয় পাওয়া যায়, কর্ম পাওয়া যায় খাদ্য পাওয়া যায়। তা যে যেভাবেই বাঁচতে চাক না কেন! তাই কলকাতার আয়তন বাড়ছেই দিন দিন. লোকসংখ্যাও বাড়ছে, বাড়ছে, ঘিঞ্জি-আবর্জনা। বাড়ছে পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু। বাড়ছে ক্রোধ-নিস্পৃহতা। বাড়ছে অবক্ষয় আর সৃষ্টিমুখরতা। জাতীয় সংহতি বিচ্ছিন্নতাবাদ। কলকাতা যেন শায়িত মহাদেব!

কলকাতার লক্ষ লক্ষের ভীড়ে কলমের খোঁচায় বেলাও রেশনকার্ডধারী এক মহানাগরিক হয়ে যায়।

বেলা কখনো রাঁধুনী, কখনো আয়া, কখনো প্লাইউড কারখানা বা প্লাস্টীক কারখানার দিনমজুর। পদ্মপাতায় জলের মতন কাজের সথায়িত্ব, পুব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে তার কর্মক্ষেত্র, জীবিকার সন্ধান। এ ভাবেই চলতে চলতে নির্মল সামন্তর বাড়ি, আয়ার কাজ—থাকা-খাওয়া উপরন্তু মাইনে। বাড়ির প্রভু, প্রভু পরিবারের খাদ্য আর আয়ার খাদ্য অবশ্য গুণাগুণের বিচারে এক হয় না, মালিক শ্রমিকের মাপকাঠিতে তা নির্ধারিত। তার জন্যে রেশনের চাল একবেলা, অন্যবেলা রুটি। দুবেলার পরিবর্তে একবেলা মাছ। প্যাকেটের চা-পাতা। সাবান-তেল নিজের পয়সায়। হিণ্ডালিয়ামের থালা-বাটি-গেলাস। আলাদা কাপ। আলাদা বাথরুম। ডাইনিং টেবলের পরিবর্তে মেঝেয় বসে খাওয়া। রেশনের বিস্কুট আর মুড়ি ওর জলখাবার। বাড়িতে ভালো-মন্দ

হলে, যদি তার তলানি কিছু থাকে থালায় পড়বে, নচেৎ নয়। ভালো-মন্দ এলে তার সদ্‌গতি আড়ালে-আবডালে, কখনো নিলর্জ প্রকাশ্যতায়—বাড়তি-টুকু স্থান পায় ফ্রীজের শীতল গহ্বরে। এ রকম বিলি-ব্যবস্থার কঠোর তত্ত্বধায়িকা গৃবাড়ির হিণী সুষমা দেবী, সংক্ষেপে সুমু—কর্তা নির্মল সামন্তর আদর করে দেওয়া নাম।

সুষমা ওরফে সুমুর হাতের তালুতে সংসার, সংসারের লোকজন, অমোঘ নিয়ন্ত্রণ। বাড়িতে কি হবে কি হবে না, কে আসবে কে আসবে না, কি বলবে কি বলবে না, কি করবে কি করবে না—তার নির্দেশ মত। বাড়ির কর্তা সাইডিং মারা ওয়াগণ। প্রথম প্রথম কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হত বেলা। তার মরদ ছিল ঘরামি, দিন আনত দিন খেত। নির্মলবাবুর মত বড় চাকুরে ছিল না, লেখাপড়া জানত না—কিন্তু ঘরামির বড় দাপট ছিল। খেটেখুটে যখন বাড়ি ফিরত ভয়ে বুক কাঁপত। পুরুষ ছিল বটে ঘরামি! অনেক বাড়িতেই যে কাজ করল, অভিজ্ঞতায় দেখল সব বাবুরাই এখন প্রায় এক।

প্রথম দিনেই বেলাকে সুষমা কাজ বুঝিয়ে দিল এরকম: বুড়িটার (কামিনী দেবী) সব দায়িত্ব তোমার। খাওয়াবে, চান করাবে, জামা-কাপড় কাচবে, নোংরা পরিষ্কার করবে, সব—সবকিছু। মরে গেলে বাঁচি! হাজার রোগ তবু মরে না। হাড় জ্বালিয়ে মারছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত। সাত জন্মের শত্রু …।"

কামিনী দেবী তখন পুরো জ্ঞানে নন—জ্ঞান-অজ্ঞানের অন্তরীপবাসিনী। পুত্রবধূর কথার কিছু শুনতে পান, কিছু শুনতে পান না। কিছু অনুধাবন করতে পরেন, কিছু পারেন না। তবু তাঁর ঘোলাটে চোখে অসীম যন্ত্রণা ফুটে ওঠে, আড়ষ্ট ঠোঁটে থিরথিরানি জাগে, অনেক কষ্টে মাথাটা ঘুরিয়ে নেন, নিতে পারেন একসময়।

সুমুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্বামী নির্মলের চোখে মায়ের অসহায়তা মায়ের কষ্ট, মায়ের বেঁচে থাকার পাপ চকিতে ছবির পর ছবি। তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, দলা পাকানো কান্নাটা নাভিতল থেকে গুমড়ে গুমড়ে গলায় উঠে আসে—সুমুকে মনে হয় কসাই।

ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, 'ছিঃ সুমু! ও ভাবে বলতে নেই। আমরা ছাড়া ওঁর কে আছে? বয়সকালে ওঁর সমস্ত কিছুই তো আমাদের জন্যে নিঙড়ে দিয়েছেন। এখন উনি অক্ষম। আমাদেরই তো দেখতে হবে।'

নির্মলের সহধর্মিনী ফুঁসে ওঠে এই কথায়। ভুলে যায় তাদের সংসারে সন্ত

আসা বেলার অস্তিত্ব। অথবা বেলার উপস্থিতিই তার আহত অহংকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাই রুক্ষভাবে বলে, 'অনেক করেছি, আর পারছি না বাপু। অসহ্য। তুমি থাকো মা-বেটায়। আমাকে ছেড়ে দাও, ছেলেকে নিয়ে চলে যাই···।'

নির্মলের ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ চুলোয়?' কিন্তু তাতে অশান্তি বাড়বে, অশান্তিকে তার বড্ড ভয়। তার চরিত্রের এই দুর্বলতা, বা আপাত নিরীহতা জানে সুষমা। আর জানে বলেই এই সুযোগ নিয়ে সুষমা জোর খাটায়, খাটিয়ে আসছে এ যাবত।

কামিনী দেবী মুখ না ঘুরিয়েই শীর্ণ হাতটা তুলে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেন, যার অর্থ নির্মলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। মা যেন বলছে—আমার জন্যে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করিস না। তুই শান্তিতে থাক। আমি আর কদ্দিন? কপালে যে ভোগ আছে তা তো ভুগতেই হবে? আমার জন্যে ভাবিস না। তুই এবার চুপ কর্ বাবা। বউ যা বলে বলুক, তুই কানে তুলিস্ না। আমি বেশ আছি···।

অল্প সময়ের মধ্যেই ইদানিং কলকাতার বাতাসে বেড়ে ওঠা বেলা বুঝে নিতে পারে এ-বাড়ির ধাত। এখানে টিকতে পারবে তো? মনে সন্দেহ ঘনায়। বেলেঘাটার বাবুর বাড়ি কাজটা ছেড়ে এসে বোধয় ভুলই করল। কিন্তু বাবুর মতি-গতি এদানিং সন্দেহজনক হয়ে উঠছিল। বাড়িতে বউ-ছেলে-মেয়ে না থাকলে সেই ফাঁকতালে বাবুটি রসের নাগর হয়ে উঠতে চেষ্টা করতেন, ভয় পেত বেলা। তাই সটকে পড়ার তাল খুঁজছিল। যেমন কুলি-কামিন, মেয়ে পাচার করার আড়কাঠি থাকে, তেমনি এই লাইনেও আছে—সুতরাং কাজের অভাব হয় না, এই যা ভরসা।

বেলা মনস্থির করল—যতটা সম্ভব যত্নআত্তি করে বুড়িটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যতদিন বুড়ি বাঁচবে ততদিন তার চাকরি। বুড়িটা টেঁসে গেলে তার চাকরিও খতম। দাঁউ বুঝে' কোপ মেরে কাজটা ভালো মাইনেয় রফা করেছে, এ ধরণের কাজে চট করে লোক পাওয়া মুস্কিল জেনেই নির্মল সামন্তও রাজি হয়ে গেছে তার কথায়। সুতরাং ওটাও একটা অমোঘ অস্ত্র। আর বাড়ির গিন্নী সুষমা, সুমুরানীর মেজাজ-মর্জির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চললে তো রাখে হরি মারে কে? অতএব দুটো লক্ষ—বুড়িটাকে বাঁচিয়ে রাখা আর নেক নজরে থাকার জন্য গিন্নীমা'র চামচাগিরি করা।

পঙ্গু, শুধু পঙ্গু কেন, মুমূর্ষু রোগীর পরিচর্যা করার কাজ তার জীবনে এই

প্রথম। খাওয়ানো, চান করানো, ওষুধ খাওয়ানো, জামা-কাপড় কাচা বা পরানো নয় করা যায়; কিন্তু গু-মুত সাফা-স্বরত করা—উঃ! গা-ঘিন ঘিন করত। কিন্তু অভ্যেসের কাছে বশীভূত মানুষ। আস্তে আস্তে সইয়ে নিল বেলা। শুধু সইয়ে নেওয়া নয়—ক্রমান্বয়ে মায়ায় জড়িয়েও পড়ল। একটা অসহায় পঙ্গু মানুষ, যে চলৎশক্তিহীন, প্রায় বাক্‌শক্তিরহিত, প্রায় দৃষ্টিহীন, যার নিজে কিছু করার ক্ষমতা নেই, যার সংসারের ওপর বিন্দুপরিমাণ অধিকার নেই, যাকে সংসারের লোক মনে করে বোঝা বা আপদ, যার জন্যে কারো মায়া-মমতা নেই—চব্বিশ ঘণ্টা তার সাহচর্যে থাকতে থাকতে অনিবার্য ভাবেই তার মায়ায় জড়িয়ে পড়ল বেলা। এখন তার মনে হয় না চাকরি করছে, বরং মনে হয় সেবা! মানব সেবাই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ—সেই কবে মা'র মুখে শুনেছিল কথাটা।

মা! তারও মা ছিল। বেঁচে থাকলে কামিনীদেবীর বয়েসী না হলেও প্রায় কাছাকাছি হত। তার মা-ও বড় অযত্নে মারা গিয়েছিল দাদার সংসারে। বলা ভাল, বউদির সংসারে। দাদারা বিয়ে করলে সংসার দাদাদের হয় না, সংসার হয় বউদিদের—বোধয় একালের রীতি। দাদা এখন অনুশোচনা করে। মানুষ মরে গেলে বেঁচে থাকার মানুষের কাছে মরা মানুষটা কেমন যেন দামী হয়ে ওঠে—বোধহয় এটাও মানবীয় রীতি। টুকরো-টাকরা ভাবে মাঝে মাঝে এসব কথা মনে হয় বেলার। মনে হলেই কামিনী দেবীর জন্যে অনুভব করে গভীর টান।

মন টানটা চৈতন্য-অচৈতন্যে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন কামিনী দেবীও বুঝি টের পান। তাই তাঁর আশ্রয়প্রার্থী কৃশ হাতটা বেলার হাতে হাত রেখে বেলার উষ্ণতা ভোগ করে। বড্ড সুখ, সুখ পান কামিনী দেবী। কতকাল এই সুখের হদিস পাননি তিনি। পৃথিবীতে আকাল চলেছে—সুখের আকাল। খরা, সর্বত্র খরা—অনন্ত আকাশের কোটি কোটি রোমকূপ নিমজ্জিত কোটি কোটি বারিবিন্দু সেই খরা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

ঘড়ঘড়ে গলায় প্রায় অস্ফুটস্বরে কামিনী দেবী বেলাকে বলেছিলেন একদিন, 'তুই আমার আর জন্মের মেয়ে। এখন মরতে আমার আর কোনো কষ্ট নেই।'

বেলাও মনে মনে বলে—হ্যাঁ, আমি তোমার মেয়েই। এসেছিলাম

চাকরি করতে। কিন্তু এখন চাকরিকরি না, করি মাতৃসেবা। বিশ্বাস করো মা!

……লোডশেডিং হওয়ায় গরমে ঘেমে উঠেছিল বেলা। বোধয় সেই অস্বস্তিতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আঁচল দিয়ে ঘাড়-গলার ঘাম মুছে উঠে দাঁড়াতেই কামিনী দেবীর দিকে দৃষ্টি যায় তার, কেমন যেন খটকা লাগে, তাঁর কপালে হাত রাখে, যেন বরফে হাত রাখল বেলা। বেলা গুঙিয়ে উঠল…।

কামিনী দেবীর একমাত্র সন্তান নির্মল সামন্ত মৃতার পাশে এসে দাঁড়ায়। শান্ত চোখে অথচ ভাবলেশহীন, মৃতা জননীকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। একটা ভারবাহী পরিশ্রান্ত মানুষ সংসারের সমস্ত পাঁক মাথায় বহন করিয়া ন্যুব্জ দেহে পা ঘষটাইয়া ঘষটাইয়া ইহলোকের সীমানা পার হইয়া যাইতেছে, চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে নির্মল সামন্ত। একবার মনে ভাবে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে, কিন্তু বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। ভ্রম সংশোধন করিবার আর উপায় নাই।

নির্মল মা'র পাশে বসে। মা'র কপালে হাত রাখে, গালে হাত রাখে, ঠোঁটে হাত রাখে, বুকে হাত রাখে, হাতে হাত রাখে, পায়ে হাত রাখে— ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে মা'র সমস্ত শরীরটা অনুভব করে—চেতনায়, রক্তপ্রবাহে, মজ্জায় মজ্জায়। তার সমগ্র অস্তিত্বে মা হাহাকার করে ওঠে ; মা যেন বলে—নিমু, সমস্ত শরীর জুড়ে ব্যথা, বড্ড ব্যথা—হাতটা সরিয়ে নে বাবা।

হাত সরিয়ে নেয় নির্মল। সরিয়ে নিয়ে মায়ের বুকে কান পাতে। বুকের ভেতর কান্না। দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা কান্না গুমড়ে গুমড়ে উঠছে, গভীর অতল থেকে যেমন প্রস্রবণের জলোচ্ছ্বাস কলকলিয়ে উঠে আসে, তেমনি। মায়ের বুকের ভেতর থেকে কান্নার উদ্গীরণ ঘটছে। মা যেন বলছে—বুকে বড় ব্যথা! মাথাটা সরিয়ে নে, বাবা।

মায়ের বুক থেকে মাথা তুলে মায়ের কোলে মাথা রাখে নির্মল। অমনি মা মা গন্ধ, আগরবাতির মিষ্টি গন্ধের মতন তার নাকে ঢোকে, নাসারন্ধ্র দিয়ে তার সমগ্র সত্তায় মিশে যায়, মা'র শরীরের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নির্মল।

আচ্ছন্নতায় থাকে কিছুকাল। মা যেন তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—এবার ওঠ বাবা আমাকে যেতে দে।

এতক্ষণে নির্মল কেঁদে ওঠে শিশুর মত। কেঁদে কেঁদে বুকটা খালি করে, বুকের যত দুঃখ উপুড় করে দেয় মাতৃশরীরে, ছেলের চোখের জলে সিক্ত হয়ে ওঠে মরা মা। আর মরা মা'র নির্বাপিত আগুনে সন্তানের দাহ হতে দেখে সুষমা, দেখতে দেখতে চৈতন্য হারায়।

খোলশ

সমর মুখোপাধ্যায়

ছিয়ানব্বই রানের মাথায় সুহিতের ব্যাট ঝলসে উঠল। একখানা দুরন্ত স্ট্রেট ড্রাইভ। নিশ্চিত চার এবং সেঞ্চুরি। ব্যাট তুলে অভিনন্দন কুড়োনোর বদলে ইন্দ্রপতন। লাল বলটা বিভাসের তালুবন্দী হল। এই নিয়ে পরপর তিনটে ম্যাচে সেঞ্চুরির দোরগোড়া থেকে সুহিত ফিরে এল। কট এ্যাণ্ড বোল্ড বিভাস চৌধুরী। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনবারই আউট হল প্রিয় বন্ধু বিভাসের বলেই!

বিভাসের চোখে মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যেন এরকম ঘটনা খেলায় আছে বলেই এটা খেলা। হাতের মুঠোয় সুহিতের প্রাণভোমরা। ছিয়ানব্বইয়ের ঝোড়ো ইনিংস খেললেও সেঞ্চুরি না পাওয়ার দুঃখ থেকেই গেল। দর্শকদের হাততালির মধ্যে প্যাভেলিয়নের দিকে ফেরার পথে বিভাসের দিকে হাত বাড়াল। করমর্দন হল। বিভাস বলল,— তিন তিনবার তোকে আউট করলাম।

সুহিত মাথা তুলে অল্প হাসল। চোখের ভেতর এ বাস্তব অভিজ্ঞতার তীব্র অমর্যাদা হুল ফোটাল যেন। সবুজ ঘাসের ওপর সুগর্বিত পাওয়ার শু'য়ের স্টেপ ফেলে চলে যেতে যেতে বলল,—জোরের মারটা ধরে ফেললি! কনগ্র্যাটস, বিভাস।

খেলার মাঠে প্রতিপক্ষ সুহিত আর বিভাস। অথচ দু'জনের ভেতর বন্ধুত্বও প্রগাঢ়। অন্য বন্ধুরা মানিকজোড় বলে। কেউ কেউ 'টু ফেসেস অব দি সেম কয়েন' বলে রসিকতা করে। বিভাস উপভোগ করে। একটু রসের মিশেল দিয়ে এই সহবতকে বলে, সুহিত আমার কাছে দি ওয়াল অব দি প্রাইভেসি।

জামাকাপড় নিয়ে সুহিতের বাছবিচার সবাই জানে। পোশাক পরিচ্ছদে লেটেস্ট ফাশন। শার্ট পাৎলুনের মানানসই ম্যাচ না হলে ওর মন খুঁতখুঁত করে। বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সুহিত খেলার মাঠে শাদা মাখন জিনের ট্রাউজার আর টুকটুকে লাল শার্ট পরে নামছে। অনেকেই আপত্তি তুলেছে, কিন্তু ওর সাফ জবাব—ভারতের ক্যাপ্টেন শ্রীকান্ত

কবচ ছুঁয়ে সূর্য প্রণাম করে, কোন উইকেটকিপার ধুলঝুল ছেঁড়া প্যান্ট পরে মাঠে নামে তখন! আমরা গাঁইয়া মেঠো প্লেয়ার বলে রঙের ধুয়ো। একথা অবশ্য ঠিক, খেলোয়াড়দের জীবনে এরকম বিচিত্র কিছু ব্যাপার থেকেই যায়, যুক্তির পেঁয়াজ খোসা যার ছাড়ানো যায় না। মাঝখানে ব্যাটে রান আসছিল না। জামাটা পরার পর থেকে ওর নাকি সিজন বদলেছে। প্রতাপগড় ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও সুহিতের নাম বাদ পড়ে যায়। বিভাস থেকে গেল টিমে। সুহিত এখন ইউনাইটেড ক্লাবের বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান। ও বিশ্বাস করে এর মূলে এই স্কারলেট রেড শার্ট আর শাদা প্যান্ট। রানের জোয়ার এসেছে, কিন্তু সেঞ্চুরি নেই! বিভাসই তিন তিনটে ম্যাচে পরপর উইকেট ডাউন করাল।

সুহিত বন্ধু বিভাসকে এ ব্যাপারে বলেছেও। সব কিছুরই একটা মাধ্যম থাকে। কোর্স ফ্রম উইদিন। এরই একটা মিডিয়াম দরকার। যেমন গুরুদেবের এমসস করা লকেট। মানে কোন গুরুর কাছে নাড়া বেঁধেছ তার প্রমাণ। পড়ুয়ার কাছে বই যেমন, মাতালের কাছে মদের ঠেক, আবার তেমনি এই রেড শার্ট। ইট্স মাই এনটিটি। আমার পরিচয়। খেলার মাঠে জাত সিংহকে চিনতে পারবে, হিজ হাইনেস সুহিত ব্যানার্জী।

রংটা নীল নয়, হলুদ সবুজ শাদা না, লাল কেন?

স্বর ঝুঁকিয়ে ফিসফিস করে সুহিত বলল,—গুরু, একটা চাকরির যোগ আছে। অনিমেষদার সঙ্গে রাতদিন ঘুরছি। তাই রংটা চাপিয়ে নিলাম। লালের বাজার দর ভাল।

বিভাস সুহিতের এরকম অকপট কথা শুনে থ। রাজনীতি-ফিতির ধার ধারেনা সে। শুধু চাকরি যোগাড় করতে রঙ বদলে ফেলল।

জানিস তো লাইফ হচ্ছে ব্যালান্স করে বলা। তেলানো বাঁশ আর বাঁদরের খেলা। কারিকিৎ ছু মন্তর।

ক্ষিতীশদার চায়ের দোকানে সুহিত এলে যেন রোশনাই রোজ! কথার সমুদ্দুর। ভাল লাগে। বিভাসের সঙ্গে মতবাদের ক্ষেত্রটা ছাড়া আর সব ঠিকঠাক। অলিখিত চুক্তি, রাজনীতির কথা এখানে—নেভার। সুহিত নিখুঁত শেভ করা গালে স্নো পাউডারের প্রসাধন চাপিয়েছে। বিভাসের কাছে গাল বাড়িয়ে বলল,—এখানে হাত দে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল, প্রতিমা জগে পাশ একখানা চুমু খেয়ে পাঠিয়ে দিল। আঃ বাঁধিয়ে রাখার

মতন। তারপর জামার হাতায় চুমু দিয়ে বলল,—জামাখানা শালা জ্যোতিষীর স্টোনের থেকেও ফাটাফাটি। হেব্বি পয়া মাইরি।

বিভাসের গা হাত পায়ে কেমন অদ্ভুত শিরশিরানি বয়ে গেল। কি ভাগ্য সুহিতের। চাকরি করা মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে ফিট। চাকরি পেতে ওর যতটুকু। তারপর বিয়ে ঘর সংসার। জীবনের কোন দুঃখ যন্ত্রণা ওকে স্পর্শ করে না। অথচ নিজের—না আছে চালচুলো, চেহারার চেকনাই। সুহিতের চালচলনের সঙ্গে তার বিস্তর তফাৎ। ওর মধ্যে কেমন উন্নাসিক তার। রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে ঘোরতর বিদ্বেষ। ও বলে, সব ধান্দাবাজ। কেউ নেতা হবে, লড়ে যাচ্ছে। কেউ কন্ট্রাকটারি হাতানোর জন্যে এক নম্বর সাপোর্টার হয়েছে। নাম প্রতিষ্ঠার বাজার করছে কেউ ইতিহাস বইতে নাম তুলতে, কেউ ফ্যামিলির ফিতে লম্বা করছে। ওসব বিপ্লব ফিপ্লব ইজম-তন্ত্র চুলোর দোরে। অথচ সেই সুহিত এখন লাল জামা গায়ে দিচ্ছে। শুধু কি অনিমেষদার মন পেতে!

এসব শো ম্যানশিপ। চাকরিটি পাব, জামাটি ছাড়ব।

ভণ্ডামী করার চেয়ে জামাটা বরং আমাকে দিয়ে দে।

ভাল করে বিভাসের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল,—জামাখানা তোর খুব পছন্দ, নারে! আসলে এ জামা তোর গায়েই মানায়। আমার কাছে খোলশ। আমি ছাড়লে তুই নিবি।

বিভাস দুরন্ত পেসার, মারকুটে ব্যাটসম্যান। কবিতা লেখে। সুহিতের কথা রাখতে প্রতিমার নামেও কবিতা লিখে নিজের পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছে। পত্রিকা বার করে, গান গায়। তুখোড় ডিবেটিষ্ট। লাল বল হাতে অব্যর্থ নিশানা আর তীব্র গতি। কলেজে পড়ত যখন; তখন থেকেই রাজনীতি করে। এত প্রচুর গুণবান ছেলেটির প্রতি আজও কোন মেয়ে বসন্তের মুকুল হ'য়ে আসেনি। চাকরির সুযোগ করে নিতে রাজনৈতিক দাদাদের তেল মাখানোর কৌশল শেখেনি। অনিমেষদাদের তোষামোদ খাতে সয়না। ভাল খাবার, সুন্দর জামাকাপড় কি কম্মে লাগে বিভাসের মাথায় ঢোকে না। কিন্তু কেমন হঠাৎ করে জামাখানা চেয়ে ফেলল!

সুহিতের ভাবনা তখন তারই মত। যারা দুঃখ পাওয়ার জন্যে জন্মায়, তাদের জিম্মায় দুঃখ গুদোম ঘর থেকে হায়ার পারচেজেও চলে আসে। বিভাস তার কাছে তেমনই আপাপাশতলা দুঃখ মোড়ানো ছেলে। ওদের করুণা করতে ভাল লাগে। ওরা কিছু চাইলে ভাল লাগে দিতেও। লোভী

চোখের সামনে একথালা ভাত গবগবিয়ে খাওয়া দেখতে দেখতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ঝগড়া ভাল লাগে। বন্ধুর দিকে চেয়ে মনের ভেতরকার কথাগুলোয় আর একবার মক্‌শো করে নিল সুহিত।

খেলার মাঠে আজ নিয়ে তিনবার তোর হাতে আউট হোলাম। তাই জামাটা তোকে দিয়েই দেব বিভাস। সুহিত ব্যানার্জীর উইকেট ডাউনের স্মৃতি হিসেবে। ওটা গায়ে চড়িয়ে দেখ, তোর কোন বদল হয় কিনা।

বিভাস জানে, সুহিত চিরকালই এমন। ওর একটা সাজানো গোছানো বাড়ি আছে। তিন দাদার ছোট ভাই। দাদারা সবাই ভাল চাকুরে। এমনিতে ক্ষমতাবান লোকদের গা সেঁটে থাকার চেষ্টা করে। এমনকি এস ডি ও সাহেবের সঙ্গেও ওর খাতির। খেলা পাগলা লোক। ইউনাইটেড ক্লাবের হয়ে মাঠে প্র্যাকটিস নেন। এই সুযোগে সুহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। এমনকি পারিবারিক সম্পর্কও তৈরী করে ফেলেছে। সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে সুহিতের জীবনে প্রতিষ্ঠা আসবে। আবার অন্য কেউ যাতে বাগড়া না দেয় তাই রাজনীতিও করছে আজকাল। মিটিং মিছিলে লাল জামাখানা গায়ে চাপিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। ওর জামার নীচেকার সুযোগসন্ধানী ফুসফুস সবসময় কুত্তার মত ডাষ্টবিন খুঁটছে। সেখানটায় প্রিয় বন্ধুর চেহারাটা বীভৎস। বিভাসের ভাবতে ভাল লাগে না।

বিভাস তবু এই মেলামেশাকে সম্বল করে আছে। তাই সুহিত তার প্রিয়। বাক্সে পোরা দলা মোচরা পোষাকের মত। ভ্যাপসা গন্ধ আসে। কেবল স্মৃতিই তার ভালবাসা। তার বাইরে তার উত্থান পতন নেই। মনে মনে ভীষণ অন্তর্মুখীন' প্রকাশ করতে পারে না নিজেকে। সোল্লাসে খেলার মাঠে কখনও সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়নি, ব্যর্থতায় দুঃখ নেই। নিজের ভূত ভবিষ্যতের ভাবনার ধার ধারে না। বুকের সব বোতাম খুলে দিয়ে জামার ভেতর বাতাস ঢুকিয়ে নেয়। পাল তোলা পানসির মত ভাসে। বুকের রেশমে হাওয়ার পালিশ দিয়ে বয়সের স্টেশান পেরিয়ে যায়।

অনির্বানের সঙ্গে দেখা হল। অনেকদিন পরে বিভাসকে দেখে থমকে দাঁড়াল। কলেজে পড়তে পড়তে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। এখন নাকি চাকরি করে। এক ঝলক হাসল, প্রথম কথাটা ওর বরাবরই এক থাকে। আজও তেমনি।

তুই চিরকাল একইরকম থেকে গেলি। জোয়ারে ভাঁটার একই তীরে। বিভাসেরই লেখা কবিতার লাইন নিজের মত করেই বলে অনির্বাণ।

রিভাস সংক্ষিপ্ত হাসল।

অনির্বাণ একটু রেগে গেল। এই হচ্ছে তোদের রোগ। একটু খোলা-মেলা হতে পারিস না। হাসতেও যেন কত কষ্ট। এবার থামল। মাথা ঝুকিয়ে বলল, কতদিন পরে দেখা হোল। কোথায় হৈ হৈ করে উঠবি। ইয়াদ আ রহা হ্যায় গাইবি, দুচারটে খিস্তি ছোটাবি—কি যে ভাব নিস্।

ওসব হাসি গান তোদের। জানিস তো আমি এমনিই।

খুব দার্শনিক পোজ তোর যাই হোক।

জানিস তো জীবনে জোয়ারও নেই, ভাঁটাও নেই।

অনির্বাণ একটু দমে গেল। প্রথম আক্রমণ বিভাস এভাবেই ফেরৎ দিল। বিভাস সেইরকম। রুক্ষ একমাথা চুল। বুক খোলা শার্ট, কাঁধের ওপরটা বিপজ্জনকভাবে ছেঁড়া। গাল ভর্তি দাড়ি। কোটরাগত চোখ দু'টোয় তবু কেমন উজ্জ্বলতা। যা সব প্রতিকূলতা ঢেকে এখনও বেশ সজীব। ভেতরে ভেতরে মায়া হল। অনির্বাণ মুখ ফসকে বলে ফেলল,—যদি কিছু মনে না করিস, তোকে একটা জিনিষ প্রেজেণ্ট করতে চাই।

অনির্বাণ কি করুণা করতে চাইছে? এর মধ্যেও দাতা গ্রহীতার সম্বন্ধ আছে। প্রসঙ্গটা ভাল না লাগলেও বিভাস রসিকতা করল—কি প্রেজেণ্ট করবি? ঝুম-ঝুমি না মাছ লজেন্স। না এক পীস জলি চিকেন অফ সিক্স-টিন উইথ ডিম্পল স্মাইল!

না, একটা জামা কিনে দেব তোকে। এটা কি পরার হাল আছে!

বিভাসের চোখ চকচকে হোল। ঠোঁটটা একটু কুঁচকে গেল। আবার সেই জামার কথা। সুহিতের লাল জামাটা এখনও হাতে আসেনি। কতদিন দেখা হতেই মনে করিয়ে দিয়েছে। অথচ ও বোধ হয় মনে রাখেনি। চাকরি পেল, বিয়ে করল—মাত্র ক'দিনে কেমন বদলে গেল! আজকাল কালে ভদ্রে ক্ষিতীশের চায়ের দোকানে আসে। সবসময় ব্যস্ত। দেখা হতে শুধু ঘাড় কাৎ করে হাসি উপহার। অনির্বাণের কথাটা কদিন আগেকার স্মৃতি উস্কে দিল। যথেষ্ট ঘৃণা গলায় উগরে বলল, —ডু আই বেগ?

আমি কিন্তু এসব ভেবে বলিনি। ভিক্ষের কথা বলছিস কেন?

কোন কথার কি অর্থ হয় আমি জানি অনির্বাণ।

অথচ অনির্বাণ জানে সুহিতের লাল জামাটার প্রতি বিভাসের কি অসীম দুর্বলতা। একথাটা অন্য বন্ধুদের জানাতেও ভোলেনি সুহিত ব্যানার্জী।

এটা তবে কি বিভাসের শোম্যানশীপ! আজকাল নাকি রাজনীতি করছে বলে সব শালা ধান্দাবাজ। চামচাবাজীতে দেশ ভরে গেছে।

অপ্রস্তুত অনির্বাণ বিভাসের কথায় থমকে গেল। বলল, না জেনে তোকে হার্ট করে থাকলে মাপ করে দিস।

অবশ্য বিভাস এইরকম। রাগ করা যায়না ওর ওপর। একটু পরেই কিন্তু যে কে সেই। অনির্বাণ প্রসঙ্গ পালটে বলল,—সুহিত বিয়ে করেছে শুনলাম।

হ্যাঁ কবজি ডুবিয়ে বৌভাত খেয়ে এলাম।

চাকরিও করছে। এস ডি ও'র সঙ্গে ক্রিকেট খেলে কাজ হাসিল করে ফেলল। তুই-ই কিছু পারলি না।

তুই তো জানিস অনির্বাণ, প্রয়োজনের কথা অন্যকে জানানোর থেকে আমি মরে যাব। সুযোগ নেওয়া অথবা করে দেওয়া দুইই আমার কাছে অন্যায়। একটু থেমে বলল, ছাড় ওসব। চিরকাল কি আর এমনি কাটবে!

ওরা পথ চলছিল। রাস্তার পাশের শিশুগাছের পাতাপত্তরের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো। এর মধ্যেই লাল জামার কথা মনে হ'চ্ছে বিভাসের। সুহিত দিয়ে দেবে বলেছিল, আর একবার উচ্চারণ করল না! সেই স্কারলেট রেড শার্ট। সুহিতের কাছে জামাটা নাকি বেশ পয়া। মাঠে রান পেয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবার তারই শিকার। ঐ জামা গায়ে মিটিং মিছিল 'দিতে হবে' 'করতে হবে' করেছে। ওটা গায়ে দেওয়ার পর থেকে প্রতিমার সঙ্গে সম্পর্কটা আবার রিভাইভ করে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলতে পারল!

হঠাৎই সুহিত। দেখা হোতেই যে কে সেই। আরে, অনির্বাণ না গড শনির বান, কবে এলে!

কালকে, ভাল আছিস তো?

ও ফাইন। প্রতিমার কোলে সুহিতবাবু দোলে। কি সুখ কি সুখ।

অনির্বাণ সুহিতকে ভাল করে জরীপ করল। আজ শাদা প্যান্ট লাল শার্ট নেই। পাটভাঙা ধবধবে শাদা পাজামা পাঞ্জাবী। ঠোঁটের কোণায় সিগারেট। ধাঁ করে পকেটে হাত চালিয়ে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বার করল। দু'জনকে দুটো অফার করল। দাদা বিজিত, প্রেজেন্ট করেছে। গাঁটের পয়সার না। বর্ডারের টানা মাল। বা শালা, হারামের পয়সা।

বিভাস সিগারেটে আগুন ছুঁইয়ে গলগলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। চোখটা

কুঁচকে সুহিতের দিকে ফিরে বলল, আমার হিতসাধনের কথা বেমালুম ভুলে গেলি সুহিত !

জিজ্ঞাসার সমুদয় বিস্ময় সুহিতে ঘনায় ।—কি ব্যাপার বলতো ?

লাল জামাটা কি এখনও তোর কাজে লাগছে ?

অনির্বাণের ভেতর বিভাসের একটু আগে বলা কথাটা তোলপাড় করে উঠল। 'ডু আই বেগ টু ইউ' ?—একজন সেধে দিচ্ছে, অন্যজন দিতে না পেরে ভুলে থাকার ছল করছে। বিভাসের মধ্যেকার এই বৈপরীত্য অনির্বাণের মনে সূক্ষ্ম বিস্ময় সৃষ্টি করল। অথচ কিছু বলল না।

আশ্চর্য হোল, সুহিত। বিভাসটা ভুলেও ভোলে না। প্রতিমা জানতে পারলে কি ভাববে! বিয়ে শাদির পরে বন্ধুত্ব ফন্ধুত্ব রাখা ভারি ঝামেলার ব্যাপার। মাঝখানে কতগুলো দিন পার হোয়ে গেছে। ভবি ভোলবার নয়। সেই জামা, খেলার মাঠে বারবার ব্যর্থ হওয়া জামাখানা। প্রতিমার সঙ্গে কেস প্রায় কিচাইন হোতে হোতে ঘাট আঘাটায় ঠোক্কর খেতে খেতে পার্মানেন্টলি বেড পার্টনারশিপের বন্দোবস্ত। সবচেয়ে বড় কাজ জামাটার রাজসিক কেতা সরকারী চাকরির চেয়ার পাইয়ে দিয়েছে। ওটাকে তো ব্যক্তিগত মিউজিয়ামে প্রিজার্ভ করা উচিত। অথচ কি যে বলে বন্ধুকে! কোন কুক্ষণে যে বলে ফেলেছিল দিয়ে দেওয়ার কথা। এতদিনে বিভাসের ভুলে যাওয়া উচিত ছিল।

পুরোনো ঐ জামাটা তোর কি পছন্দ হবে, এতদিন পরে ?

আরও বেশী পছন্দ হবে। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। বিভাস হাসল। অর্থাৎ চিল যখন পড়েছে কুটোটুকু না নিয়ে উড়বে না।

অতএব কর্তব্য পালন করতেই হয়। এখন বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো যথেষ্ট এড়িয়েই চলার চেষ্টা করে। প্রতিশ্রুতির কথা মনে হয়। কিন্তু ভাবত বিভাস ভুলে যাবে। অথবা চেয়েচিন্তে নেওয়ার লজ্জায় আর একবারও স্মরণ করিয়ে দেবে না। অনির্বাণের সামনে আজ আর কাটানো গেল না। তাই বলল,—আজ বিকেলে আমার বাড়ি আয়। আমার পয়মন্ত জামাখানা তোকে দেব। দেখ, জীবনে কিছু বদলায় কিনা।

অনির্বাণের কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন আত্মসম্মানের প্রশ্ন হোয়ে দেখা দেয়। সুহিত পাশ কাটাল। ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে বিভাস বলল, ওর স্কারলেট রেড শার্ট আমার কাছে চিরকাল পরাজিত। আমাকে জয় করা জামাখানা আমি চাই। সুহিতকে আমি হারাতে চাই।

সুহিতের বাড়িতে ওর বিয়ের পরে আজ প্রথম। বারান্দা ঘেরা গ্রিলের আড়াল। গেটটা খোলা। দরজায় মেরুণ রঙের ভারি পর্দা। কলিং বেলের বোতামে হাত দিতে গিয়ে নামিয়ে নিল বিভাস। নিজের জামা প্যান্টের দিকে চাইল। কাঁধ ছেঁড়া সেই জামাখানা। কেনবার পর থেকে যার বোতামগুলো একবারও আটকানো হয়নি। বিবর্ণ প্যান্টে কতদিনের ধুলো ময়লা জড়ানো। গালে দাড়ির ঘন বুনোট। চেহারাখানা কি হাজারের সাইনবোর্ড মনে হোচ্ছে। আসবার সময় খোপনাখানা একবার আরশি-চর্চা করে আসলে ভাল হোত। বিশেষ করে সুহিতের চাকরি করা বৌ প্রতিমা যদি স্বামীর বন্ধু বলে রেকগনাইজ না করে। যদি সুহিত বাড়ি না থাকে, তবে কি বলবে? যদিও প্রতিমা তাকে চেনে, তবে বিয়ের পরে মেয়েদের ভাবসাব নাকি বদলে যায়। তার ওপর দিতে আসলে মহৎ মনে হয়, কিন্তু চাইতে আসলে?

ভাবতে ভাবতে কলিং বেল পুশ করতেই কোকিলের ডাক শোনা গেল। এ বাড়ির বারমাসের নিজেকে খুব অপ্রতিভ মনে হোচ্ছে। সত্যিই কি জামাটা দরকার। ঠাট্টা করে বলা কথার মধ্যে কখন যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোয়েছিল দু'জনে। তারপর যদি নিজেও একটু মানিয়ে গুছিয়ে আসত! বন্ধুত্বেরও একটা সম্মান থাকে। বিশেষ করে তার বৌয়ের সামনে। তাছাড়া সুহিত তো ইদানীং বেশ এড়িয়েই চলে! এখনও কি বন্ধুকে এড়িয়ে থাকতে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

ভাবনার মধ্যে পর্দা তুলে প্রতিমা। মুখে চোখে বিরক্তির ভাব। কতদিন সুহিতের সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছে। ওর নামে কবিতা লিখে কাগজে ছেপেছে, সুহিতের মর্যাদা বাড়িয়েছে। বিয়ের পরে আজ প্রথম, অথচ কি অসাধারণ পরিবর্তন!

আমি বিভাস। এখন কি নাম ধরে ডাকা যায়! নইলে কি বলে ডাকা যেতে পারে, বুঝতে পারলনা।—সুহিত আসতে বলেছিল। বলার মধ্যে যেন গলা কেঁপে গেল। ঢোক গিলল।

ও তো বাড়ি নেই।

কখন আসবে?

কেন, খুব দরকার বুঝি? ওর চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। তবে কি জামার কথা শুনতে চাইছে।

না, অনেকদিন দেখা হয়নিতো। আর অনির্বাণ এসেছে, ওকে দেখা

করতে বলবেন। এমনিই সম্বোধনে সম্মানজনক আপনি আজ্ঞে বেরিয়ে গেল।

এবার পর্দা তুলে সবটুকু প্রকাশিত হোল প্রতিমা। সামনে গ্রিলের জাফরি, গেট, ওপাশে বিভাস। প্রতিমা ডাকলনা। বসতে বললনা। শুধু বলল, একটু দাঁড়ান। আপনার জন্যে একটা জিনিষ রেখে গেছে। প্রতিমা ভেতরে চলে গেল।

বিভাস ঘামছে। সুহিত নিজের হাতে না দিয়ে বৌয়ের হাত দিয়ে ভিক্ষে দিচ্ছে! এখন কি চলে যাওয়া উচিত। এখন কি জামার প্রসঙ্গ অন্যভাবে পালটে ফেলা যায়! প্রতিমা এরপর কি ভিক্ষে নিয়ে আসবে!

হাতে সেই জামাখানা নিয়ে প্রতিমা এলো। জামাটা বোধ হয় দলা মোচড়ানো করে রাখা ছিল কোথাও। স্বামীর বলে যাওয়া কাজটুকু করতে এখন বিভাসের সামনে সে। চোখে মুখে কেমন কষ্টের ছাপ। বোধ হয় জামাটা দিতে মন চাইছে না। আর কোন কথা না বলে তোল্লা করে জামাটা ছুঁড়ে দিল বিভাসের দিকে। খোলা গেটের মধ্যে দিয়ে শূন্যে ভেসে জামাটা নেমে আসছে তার হাতে। একখানা হাতা ঝুলে পড়ল দলা থেকে। খেলার মাঠে যেভাবে ফিরতি বলের ক্যাচ ধরে সেভাবে বিভাস আঁকড়ে ধরল জামাখানা।

পরতে পরতে সুহিতের ঘাম ময়লার গন্ধ। বহু ব্যবহারে বাসটে। স্কারলেট রেড শার্ট ছিল সুহিতের খোলশ। এখন বিভাসের তালুবন্দী।

ধন্যবাদ জানানোর আগেই প্রতিমা সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নির্বন্ধ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

এই যে নির্বন্ধ দুটি, মোটা ভাতকাপড়ে যাক চ'লে।
তারা ঘাস কাটতে শিখুক, আস্তে পারুক অন্তত
পাঁচশো গ্রাম।...
তাদের দু-তিনটি ছেলে, চার মেয়ে; ঐ তো হেলে দুলে
বস্তিতে, ইটের অবিশ্বাসে
বড়ো হয়।
অ্যাত্তো বড়ো—
এইভাবেও হয়েছে বলার মতো কথা।

ঘাস কাটুক; মুখখারাপ না ক'রে—গভীর চাষবাস
সংসারের,
তিনটি থানইটে এনে তোলো।
মুখে-আগুন দাও আর খুব সেদ্ধ করো,
ঘাসসিদ্ধ প্রেমের দেবতা।

প্রজাপতিদের স্বার্থে, এ-ও দুব্বোঘাস-ছেঁড়া সার্থক প্রণয় নয় কি?
কে কে রুদ্রাক্ষের চৈত্র, কে চণ্ডাল
ছোটো-হয়ে আছে কিন্তু ছায়াবৌদি খুন হবেন তখনো কল্পনা!
কপালেই একটু বড়ো হয়ে এক সূর্য উঠলো
যদি, কেন ছায়া চলে গেলো গাছতলার
বস্তি থেকে?
সে কি তবে ঘাসের অভাবে নকলি
সোনার থানইট-ও পায়নি ব'লে?

প্রক্ষিপ্ত প্রহর

সামসুল হক

জয়ে নয় পরাজয়ে নয় যুদ্ধ শেষ হলো উদাসীনতায়
শ্রাবণের ফসলের বিছানার রাস্তার প্রাণের যুদ্ধ শেষ
বাইশে শ্রাবণে আজ উজ্জ্বল অশ্রুর দুঃখ নেই
বন্যায় গাছের কিংবা কাদার অপ্রবহমাণতার হাহা নেই
কে কাকে মেরেছে মুগ্ধ শ্মশানে জানি না
কে কাকে খেয়েছে আজ বিচিত্রিত ডাস্টবিনে সত্যি জানা নেই
শিশুদের মুণ্ড কে ছুড়েছে
সেই হিশেবের খাতা উদাসীনতার পোকা নিয়ে গেছে সত্যের ওপারে
তবে কে ব্লাউজ খুলে শাড়ি খুলে মন্দিরা ও স্বরলিপি খুলে
কল্পনার অপেক্ষায় আছো
কল্পনা যুদ্ধের অংশ নক্ষত্রের যুদ্ধ শেষ হলো
না উদাসীনতাও এক যুদ্ধ
নারীকে পুরুষ বলে নারীকে নারীরা বলে হেঁকে বলে শ্মশানবন্ধুরা
হেঁকে বলে মৃত মৃতা মৃত্যুকে মৃত্যুরা
নোতুন বাঁধাইখানা কীটদষ্ট গ্রন্থকে বলছে আমি শুনি
কামারশালায় কাজ রয়ে গেছে ঘনঘোর অন্ধকারে বাইশে শ্রাবণে

সাঁঝবিকেলের ফুল

বাসুদেব দেব

জুড়িয়ে আসে আগুন ফুরিয়ে আসে ঋতু
বাড়ানো দুই হাতে যা দিতে তাই নিতুম
দিলে তো শুধা বালি অজস্র আলপিন
অনেক ছেঁড়া কাগজ তাপিত কিছু দিনই
তাই নিয়ে যাই চলে আমি এমন ভীতু
চাই নি সাহস করে বাগান থেকে ছুটি
সাঁঝ বিকেলের ফুল, এবার তবে ছুটি
জুড়িয়ে আসে বেলা ফুরিয়ে আসে ঋতু
এবার আমার আগুন আকাশে হবে থিতু

আমার বাড়ি

গণেশ বসু

একটুখানি সুখের লোভে অনেক কিছু ছাড়তে হলো
বাতাস, তুমি এই কথাটা ওদের বোলো।
যখন ফেরে শরীর টেনে আপিস-ভাঙা হাজার ভিড়ে
রাতে কি আর কুন্দ ফোটে সে মন ঘিরে ?
সারাটা দিন সময় কাটে যে যার কাজে
সারাটা রাত ধ্বস্ত বুকে করুণ সুরে সেতার বাজে।

একটুখানি সুখের লোভে অনেক কিছু ছাড়তে হলো
আকাশ, তুমি এই কথাটা ওদের বোলো।
জ্যোৎস্না কত খুন করেছি রাতবিরেতে এই বাগানে
শব্দ কত বধির হলো কেই বা জানে ?
উড়িয়ে দিই ছন্দ ছবি কাপাস তুলো
উড়িয়ে দিই রক্তজবা কেশরফোলা ঘূর্ণি ধুলো।

একটুখানি সুখের লোভে অনেক কিছু ছাড়তে হলো
আমার বাড়ি, এই কথাটা ওদের বোলো।
কোন অসুখে যৌবনেরই মুখগুলোকে ঝাপসা রেখে
মেঘের ভিড়ে হারিয়ে যাই ভস্ম মেখে
তোমার ভিতে আমার কত অশ্রু জমা
খা-খা বুকের শুকনো পাতা জীবন্মৃত দুঃখ অমা।

একটুখানি সুখের লোভে অনেক কিছু ছাড়তে হলো,
ছাড়তে হলো,
অগ্নি তুমি এসব কথা ওদের বোলো,
ওদের বোলো।

ভোর

শুভ বসু

পাপড়ি মেলা একটি রক্তজবার
প্রবল অট্টহাসির আওয়াজ শুনবে,
এই উদ্বেগে কাঁপছে আকাশে হাজার হাজার তারার
নিরন্ত ধমকানির সামনে স্বভাবত বিহ্বল
মরণাপন্ন রাত্রির প্রায় সবখানি স্নায়ুপুঞ্জ।

নেপথ্যে তাই দুটি কি চারটি ডানার আচমকা ছটফট,
কয়েকটি কুঁড়ি অধীর আবেগে আনন দেখবে ধরিত্রীর
—সেই উৎসাহে ডাইনে ও বাঁয়ে দুলছে।

অবৈধ সংগমের স্বপ্নে ছেদ পড়তেই মেয়েটি
চোখ খুলে দেখে, তিমিরকৃষ্ণ গাঢ়তা
ফিকে হয়ে গেছে, সুদূর কোথায় কোনখানে জবা ফুটল
বাতাসে আবেশ রচনা করেছে সে সংবাদ।

প্রৌঢ়ার খোলা মুখটির দিকে তাকিয়ে
অবসানবেলা আসন্ন বোধে ধ্বস্ত নিশীথ যাপনে
যা কিছু বিষাদ, বিলাপ, স্মৃতির দংশন ভুলে
বীমা পটিয়স স্বামীটি হঠাৎ দেখে ফেললেন
এতদিন খুঁজে-জেরবার সেই মোহন বিশ্বরূপ।

এইসব দেখে দেখে ক্রমশ প্রসন্ন ঐ আকাশের শান্তস্মিত মুখে
ঝলমল করে আকাশ মাতায় নীলা চুনি আর পান্না।

যৌবনের কথা

নীরদ রায়

এলোমেলো এক ধোঁয়ার দিকে ছুটে যাচ্ছে সোম শুক্র শনি
চেনাজানা বাড়ির সামনের রাস্তাগুলিতে এখন শুধুই মেঘলা আকাশ
এসময় দু-একবার যৌবনের কথা ভাবা ভালো
আগুন কখনো জানতে চায়না তার পিতৃপরিচয়
তবু এসময় দু-একবার আগুনের শুভেচ্ছা নেয়া ভালো,
বিকেলবেলা জল ঘুমিয়ে পড়ে জলের বিছানায়
সত্যি মিথ্যে না জেনে সকলের প্রিয় ফাল্গুনটিও
পালায় গ্রাম ছেড়ে পলাশ ও রুগ্ন নদীটিকে একলা ফেলে,
দুঃখের পাশ দিয়ে তর তর করে বয়ে যাওয়া যে সময়
একদিন সেও তার প্রেমিকার হাতের লেখা বুঝতে না পেরে
ভুল করে চলে যায় অন্যকোথাও,
—এরকম সময় দু-একবার যৌবনের কথা ভাবা ভালো !

লয়

অমল চক্রবর্তী

আঙুলে যারা নাচে এ হল তাদের মানানসই
একে কি চিহ্ন বলবে তুমি ? ধরো
এই যে নিশ্বাস নেই এই শূন্যতার কোনো পূরক নেই
ছিঁড়ে পড়ছে সমস্ত পুরুষবাচক শব্দ, তাহলে
বুঝে নিতে হবে আশ্রয়ের বিন্দুতে কেউ আর নারীকে আঁকবে না
এই থুতু তোমার, এই বমি তোমার, এ রক্তও তোমার
আর এই চুম্বনও তোমারি, শুধু আমার মাথায়
যখন ঝরিয়ে দাও কোথাও না-থাকা ছায়া
আমার নিচু শান্ত পাশফেরা ধ্যানের বুদ্ধপ্রলয়
কোনো গাছ কাঠ দেবে না তাকে পেরেকে গাঁথতে
সমস্ত ক্রেনের শব্দ তার পায়ের পাশে শুয়ে পড়বে পোষা বেড়াল

কোথাও কোনো অবেলার ঢেকুর উঠবে না
শুধু স্বপ্ন থাকবে খুব নিচু থেকে গান
আর এখন ধোঁয়া নাচছে

এ কোনো চিহ্ন নয়, আমাদের পোড়া গন্ধ, আর
তুমিও তো আমারি

সময়ের শিল্পরূপ

পরিমল চক্রবর্তী

কেবলই বয়স বাড়ে, আয়ু থেকে বৃন্ত চ্যুত হয়।
সময় অস্থির বড়ো, বহমান এই সময়ের
চতুর্দিকে মত্ত ঢেউ গর্জমান সমুদ্রের মতো
উত্তাল বিভঙ্গে ভাঙে, যেন ফোঁসে সহস্র সর্পিনী

অথচ সময় কিন্তু স্বরূপত ভীষণ তন্ময়
শিল্পের আত্মজা, যেন প্রতিরূপ শিল্প-স্বভাবের ;
সময়ের শিল্পরূপ বুঝি তাই অসূয়া-উদ্ধত
রুদ্রের দোসর, তীব্র অন্ধকার অথচ অঋণী ॥

সংস্কার

অনীক রুদ্র

আমাকে ছুঁলো না আলোয়ান
আমি কিন্তু প্রায় দেখো ভুলে গেছি
দীপনের কথা
স্বারোপিত আমি বশ্যতায়
মনে করি মুখ
অ্যাতোটা আবছা যার ভালো একটা
নজরে আসে না

ঝোলানো বর্ণিল ছবি প্রতীকের মতো মনে হয়
এই যে নৃমুণ্ডমালা, নিবেদনে চলে যাবে
বাকিদিন দয়ার স্ববাদে
মাটিতে পোকার রাজ্য ফসফরাস বিছিয়ে দেবে কি
যদি আমি দীপ্য হই, ভুল করে উল্কা হয়ে যাই

হাড়

ধীমান চক্রবর্তী

১.

একটা ফুটো ক'রে মেঘ নেমে এসে
ঢেকে দিচ্ছে আমার হাড়ের ফর্সা
মাংস বলতে শরীরে দু-চারটে ভাঙা সূর্য।
মুখ উল্টে শুয়ে আছি ছাদে।
হাড়ই আমার মাকড়সা বা ঘোড়া।
হামাগুঁড়ি দিতে এবং খুব ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।
পাথরেরা ঘুম থেকে জেগে
কোমর বাঁকিয়ে বলে ওঠে সুপ্রভাত।
স্পঞ্জরা রাতারাতি সমুদ্র-সিঁড়ি বেয়ে উঠে
ছেয়ে ফেলছে এই বন্দর শহর।

২.

ভাবছি ছাদ থেকে নেমে একটু রান্নাঘরে যাই,
দেখি ক্যাবিনেটটা ফিরে এলো কীনা।
কালরাতে রাগারাগির পর
একটা শিমূল গাছ হয়ে
সে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। এদিকে
আমার হাড়েরা শরীর থেকে আলাদা
হতে চেয়ে, থাক থাক মেঘ হয়ে
ঝুলে রয়েছে হ্যাঙারে, কিছু
কাচশহরে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়েছে নিজেদেরই।

৩

এই প্যাডেল-নৌকায় বসে আছি।
আস্তে আস্তে কে যেন টানছে বন্দরে,
টানছে রেখে আসা অ্যাণ্টেনার দিকে।
চারজন পাথর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
গলা মুচড়ে ফেলে আর নিজেদের দিকে
একেকটা ক'রে ছুঁড়ে দিচ্ছে তাস।
সারি সারি পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না।
বেড়ার উপর, হ্যাঙারের উপর।
হাড়ের উপরও কি?

৪

দুটি দোয়াত বেশ কিছুটা কালি খাওয়ার পর
এঘর ওঘর হেঁটে বেড়াচ্ছিল।
শেষে শিমূল গাছের গলা ধরে
ঝুলে রয়েছে। ক্যাবিনেটটা নিজের জায়গায়
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, মুখস্থ ক'রছে
ধারাপাত আর মিথ্যে বর্ণনা।
অ্যাণ্টেনা থেকে মেঘের গান
প্রাণপণে ঝুঁটি ফুলিয়ে ডাকছে। আমি
ইতস্তত ক'রছি প্যাডেল-নৌকা ফেলে
দৌড় দেব কীনা
জল-ক্ষেতের উপর দিয়ে টগবগে।

৫.

হাড়ের শরীর ও হ্যাঙার থেকে নেমে
হাঁটতে হাঁটতে বিছানার পাশে।
টোকা দিয়ে ফেলে দেয় মিক্সচারের শিশি.
দু-আঙুলে ছিঁড়ে ফেলছে সুইসাইড-নোট,
টেনে গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত
তুলে দিচ্ছে সাদা মোজা, আর
মাকসার ওড়াতে ওড়াতে চেঁচিয়ে উঠছে
নো-ট্রাম্প।

সূর্যকে রাত্রিতপস্বীর চিঠি

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

আকাশ তরল হয়ে নেমে আসে শরীরে শরীরে। এসো, সূর্য। এসো। আজও মনে কি রেখেছ সব কটু কথা তোমাকে যা এতোদিন অক্লেশে বলেছি? আমিও তোমাকে ডাকছি, এসো আজ, দগ্ধ করো বাইরে ভিতরে, পোড়াও গভীর থেকে উর্ধতল, রোমকূপ, চামড়া অবধি। কেন এই অন্যায় আকাঙ্ক্ষা? কেন এ পুরুষজন্ম? এসো আজ, সকলকে শিখার মতো সত্য বলে যাও।

আজ এই দীর্ঘ রাত, দীর্ঘ, ঠাণ্ডা, কালো এই রাতটিকে এই রাত্রিতপস্বীরও বড় ভয়ানক মনে হল। মনে হল তামাটে ধূসর এক ছেলেবেলা, পুরুষজন্মের এই অভিশাপ কেবলই পিছন থেকে টেনে ধরছে, আমাকে লজ্জায় খুব কুঁকড়ে দিচ্ছে ওর কাছে, দ্বিধায় থমকে যাচ্ছে ওর দিকে মেলে ধরা হাত, আর আমি হয়ে যাচ্ছি আরো কালো, এই রাত্রিটির মতো।

তথাপি জ্যোৎস্নার মতো—ও আমাকে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ভালোবাসে—এতোখানি গভীর আশ্বাস এই শীতে আমাকে জাগিয়ে রাখল সারারাত, সারারাত অদ্ভুত অচেনা এক ভেজা ভেজা আলো পরতে পরতে খুলে গেল চোখের তারায়। পরাজয় তিক্ত স্বাদ এনে দেয়। তবু যখন নিতান্ত কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকারই মানে গভীরে নিজের কাছে পরাজয়, শুধু ভালোবাসার কাছেই এই পরাজয় সহনীয় মনে হতে পারে। তোমার উত্তাপটুকু সাক্ষী থাক—আগামীতে ন্যূনতম অর্ধেক শতাব্দী ওর জীবনের প্রতি সেকেণ্ডের প্রতিটি ভগ্নাংশে যেন আমি থাকি; হয়তো অন্যায্য এই অধিকারবোধ, তবু তা না হলে ঠিকই নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে খুব।

সূর্যদেব, রাত্রিতপস্বীর এই চিঠিখানি কোনো ফাঁকে অবসরে পড়ো।

সুখ-দুঃখের কবিতা

নন্দিতা চৌধুরী

ওরা সুখীদের জন্য ফের
প্রসাদী মাংস রুটি এনেছে।
ওরা সেখানেই রয়েছে
ইতর প্রাণীদের সেবা করে
যেদিকে নজর সেদিকে
দাঁড় করিয়ে রেখেছি
ঝর্ণার শহর, মিছিলের শহর।

তোমার শিরা জাগানো মুখে
ছিন্নান্তরের আভাস।
তবু তো আনো বিনিদ্র হাতুড়ী, রাইফেল
আমার বুকের ওপর তরুণদের
আন্দোলিত হাত।

শীতের সবে শুরু।
তোমাকে ছুঁয়ে আছি নেকড়ের অশ্রুপাতে
ভর দিয়ে—মর্চে ধরা শিকলের ছায়ায়।
শরীর ভাঙলে সেই নীল জাহাজ নিয়ে ফিরে আসে।
নারেং তরঙ্গ সমুদ্রের ঝিনুক খায়
বন্দরের গান গায়।

আর একটু পরে নক্ষত্র উঠবে
সাম গানে ভরে যাবে রাত্রি।
ভরে যাবে শ্মশান।
মধ্যবিত্ত মশারি থেকে কবিতার কম্বল তুলে নাও
তুলে নাও কাকদ্বীপের ছেনালিপনা।
আমি পশ্চিমী চরিত্র হননে-একসম্পূর্ণ মানুষ
শুধু দুর্ঘটনা ঘটে যায়, চোখের ভিতরে,
দোয়াত কলমের ডগায়।

না কোন উপমা নয়
বারুদের চাপা ফিস্‌ফাসে
ওদের তুমি নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছো,
প্রথম দর্শনেই প্রেম, রাজনৈতিক উন্মোচন,
ঘাসের জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ।
কবিতা এক লহমায় ফেটে পড়ে,
তুমি চলে যাবে নোঙর ভাসিয়ে
ওগো বাংলাদেশ—
রক্তে বন্দী ঐ মানুষটাকে সাড়া দাও।

বৌদ্ধ বাংলায়

অরুণ মুখোপাধ্যায়

কখনো চলে এলে বৌদ্ধ বাংলায়
আমার সঙ্গে দেখা করে যেও,
যদিও অহল্যা জমি আবাদি হতো অনেককাল আগে
তার কিছু টুকরো খবর পেয়ে যেতে পারো,
অনেক দলিল দস্তাবেজ ঘাটতে ঘাটতে
আমি প্রায় এক শতাব্দীর ক্লান্তিতে পৌঁছে গেছি,
জমিজিরাত হাত ফেরের কড়চায়
আমার সমস্ত শব্দ এখন প্রাচীন হয়ে গেছে,
বৌদ্ধ বাংলায় এখন পর্যটন শিল্প নিয়ে
দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি চলেছে,
লোহার দোলনায় দুলতে দুলতে ঘুমিয়ে পড়েছে
অতীত আর ভবিষ্যৎ ;
আমার বাড়ির দরজায় এসে গুনে গুনে তিনবার
ঝুটিবাহার শব্দ বলে ডেকো,
দু'বার নরম ঝিঙে ফুল শব্দের মতন টোকা মেরো,
তারপর তোমার পায়ের কাছে
মধ্যরাতের একটুকরো জ্যোৎস্না এসে পড়লেই
আমি দরজা খুলে দেবো,
কখনো চলে এলে বৌদ্ধবাংলায়
আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

যখন রোদ্দুর

রেণুকা পাত্র

আমি বলতে পারি না
রোদ্দুর কেমনভাবে আমার
জানলা ধুইয়ে দেয়,

আমার চুলের ভেতর
যখন স্বচ্ছন্দ প্রভাত
কয়েকটুকরো স্মৃতি ও স্বাধীনতা…
আমার চোখকে তখন
বিনম্র আর মুক্ত রাখে
তোমাদের সাথে আমার কণ্ঠস্বর
মিলে যায়.
ঐকতানে।

এক জীবনের,পরিভাষা
আরেক জীবন খুঁজে—
কোথায় দাঁড়াব বলো
উপরে না নীচে।

হাওয়া এবং পাতারা

শুভ মিত্র

গাছেরা পাতা ঝরিয়ে দেয়
যদি উড়িয়ে নেয় হাওয়া—
অন্ধকারে মোম গলে
যদি উজ্জ্বল হয় আলো,
শুধু জমে ওঠে 'যদি'
শুকনো পাতার স্তূপ,
মোমের পাহাড়।
সামনের সাঁকোটা পেরোলেই,
বাড়ানো হাত তোমাকে ডেকে নেবে
সামনের সাঁকোটা পেরোলেই
অকাঙ্ক্ষার মাতামাতি ঝড়…

মানুষ সরল সিদ্ধান্তের মতো সত্য

ফেরদৌস নাহার

আমি একজন মানুষের কথা জানতাম
যার বুকে গাঁথা ছিল তীক্ষ্ণ ধারালো বল্লম
আর সে ইচ্ছে করেই সেই বল্লমটা গেঁথে বেড়াতো,
এ ভাবেই মানুষকে জানতে হয়।
কায়দা মানুষ যতো শেখা হলে পর
মানুষ আর কানুন থাকে না, বর্তমান চেখে খায় ভবিষ্যৎ

আমার চোখ ছিল একটি প্রয়াত নদীর শোক
আর এখন তা বিচ্ছিন্ন হতে হতে
মরুভূমির প্রান্ত রেখায় মিশে যায় ধূ ধূ।
কারো কারো শখের স্বভাব থাকে
পোষা পাখি, কুকুর বিড়াল এবং আরো কিছু
কেবল শখের অসুখ থেকে হাড্ডিসার
নাবালক ভুলভ্রান্তি সহসাই উঁকি দেয়,
সৌন্দর্য সভায় বসে হঠাৎ মনে হয়
ভীষণ কুৎসিত এবং অনেকটা ব্যাধিগ্রস্ত এসব
নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—জটিল বিভ্রান্ত সময়,
ছিন্নভিন্ন পরিচয়, অস্পষ্ট আঁধারের পাশাপাশি
হেঁটে চলে. নির্লজ্জ অহংকারে শব্দ ক'রে হাসে
আর ঠিক তখনই
ঐ বল্লমটা শক্তমুঠিতে ধ'রে ভয়ঙ্কর চিৎকারে
মানুষের পরিচয় ত্রিলোক কাঁপিয়ে জেগে ওঠে।

হার্ট অ্যাটাকের পূর্বমুহূর্তে

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ধমনীর ফেন্‌সিং-এ বসে আছে একটি বুদ্‌বুদ,
লাল, নীল ঢেউ এসে হাত নাড়ে—আয়, চলে আয়,
চুপি চুপি আসে তারা সাদা ছোট মুক্তোর মতন
কে জানে কখন তার শুরু হবে শেষ অভিযান।

সবুজ দ্বীপের মধ্যে মায়াময় দুটি কালো চোখ
এই শুধু স্মৃতি তার, বাকিটুকু ঘুম. জেগে ওঠা
ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি হৃদপিণ্ডে বাজালে দুন্দুভি
অমল স্রোতের জলে ঝাঁপ দিয়ে ভেসে ভেসে যাওয়া—

কোথায় থামবে এসে, কে তাকে নামাবে হাত ধরে,
ঢেউগুলি ছোট ছোট, বেলেমাটি, নুড়ি, কালো শিলা
অবিকল ভ্রমরের বেশ ধরে যদি কেউ আসে
'চিনতে পারবে তো তাকে', প্রাণবিন্দু, ঐ পরবাসে ?

ভোর তেরশ নিরানব্বই

সুরজিৎ ঘোষ

আমি জানতাম ভোর—নরম ঘাসফুলের ওপর হাওয়ার ছুটোছুটি আর ঘুমভাঙা পাখিদের ব্যস্ত হাঁকডাক। জানতাম সেই ছোট ফড়িংটার ডানা, যার ভেতর দিয়ে তিরতির করে গলে আসত রোদ। আর সেই মসৃণ কালো মধুর বিষ ভ্রমর—দেখতাম তাদের। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখের গভীর সুন্দর। কিন্তু কখন ছায়া ফেলল এই মেঘের সামিয়ানা! —শুধুই কি অন্ধকার, সেইসঙ্গে এসেছে দমবন্ধকরা গুমোট আতঙ্ক, গাছের গা থেকে শিশিরের বদলে টপটপ করে ঝরছে ঘাম আর পাখির বদলে গর্জন করে উঠছে একসঙ্গে হাজারটা রেডিও, লাউডস্পীকার আর 'ঝুমা চুমা দে দে চুমা'। তেরশ নিরানব্বইয়ের ভোর এগিয়ে আসছে বাতাসে ডানা ছড়িয়ে নয়—মাটিতে ধুপধুপ তুলে। ছন্দ ভেঙে যাচ্ছে বেসুরে, ছবির বদলে দগ্‌দগ্‌ করছে ছেঁড়া ক্যানভাস।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* কবিতা শাদা ফুলস্কেপ কাগজে (রুল টানা নয়) পাঠাবেন।
* কাগজের এক পৃষ্ঠায় কবিতা পাঠাবেন।
* একাধিক কবিতা পাঠালে একেকটি কাগজে একেকটি কবিতা পাঠাবেন. একই কাগজে দুটি কবিতা পাঠাবেন না।

পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণ মিত্র

ধনঞ্জয় দাশ

'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, 'আড্ডা বসতে শুরু হয় প্রতি শুক্রবার, এর কিছু আগে থেকে।' আর, 'পরিচয়-এর আড্ডা'-র ডায়েরি যিনি ১৯৩২ সাল থেকে প্রায় নিয়মিতভাবেই রাখতেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সেই শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ 'আড্ডার পরিচয়'-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। আসর বসতে শুরু হয় আরও কিছু আগে থেকে, বোধ করি গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও সুশোভনচন্দ্র সরকার আর লক্ষ্ণৌ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আসবার পর কোনও সময়ে।"

'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ এবং আড্ডার যখন শুরু শ্রমিকনেতা রাধারমণ মিত্র তখন ঐতিহাসিক মীরাট কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী। সুতরাং সেই সময় তাঁর 'পরিচয়'-এর আড্ডায় যোগদানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা জানি, ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ থেকে ১৯৩৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত বন্দীজীবন যাপন করার পর হাইকোর্টের রায়ে রাধারমণকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। আমরা এটাও জানি, দীর্ঘ চার বছরের বন্দীজীবনে রাধারমণ মার্কসবাদের মৌলিক গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্য না হয়েও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীন-ভাবে ঘোষণা করেন, 'আই অ্যাম এ কমিউনিস্ট বাই কনভিকশন'।

যাহোক, কারামুক্তির পর রাধারমণ ফিরে এলেন কলকাতায়। এই সময় মার্কসীয় দর্শনের চর্চা এবং এই মতাদর্শ প্রচার করাই হয়ে উঠলো তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। এছাড়া মানববিদ্যার প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তিনি ছিলেন বিচরণশীল। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা, নিরভিমান পাণ্ডিত্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং অসাধারণ বাগ্মিতার কথা ১৯৩৫-৩৬ সালে কলকাতার বিদ্বজ্জন-দের ঘরোয়া এবং পারিবারিক আড্ডায় একেবারে অপরিচিত ছিল না।

'পরিচয়'-এর আড্ডাতেও সেই সময় জড়ো হতেন বাঙলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও নবীন শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এক গরিষ্ঠ অংশ।

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এই আড্ডার আসরে নিজে কোনোদিন উপস্থিত না হলেও, শোনা যায়, তিনি 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পর্কে যেমন সজাগ ছিলেন তেমনি 'পরিচয়'-পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য এবং আড্ডায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁর স্নেহধন্য তাঁদের মাধ্যমে পত্রিকা এবং আড্ডায় আলোচিত নানা বিষয় সম্পর্কেও খোঁজ-খবর পেতেন বা রাখতেন। হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, "প্রথম সংখ্যা বের হবার আগে সঙ্কল্প করা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখার জন্য হাত পাতা হবে না। কিন্তু রবীন্দ্র-বর্জিত প্রথম সংখ্যা দেখে রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের উৎসাহ দিলেন, তখন আমরা বুঝলাম যে পরিচয় সম্পূর্ণ স্বকীয় শক্তিতে সমুথ, অতএব রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা দাবি করতে আর কোন দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না। এই দাবি রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ করলেন বাংলা পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে একটি চিঠি লিখে। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :··· 'দুঃসাহসে ভর ক'রে তুমি 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক বের ক'রেচ।' দুঃসাহসের ব্রতে এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের রীতিমতো উৎসাহদাতা হলেন শুধু মুখে নয়—কলমে।"

[দ্র. পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, পৃ. ৩৫]

শুধু এইটুকুর মধ্যেই 'পরিচয়'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময় ঠাকুরবাড়ির 'বিচিত্রা' ভবনে রবীন্দ্রনাথ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করতে চাইলে কিংবা তাঁর নিজের রচনা পাঠ করে শোনাতে চাইলে তিনি সস্নেহে ডেকে পাঠাতেন 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আড্ডা-ধারীদের। প্রয়াত শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর 'পরিচয়-এর আড্ডা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একদিনের বিবরণ থেকে জানতে পারছি, 'পরিচয়'-এর সাপ্তাহিক আড্ডা চলাকালে রবীন্দ্রনাথের ডাক এলো 'বিচিত্রা' ভবনে যাওয়ার জন্য। সুধীন্দ্রনাথ সম্ভবত কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে জানালেন, আড্ডা ছেড়ে তাঁরা কেউ যাবেন না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বিগত যুগের, বড়জোর বর্তমান যুগের প্রবর্তক, আর 'পরিচয় হচ্ছে ভাবীকালের মুখপত্র, অতএব আসর ছেড়ে উঠছেন না তাঁরা। [দ্র. পরিচয়-এর আড্ডা. পৃঃ ১৬৭]

প্রকৃতপক্ষে, 'পরিচয়' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের কিংবা আড্ডায় অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীল প্রতিভা এবং মননশীল ব্যক্তিত্ব সেই সময় কোনো সচেতন ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের পক্ষে উপেক্ষা করে চলা সম্ভব ছিল না। 'পরিচয়'-এর পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল স্বনামখ্যাত চারু দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ধূর্জটিপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং গিরিজাপতি ভট্টাচার্যকে নিয়ে। গত অর্ধশতাব্দীকালের বাঙালীর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এঁরা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রূপেই স্বীকৃত। আর, এঁদের—বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ-নীরেন্দ্রনাথ, চারু দত্ত এবং প্রবোধ বাগচীকে কেন্দ্র করে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার যে-বৈঠক বা আড্ডা চালু হয়েছিল তাতে নিয়মিতভাবে অথবা প্রায়-নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন বাঙলার সর্বস্তরের অগ্রগণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সাংবাদিক, এমনকি কোনো কোনো রাষ্ট্রনীতিবিদও।

প্রয়াত শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ এই 'আড্ডা'-র যে-ডায়েরি রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ সেই ডায়েরি-ই প্রকাশিত হয়েছে 'পরিচয়-এর আড্ডা' নামে। এই বইখানা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই জানা যাবে তৎকালীন বিদ্বজ্জনসমাজের কোন প্রতিভূরা এসে মিলিত হতেন 'পরিচয়'-এর সাপ্তাহিক এই আড্ডায়। একাধিক দিন যাঁরা আড্ডায় এসেছেন এবং শ্যামলবাবুর বিভিন্ন দিনপঞ্জিতে যাঁদের নাম অন্তত দশবার উচ্চারিত হয়েছে শুধুমাত্র তাঁদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা পেশ করলেই পাঠকেরা বিস্মিত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমার সমীক্ষায় দেখতে পাচ্ছি সেই তালিকাটিতে আছেন: অপূর্বকুমার চন্দ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, লিণ্ডসে এমার্সন, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কিরণ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারু দত্ত, জীবনময় রায়, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রমথ চৌধুরী, বসন্তকুমার মল্লিক, বিষ্ণু দে, মজিদ রহিম, যামিনী রায়, রাধারমণ মিত্র, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সমর সেন, সরোজিনী নাইডু, সাহেদ সুরাওয়ার্দি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুমন্ত্র মহলানবিশ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুশোভনচন্দ্র সরকার, হামফ্রে হাউস, হারীতকৃষ্ণ দেব, হিরণকুমার সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, হেমেন্দ্রলাল রায়-এর মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়-গোষ্ঠী'তে অক্সফোর্ড-ফেরত দলের প্রাদুর্ভাবের কথা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, জ্যেষ্ঠ দলে ছিলেন অপূর্ব চন্দ সাহেদ সুরাওয়ার্দি, তুলসী গোঁসাই, অবনী ব্যানার্জি ও কিরণ মুখুজ্জে। এঁরা সকলেই অক্সফোর্ড-এ ছিলেন মল্লিকদারই [বসন্তকুমার মল্লিক] সময়ে। কনিষ্ঠ দলে ছিলেন তিনজন: সুশোভন সরকার, হুমায়ুন কবির ও হীরেন মুখুজ্জে। এঁদের সঙ্গে মল্লিকদার পরিচয়

হয়েছিল পরিচয়-এর আসরে। কিছুদিন পরে এসে জুটলেন, বোধহয় ১৯৩৬ সালে, হাম্‌ফ্রে হাউস, কনিষ্ঠদের অন্যতম। মোটমাট ন'জন। কেম্‌ব্রিজ-ফেরত মাত্র তিনজনের কথা মনে পড়ছেঃ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ১৯৪২ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নিয়ে ইনি কলকাতায় আসেন ও পরিচয়-গোষ্ঠীতে যোগ দেন। বাকি দু'জন, মজিদ রহিম ও ম্যালকম ম্যাগারিজ।' [দ্র. পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, পৃ. ১০৯]

হাবলদা [হিরণকুমার সান্যাল] অক্সফোর্ড-ফেরতদের সংখ্যা গণনায় সম্ভবত সামান্য একটু ভুল করেছেন। কারণ, বসন্তকুমার মল্লিকও তো ছিলেন অক্সফোর্ড-ফেরত। সুতরাং তাঁকে ধরলে সংখ্যাটি নয়-এর পরিবর্তে নিঃসন্দেহে হয় দশ। প্রসঙ্গত আরও একটি কথা আমি সাম্প্রতিক কালের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই পরাধীনতার যুগেও ব্রিটিশ-শাসনের স্তম্ভরূপে পরিচিত অন্তত তিনজন আই.সি. এস. ছিলেন 'পরিচয়-গোষ্ঠি' ও তার আড্ডার সঙ্গে যুক্ত। 'পরিচয়-পরিচালকমণ্ডলী'-র অন্যতম প্রবীণ সদস্য চারু দত্ত ছিলেন একজন প্রাক্তন আই. সি. এস, মজিদ রহিম আই. সি. এস রূপে কর্মরত অবস্থাতেই প্রায় নিয়মিতভাবেই আসতেন 'পরিচয়'-এর আড্ডায় এবং তরুণ অশোক মিত্র ১৯৩৯ সালের ২৩ জুন যখন 'পরিচয়'-এর আড্ডায় প্রথম এলেন তখন তিনি আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশ-শাসনের পাঠ নিতে বিলেত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এইসব মানুষের উপস্থিতিতে 'পরিচয়' -এর আড্ডার পরিবেশ কী হতে পারে এবং বৌদ্ধিক আলোচনার স্তরও কোথায় পৌঁছাতে পারে, তার কিছুটা আমরা অনুমান করতে পারি।

হিরণকুমার সান্যাল-এর 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র' এবং শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর 'পরিচয়-এর আড্ডা-'য় বিধৃত দিনপঞ্জির বিবরণগুলি পাঠ করে আমার অন্তত ধারণা হয়েছে, উচ্চকোটি সমাজের চিরাচরিত বাঙালী ঘরোয়ানা এবং বিলেতী কেতাদুরস্ত সাহেবিয়ানার সংমিশ্রণেই পরিচালিত হতো 'পরিচয়-গোষ্ঠী'র সাপ্তাহিক আড্ডা। এই আড্ডায় শিল্প-সাহিত্য, কাব্য-দর্শন-সঙ্গীত, সমাজনীতি-অর্থনীতি, ইতিহাস-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি-সমরনীতি, সাম্যবাদ-পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদ থেকে শুরু করে বড়লোকের ঘরের কেচ্ছা এবং মাঝে মাঝে আদি রসাত্মক সরস টিপ্পনী—সবই আলোচিত হতো ও প্রচলিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, 'পরিচয়' যে-ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা সাহিত্য তথা

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবাহিত করতে চেয়েছিল তার ঘোলা জলে সঞ্চরণশীল ছিলেন নানা মত ও ভিন্ন মানসিকতার দ্বারা চালিত 'পরিচয়-গোষ্ঠী'ভুক্ত সদস্যেরা।

এই ধারাস্রোতে প্রথম দিকে 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই শামিল হয়েছিলেন। তাঁদের রচিত কবিতা এবং গ্রন্থের সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়'-এর প্রথম বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় গিরিজাপতি ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত প্রেমেন্দ্র মিত্র-র 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের যে-সমালোচনাটি প্রকাশিত হয় সেটা কা'কে দিয়ে লেখানো হবে তাই নিয়েই ঘটে 'কল্লোল-গোষ্ঠী-'র সঙ্গে 'পরিচয়-গোষ্ঠী'র মনোমালিন্য।

এ-সম্পর্কে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, 'বুদ্ধদেববাবু সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এই 'প্রথমা' কিংবা তাঁদের গোষ্ঠীর কোন লেখকের লেখা অপর কোন একটি বইয়ের সমালোচনার ভার তাঁদেরই একজনের ওপর দিতে। যতদূর মনে পড়ে, ঐ-বইটি 'প্রথমা'। সম্পাদক স্বভাবতই তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, অন্য যোগ্য সমালোচক না থাকলে হয়তো এ-অনুরোধ তিনি রাখতে পারতেন, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে লোকাভাব ঘটেনি সে-ক্ষেত্রে দলের লোকের হাতে লেখা নিজেদের বইয়ের সমালোচনা নিরপেক্ষ হলেও সুশোভন হবে না। এ নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি। এরপর পরিচয়-এর আড্ডা ও লেখকগোষ্ঠি এই উভয় আসর থেকে বুদ্ধদেববাবু সবান্ধব প্রস্থান করলেন।' [দ্র. পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, পৃ. ৪৬-৪৭]

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'কল্লোল-গোষ্ঠী'-র লেখকেরা 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেও ঐ গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক মনীশ ঘটক কিন্তু শেষপর্যন্ত 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সম্পর্কে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। 'পরিচয়-এর আড্ডা'-র লিখিত প্রতিবেদন থেকে অন্তত জানা যাচ্ছে, ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মনীশ ঘটক এসেছেন আড্ডার আসরে। এছাড়া প্রথম দিকে যাঁরা পরিচয়-এর আড্ডায় আসতেন কিন্তু পরে আর আসেন নি,তাঁদের মধ্যে ছিলেন বটকৃষ্ণ ঘোষ, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখ। ১৯৩৯ সাল থেকে নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে পরিচয়-এর আড্ডায় আসতে শুরু করেন অতুল বসু, অনিলা বনার্জি, অমিয় চক্রবর্তী, আইলিন বনার্জি, জ্যোতির্ময় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণীন্দ্র রায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়,শীলা বনার্জি, সতীশ সিংহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। বাঙলার বাইরের থেকে এসে ১৯৩৮-৩৯ সালে পরিচয়-এর আড্ডায় যোগ দিয়েছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের

সাধারণ সম্পাদক সজ্জাদ জহীর এবং তাঁর স্ত্রী, খ্যাতিমান লেখক মূলকরাজ আনন্দ এবং প্রখ্যাত কবি ও সঙ্গীতশিল্পী হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্যামলবাবুর ডায়েরিতে দেখতে পাচ্ছি, মূলকরাজ পরিচয়-এর আড্ডায় বসে সাহেদ সুরাওয়ার্দির সঙ্গে যেমন তর্কে মেতেছেন, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের বাড়ির আড্ডা আবৃত্তি ও গানে গানে মাতিয়ে দিয়েছেন হরীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্র হরীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও গান শুনে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে পুনর্বার আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন।

আমার এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণ-প্রসঙ্গ। তাহলে 'পরিচয়'-এর পরিচালকমণ্ডলী থেকে শুরু করে 'পরিচয়'-এর আড্ডায় বিভিন্ন সময়ে যোগদানকারী নানা বিশিষ্ট ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা এবং মানসিকতায় যে-পরিবেশটি গড়ে উঠেছিল তা এত বিস্তারিতভাবে লেখার কী দরকার ছিল, এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে।

আমি শুধু বিনীতভাবেই বলতে পারি, উচ্চবিত্ত সমাজের বনেদী ঘরোয়ানা এবং কেতা-দুরস্ত সাহেবিয়ানার সংমিশ্রণে রচিত পরিচয় এর আড্ডার বিচিত্র পরিবেশটি সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলে যে-হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালের ২৫ মার্চ পরিচয়-এর আড্ডার সদস্যদের কাছে রাধারমণ মিত্রকে ঐ আড্ডায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে পরবর্তীকালে রাধারমণকে সেখানে নিয়েও যান, সেই হীরেন্দ্রনাথ ৫২ বছর পরে 'পরিচয়-এর আড্ডা' শীর্ষক গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনার সময় ১৯৯০ সালে সুধীন্দ্রনাথ-এর সহজাত সৌজন্যের প্রশংসা করেও কেন লেখেন, ' সুধীন্দ্রনাথ হয়তো রাধারমণ মিত্রের মতো প্রখরচরিত্র আর কিছুটা উচ্চভাষী মার্কস-বাদীকে ঠিক বুঝে উঠতে বা বরদাস্ত করতে পারতেন না', তা কিন্তু অনুধাবন করা যাবে না।

[দ্র. পরিচয়-এর আড্ডা, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মুখবন্ধ', পৃ. ৯]

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর দৌত্যেই রাধারমণ প্রবেশ করেছিলেন পরিচয়-এর আড্ডায়। অথচ আশ্চর্যের কথা, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত সাড়ে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার 'তরী হতে তীর' নামক তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে চোদ্দ বার রাধারমণ মিত্র-র নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হলেও পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণকে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। ঐ গ্রন্থে তিনি 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অবশ্য নানাভাবে বিভিন্ন স্থানেই ব্যক্ত করেছেন। যেমন :

বলেছেন, 'ওয়ালটেয়ারে অবস্থানকালেই বোধহয় একবার ছুটিতে এসে আবু সয়ীদ আইয়ুব কিংবা সুরেন গোস্বামীর সঙ্গে 'পরিচয়' আড্ডায় গিয়েছিলাম'। আর, ১৯৯০ সালে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর 'পরিচয়-এর আড্ডা'-র 'মুখবন্ধ' লেখার সময় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'আমি নিজে ১৯৩৫ নাগাদ সময়ে 'পরিচয়'-এর সঙ্গে পরিচিত হই। আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আর বিষ্ণু দে-র মতো বন্ধু সমভিব্যাহারেই বোধহয় প্রথম যাই। প্রধানত সুধীনবাবুর বাড়িতেই যেতাম, ডক্টর প্রবোধ বাগচী কিংবা গিরিজাবাবুর বাড়িতে যে বৈঠক হত, সেখানে খুব কমই গিয়েছি।'

[দ্র পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮]

আমরা জানি, হীরেনবাবু বিলেত থেকে এসে সোজা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু '১৯৩৫ সালের শেষাশেষি ওয়ালটেয়ারের পাট চুকিয়ে' তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। [দ্র. তরী হতে তীর, পৃ ২৯২] সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, এর পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল থেকেই 'পরিচয়' পত্রিকা এবং তার আড্ডার সঙ্গে হীরেনবাবুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। প্রকৃতপক্ষে, হিরণকুমার সান্যাল তাঁর 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র' নামক গ্রন্থে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর সম্মতিক্রমে তাঁর লেখা ডায়েরির যে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি শ্যামলবাবু ১৯৩৬ সালের ২৭ মার্চ লিখেছেন, 'আজকের সভায় একটি নতুন লোককে দেখলাম—হীরেন মুখুজ্জে।' কিন্তু দুঃখের কথা, শ্যামলবাবুর ডায়েরি যখন ১৯৯০ সালে গ্রন্থাকারে 'পরিচয়-এর আড্ডা' নামে প্রকাশিত হয় তখন তা এতই অসতর্ক ও হেলাফেলাভাবে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে যে. ২৭ মার্চ-এ লেখা ডায়েরির ঐ উক্তি বা প্রথম বাক্যটি বেমালুম উধাও হয়ে গিয়েছে। পাঠকেরা প্রথমোক্ত গ্রন্থটির ১২৮ পৃষ্ঠা এবং শেষোক্ত গ্রন্থটির ১৩ পৃষ্ঠা পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন আমার কথার সত্যতা। এছাড়া শ্যামলবাবুর গ্রন্থের আরও কিছু অসঙ্গতি ও ত্রুটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যদিও তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়, তবু এটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ না করেও পারলাম না।

যাহোক, এই সময়কালেই মার্কসীয় মতাদর্শে দীক্ষিত হীরেন মুখার্জির সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে মুন্সী প্রেমচন্দ্র-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে নিখিল ভারত প্রগতির লেখক সংঘ গঠিত হওয়ার পর বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠনেরও মূল দায়িত্ব তখন বহন করছিলেন

হীরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ফলে, তাঁরা পরিচয়-এর আড্ডার সঙ্গে প্রায় নিয়মিতভাবেই যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। সমসাময়িক কালে মীরাট কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র মামলা-খ্যাত এবং মার্কসবাদে পরিশীলিত আর প্রকৃত অর্থে পাণ্ডিত্যের অধিকারী রাধারমণ মিত্র-র সঙ্গেও হীরেনবাবুর পরিচয় হয়। একই মতাদর্শে বিশ্বাসী এই দুইজনের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠতেও তাই দেরি হয়নি। সম্ভবত ১৯৩৭-৩৮ সালে হীরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাধারমণ প্রগতি লেখক সংঘেও যোগ দিয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হীরেনবাবু হয়তো মনে মনে চেয়েছিলেন রাধারমণকে পরিচয়-এর আড্ডায় নিয়ে যেতে। কারণ, পরিচয়-এর আড্ডার সদস্যদের মধ্যে যেমন কমিউনিস্ট-অনুরাগী ও সোভিয়েত-প্রেমী কয়েকজন ছিলেন তেমনি বেশ কিছু সদস্য ছিলেন তীব্রভাবে কমিউনিজম ও সোভিয়েত-বিরোধী। স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন শেষোক্তদের প্রধান মুখপাত্র। সুতরাং রাধারমণ-এর মতো মার্কসীয় দর্শনে পরিশীলিত এবং কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে ইতিমধ্যে প্রাজ্ঞ বিদ্বজ্জনরূপে খ্যাত একজন ব্যক্তিকে যদি পরিচয়-এর আড্ডায় হীরেনবাবুরা সহযাত্রীরূপে টানতে পারেন তাহলে আড্ডার আসরে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তাঁদের মতাদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে তা যে সহায়ক হবে, একথা ভাবাও অসম্ভব নয়।

যাহোক, ১৯৩৮ সালের ২৫ মার্চ সুধীন্দ্রনাথ-এর বাড়িতে পরিচয়-এর আড্ডা বসেছে। শ্যামলবাবুর ডায়েরির প্রতিবেদনে দেখতে পাচ্ছি, ডক্টর প্রবোধ বাগচীর উত্থাপিত প্রশ্ন নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ-নীরেন্দ্রনাথ নিজস্ব মতামত প্রকাশ করছেন। এবং শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ আর হীরেন মুখার্জি বসে আছেন প্রায় নীরব শ্রোতার ভূমিকায়। এরপর শ্যামলবাবু ডায়েরিতে লিখেছেন ঃ

'হীরেন মুখার্জিকে কিছু বলতে বলা হলে তিনি গম্ভীরভাব বললেন, আজকের আলোচনায় আমি হচ্ছি একান্তই শ্রোতা। তারপর তিনি নীরেনকে বললেন, রাধারমণ মিত্রকে পরিচয়-এর আসরে আনতে বাধা আছে কি?

'নীরেন মাথা নেড়ে বললেন. তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না আজকাল।

'সুধীন্দ্র বললেন, তিনি রাধারমণ সম্বন্ধে ভালো কথাই শুনে এসেছেন। নীরেনবাবু তাঁকে আনতে না পারলে অন্য কোনো বন্ধুকে বলবেন।'

[দ্র. পরিচয়-এর আড্ডা, পৃ. ৭০]

শ্যামলবাবুর ডায়েরির সাক্ষ্য গ্রহণ করলে বলা যায়, এই প্রথম আমরা পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে দেখলাম। হীরেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ই প্রসঙ্গটির উত্থাপক। নীরেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ-এর মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণকে স্বাগত জানাতেও তাঁরা ইচ্ছুক।

এরপর চার মাস অতিক্রান্ত। শ্যামলবাবুর 'পরিচয়-এর আড্ডা'-য় পরিবেশিত ডায়েরি অনুসরণ করে দেখতে পাচ্ছি, এই চার মাসের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মাত্র একবার, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ২৪ জুন, এসেছিলেন পরিচয়-এর আড্ডায়। কিন্তু এই আসরে তিনি যেমন রাধারমণকে সঙ্গে নিয়ে আসেননি তেমনি তাঁকে নিয়ে কোনো আলোচনাও কেউ করেন নি। উপস্থিত সদস্যেরা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও সুশোভন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ আলোচনা করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর তৎকালীন একটি বক্তৃতা নিয়ে।

এর প্রায় এক মাস পরে ২৯ জুলাই যখন পরিচয়-এর বৈঠক চলছে এবং দিলীপকুমার রায়-এর সঙ্গীত-বিষয়ক একটি বই দিলীপকুমার-এর কোনো বন্ধুর পাঠানো সমালোচনার পরিবর্তে নিরপেক্ষ কাউকে দিয়ে সমালোচনা লেখাবার জন্য সুধীন্দ্রনাথ ও নীরেন্দ্রনাথের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে—ঠিক সেইসময়, শ্যামলবাবু তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, '...হীরেন মুকুজ্জে রাধারমণ মিত্রকে নিয়ে ঢুকলেন।'

পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণ মিত্র-র এই প্রথম প্রবেশকে কেন্দ্র করে সেদিন যা ঘটেছিল এবং শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ তার বিবরণ যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, একটু দীর্ঘ হলেও আমি তা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে হুবহু তুলে ধরছি :

'মীরাট ষড়যন্ত্র-মামলার আসামী মিত্র মশায়কে আমি আগে দেখেছি কিন্তু খুব কাছে বসে দেখলাম এই প্রথম। লক্ষ্য করলাম শরীর শীর্ণ কিন্তু চোখ, নাক, ঠোঁট আশ্চর্যরকম তীক্ষ্ণ। হারীতদা [হারীতকৃষ্ণ দেব] তাঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুমন্ত্র [সুমন্ত্র মহলানবিশ] এসে তাঁর দশাসই শরীরকে বেশ কসরৎ করে সোফার মধ্যে নামিয়ে আবার সমান অধ্যবসায় সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রকে চা ও খাবার পরিবেশনে সাহায্য করলেন। কথাবার্তা জমছিল না। সুশোভন ও হীরেন আলাদা আলাপ করছিলেন নিজেদের মধ্যে। কিরণ [কিরণ মুখোপাধ্যায়] এবার রাধারমণকে এলোমেলো প্রশ্নবাণে অস্থির করে তুললেন। প্রথমে মানবেন্দ্র রায়ের ইতিকথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, সুভাষ কেন বল্লভভাই আর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের কার্যকরী সভা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না।

'রাধারমণ বললেন, তা কেমন করে হবে? সুভাষ ত ওদের হাতের পুতুল। ওরা কেউ পিঠ চাপড়ে দিলে সুভাষ খুশি। মহাত্মা যখন করাচি যান তখন সুভাষ কি হাজির ছিলেন না? মহাত্মা এক গাল হেসে বলেন, রাষ্ট্রপতি, তুমিও এসেছ?

'রাধারমণের উক্তিতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকতে পারে কিন্তু তাঁকে স্পষ্টবক্তা বলে মনে হল। সুধীন্দ্র যখন বললেন যে বাঙলার শ্রমিক নেতারা মেহনতী শ্রেণী থেকে ওঠেনি তখন তিনি দপ্ করে জ্বলে উঠে বললেন,—নিশ্চয় উঠেছে—যারা ধর্মঘট করে তারা শ্রমিক আর তাদের মধ্যে থেকেই নেতা তৈরি হয়—তারাই লড়াইয়ের জন্যে সহকর্মীদের প্রস্তুত করে। আমরা অকুস্থানে জুটে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই। ওদের নেতাদের সঙ্গেই তো আমাদের কারবার।

'হীরেন মুকুজ্জে তার স্বভাবগত ধীর কণ্ঠেই বলেন, যদি ধরেই নেওয়া হয় যে শ্রমিক নেতারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে তাহলে তফাৎটা কী? লেনিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন—প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার বিপ্লবকে সেই একই শ্রেণীর লোকেরা সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

'সুধীন্দ্র সে-কথা অস্বীকার করে বললেন, লেনিন-এর কথা আলাদা—তিনি ছিলেন অনন্য। রাধারমণ উত্তেজনার আবেগে খাড়া হয়ে বসে বললেন, বিপ্লব করেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, তারাই বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখে—এখন এতদিন পরে তাদের নিকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে—

'সুধীন্দ্র বলতে যাচ্ছিলেন, বিপ্লবের গোড়ার দিকের ইতিহাস বলে—

'হীরেন ও রাধারমণ একসঙ্গে বলে উঠলেন, আপনি ১৯২০, ২১, ২২শে-র কথা বলছেন?

'সুধীন্দ্র বললেন, হ্যাঁ তাই—

'নীরেন এতক্ষণ কথা বলেন নি, এবার ঠোঁট একটু উল্টে বললেন, রাশেল, ওয়েল্‌স—এদের কথা বলছেন ত? সুধীন্দ্র বললেন, ট্রটস্কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না—ছেলেবেলা থেকে কষ্ট করে মানুষ হন—

'এবার যেন বাগ্‌যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রাধারমণ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তাতে হয়েছে কি?—আমাদের নেতাদের অনেকে ত ছেলেবেলা থেকেই জেল খেটেছেন, সেটা কি কষ্ট নয়? তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ইংলণ্ডের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে উঠে নেতারা কি করেছেন। অবশ্য ইংলণ্ডের সমস্যা আলাদা—তাদের সাম্রাজ্য আছে—

'একজন বললেন, সেটা আলোচনার বিষয় নয়। সুধীন্দ্র এবার কথা ঘুরিয়ে

বললেন, তাঁর পরিচিত একজন সমজদার লোক বলেছেন যে বর্তমান বাঙালি নেতারা শ্রমিকদের ওপর থেকে প্রভাব হারিয়ে বসেছেন। এখন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ শ্রমের ক্ষেত্রকেও বিষিয়ে দিয়েছে।

'সুশোভনবাবু একটি ধর্মঘটের নিষ্ফলতার কথা বলতে রাধারমণ স্বীকার করলেন যে বাংলার বর্তমান মন্ত্রীসভা সাম্প্রদায়িক বিভক্তির প্রয়োগে কয়েকজন শ্রমিক নেতার মাধ্যমে তাদের সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশ করে দিচ্ছে, কিন্তু তিনি মনে করেন না যে কোনো বিশেষ ধর্মঘটের বিফলতা শ্রমিকদের ক্ষতি করতে পারে। তিনি আরও বলেন যে ট্রেডয়ুনিয়ান সংস্থাগুলি যখন যন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিত হবে তখন ব্যক্তিবিশেষের বিভ্রান্ত বা বিশ্বাসঘাতকতায় কিছু এসে যাবে না। বস্তুত ট্রেডয়ুনিয়ানের স্থিতিশীলতা ও ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী।

'হীরেন বললেন, সংঘবদ্ধ শ্রমিকের বর্তমান সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। তিনি শ্রমিকদের মধ্যে যারা সাম্প্রদায়িকতার আওতায় আসতে পারে ও যারা সে সম্ভাবনা থেকে মুক্ত তার বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হল, ব্যাপারটা হচ্ছে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক।'

[দ্র. পরিচয়-এর আড্ডা, পৃ ৯৯-১০১]

'পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণকে কেন্দ্র করে সেদিন যে-আলোচনা ও বিতর্ক চলেছিল শ্যামলবাবুর ডায়েরি থেকে তা আমি যথাযথভাবেই উদ্ধৃত করলাম। শ্যামলবাবুর ডায়েরির শেষ অনুচ্ছেদে আছে, এই আলোচনা যখন চলছিল তখন পরিচয় গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য এবং 'গ্রীক ভাষা ও দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য অক্সফোর্ডের অল সোল্‌স্ কলেজের ফেলো' ও বন্ধুদের কাছে 'প্লেটো' বলে পরিচিত কিরণ মুখার্জি 'মাছের মতো হাঁ করে' ঘুমিয়েই কাটিয়েছিলেন।

আমি জানি, উপরোক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাঠককে ক্লান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু আমি সব জেনে-বুঝেই এই কাজটি করেছি। কারণ, রাধারমণ-এর মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে পরিচয়-এর আড্ডায় সেদিন কোন পরিবেশ ও মেজাজ গড়ে উঠেছিল, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত আড্ডাধারী সদস্যদের কী জিজ্ঞাস্য ছিল রাধারমণ-এর কাছে, কী উত্তরই বা দিয়েছিলেন তিনি এবং সেই আলোচনা আর বিতর্কের মান ছিল কী রকম—এগুলি যাতে পাঠকেরা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন সেটাই ছিল ঐ দীর্ঘ উদ্ধৃত পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্য।

এই উদ্ধৃতির ভিত্তিতে পরিচয়-এর আড্ডার আলোচনার মান সম্পর্কে

পাঠকেরা নিজস্ব ধারণায় উপনীত হোন, এটাই আমার কাম্য। ব্যক্তিগতভাবে আমার কিন্তু মনে হয়েছে, আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীদের আড্ডায় আলোচিত বিষয়বস্তুর মানদণ্ডে তো বটেই, ১৯৩৮ সালে বিরাজিত জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সেদিনের আলোচনায় যে-মান প্রত্যাশিত ছিল তা সম্ভবত এই আলোচনায় পরিস্ফুট হতে পারেনি। অন্তত রাধারমণ মিত্র-র মতো মার্কসীয় দর্শন ও মানববিদ্যায় পরিশীলিত অভিজ্ঞ শ্রমিকনেতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে আড্ডায় উপস্থিত সদস্যেরা আরও গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় মিলিত হতে পারতেন।

যাহোক, পরের সপ্তাহে, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ৫ আগস্ট পরিচয়-এর আসর বসে প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে। এই আসরে রাধারমণ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর ডায়েরিতে।

গিরিজাপতিবাবু আসরে এসে নীরেন রায়-এর খোঁজ করেন। ঐ দিন নীরেনবাবুও ছিলেন আসরে অনুপস্থিত। নীরেন রায়-এর অনুপস্থিতির কারণ শ্যামলবাবু জানতেন। তিনি ঐ দিন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'আমি জানতাম রাধারমণবাবুর সঙ্গে একযোগে কার্ল মার্কস-এর 'ডাস ক্যাপিটাল' পড়ার আজ দ্বিতীয় দিন। কিছু বললাম না।... আসরের প্রতি এই অবজ্ঞা অমার্জনীয় মনে হয়।' [পরিচয়-এর আড্ডা, পৃ. ১০১]

শ্যামলবাবুর এই বক্তব্য সমর্থিত হয় রাধারমণ মিত্র-র লেখা 'নীরেন্দ্রনাথ রায়' শীর্ষক একটি নিবন্ধ থেকে। ১৯৬৬ সালের ৩০ অক্টোবর নীরেন্দ্রনাথ-এর মৃত্যুর পর ১৩৭৩ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় [ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ১৯৬৬-৬৭] রাধারমণ তাঁর স্মৃতিচারণমূলক ঐ নিবন্ধে লেখেন :
১৯৩৩ সালের শেষের দিকে কলকাতায় ফিরলাম।...

'মিরাট থেকে ফেরবার পর যখনই তাতে আমাতে [নীরেন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে রাধারমণ-এর] দেখা হয়েছে, দুজনার মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধেছে। আমি মার্কসবাদী; সে অরবিন্দ ভক্ত। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত।... আমি তাকে বোঝাতে পারতাম না, সেও আমাকে বোঝাতে পারত না। প্রতিবারই তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ায় আমাদের আলাপ শেষ হত।...এই রকম করতে করতে আমাদের মধ্যে একেবারেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।...

'কতদিন এই অবস্থায় কাটে মনে নেই। চার-পাঁচ বছর কি তারও বেশী হবে। একদিন আমি আপিসে কাজ করছি। হঠাৎ নীরেন ঝড়ের মত

সেখানে উপস্থিত। আমি তার চেহারা দেখে চমকে উঠলাম।…মাথার চুল উস্কোখুস্কো,…চোখে একটা অস্বাভাবিক চাউনি, ঠিক পাগলের চেহারা। তখন বোধহয় সাড়ে চারটে। সে…সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললো, "তোমার সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরী কথা আছে আজই। তোমার কখন ছুটি হবে?" আমি বললাম, "আধঘণ্টা বাদে।…ছুটি হলে সকলেই চলে যাবে, তখন এখানে বসেই কথা হবে।" সে বললে, "না—ছুটি হলে আমার বাড়ি যেতে হবে। সেখানেই কথা হবে, এখানে হবে না।"

'…ছুটির পরে সে আমাকে বালীগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে গেল। সে বললো, "এই ক'বছর দিবারাত্র আমার নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে। দ্বন্দ্ব হচ্ছে পণ্ডিচেরী ও মস্কোকে নিয়ে—কে সত্য? কাকে রাখব? কাকে ছাড়ব? কিছুই কূল-কিনারা করে উঠতে পারিনি এত বছর।…নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, রাতের পর রাত কেটে গেছে, ঘুম হয়নি।…যাক, সে দ্বন্দ্বের এখন অবসান ঘটেছে।… আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে পণ্ডিচেরী ভুল, মস্কোই ঠিক। কিন্তু মস্কোর কথা ত আমি কিছুই জানি না। না জানলে আমার সঙ্কট ঘুচছে না। …আমি ডুবন্ত মানুষ। তুমিই আমাকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারো। করবে কি?"

নীরেন্দ্রনাথ কি চাইছেন তাঁর কাছে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাধারমণকে বলেন, 'শিক্ষক যেমন ছাত্রকে পড়ায় সেইরকম করে তুমি আমাকে অ, আ, ক, খ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মার্কসীয় সাহিত্য পড়াও।…পড়বার চেষ্টা করে দেখেছি, অনেক জিনিস বুঝতে পারি না। যদি পড়াতে রাজি থাকো কাল থেকেই আরম্ভ করে দাও। আর একদিনেরও দেরি আমি সহ্য করতে পারছি না।'

রাধারমণ লিখেছেন, 'তারপর থেকে প্রতিদিন আমার আপিসের পর তার বাড়ি গিয়ে আমরা ত্ু'জনে মার্কসীয় সাহিত্য পড়তে লাগলাম। রোজ তিন চার ঘণ্টা করে, ছুটির দিন আরও বেশী সময়। এইরকম করে—কতদিন আমার ঠিক হিসেব নেই, তবে মনে হয় তিন চার বছর ধরে—আমরা প্রতিদিন দু'জনে মার্কসীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি।'…

[দ্র. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পরিচয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৩, পৃ: ৬৫৪-৫৬.]

পরিচয় এর আড্ডার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ ১৯৩৮ সালের ৫ আগস্ট রাধারমণ এর সঙ্গে নীরেন রায়-এর 'ডাস ক্যাপিটাল' পড়ার প্রসঙ্গটি শ্যামলবাবু স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলেও ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ সত্য তা রাধারমণ-এর

উপরোক্ত বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা এটাও উপলব্ধি করতে পারি যে, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই বুদ্ধিজীবী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব একদা মার্কসীয় তত্ত্বানুশীলনের জন্য সেদিন কী গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

নীরেন্দ্রনাথ মার্কসীয় মতাদর্শে কীভাবে দীক্ষিত হয়েছিলেন সেকথা 'পরিচয়'-এর প্রাক্তন সম্পাদক গোপাল হালদার তাঁর নিজের মুখেই শুনেছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ-এর মৃত্যুর পরে সেই কথা স্মরণ করে 'নীরেন্দ্রনাথ ও পরিচয়' শীর্ষক একটি নিবন্ধে গোপাল হালদার লিখেছেন, "…এ বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথের নিজের মুখে যা শুনেছি এখানে সেই রূপান্তরের কথা উল্লেখ করছি যথাসাধ্য তাঁর ভাষাতেই: '১৯৩৫-৩৬ সালে একদিন দুপুরে আর পারলাম না। স্থির করলাম—জানতে হবে। তখনি রাধারমণের কাছে চললাম। এতদিন তাঁর সঙ্গে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তর্ক করেছি। বললাম, এবার তা পড়তে হবে। আরম্ভ হল আমার মার্কসবাদের পাঠ – ছাত্রের মত নিয়মিত-ভাবে তিন চার বছর পড়েছি। তবে কৃতনিশ্চয় হলাম।' অপেক্ষা করেছিলেন শুধু মাতৃবিয়োগ পর্যন্ত (১৯৪৩)। শ্মশান থেকে খালি পায়েই নীরেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট পার্টির আপিসে আসেন—সদস্য হবেন।"

[দ্র নীরেন্দ্রনাথ ও পরিচয়, পরিচয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৩, পৃঃ ৭২৩-২৪]

গোপাল হালদার-এর লেখার মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ-এর উপরোক্তজবানবন্দীতে দেখতে পাচ্ছি, রাধারমণ এবং তাঁর একসঙ্গে বসে ১৯৩৬ সাল থেকে তিন-চার বছর, অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত মার্কসীয় সাহিত্য পাঠের কথাই স্বীকৃত। সুতরাং এক্ষেত্রেও শ্যামলবাবুর ডায়েরির বক্তব্য সমর্থিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। এর আগে 'রাধারমণ মিত্র: অবিস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব' নামে আমি যে নিবন্ধটি লিখেছি তার এক জায়গায় রাধারমণ এবং নীরেন্দ্রনাথ—এঁরা কে কবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন সে সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করার সময় আমি জানিয়েছিলাম, 'তাঁর প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, যাঁকে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন—তিনি কিন্তু তাঁর আগেই, খুব সম্ভব ১৯৪২ সালে, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন।' গোপাল হালদার-এর পূর্বোক্ত বক্তব্য জানার পর আমার স্পষ্ট ধারণা এক্ষেত্রে আমি ভুল করেছি। নীরেন্দ্রনাথ ১৯৪২ সালে নয়, ১৯৪৩ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন গোপাল হালদার প্রদত্ত তথ্যটিই এক্ষেত্রে সঠিক। পাঠকেরা দয়া করে এই ভুলটি সংশোধন করে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

এবার পরিচয়-এর আড্ডার প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক। পরের সপ্তাহে পরিচয়-এর আড্ডার আসর বসে ১৯৩৮ সালের ১২ আগস্ট, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র বাড়িতে, তাঁর সুসজ্জিত প্রশস্ত বসবার ঘরে। এই আড্ডার আসরেও রাধারমণ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু শ্যামলবাবুর ডায়েরির বিবরণ থেকে জানা যায়, এই আসরে তাঁকে কেন্দ্র করেই প্রায় সর্বক্ষণ সুধীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ-এর মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ চলে। এই বাগ্‌যুদ্ধ বা আলোচনার মধ্যে মার্কসবাদ ও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যে-মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল, গোপাল হালদার-এর ভাষা ধার করে বলা যায়, তাতে সুধীন্দ্রনাথ-এর 'বৈদগ্ধ্য-বিলাস' এবং আমার মতে অহংসর্বস্ব মনোভাব আর তর্কের জন্য তর্কে যেতে নিজের বাকচাতুর্য প্রদর্শনের মানসিকতাই প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর বিবরণ আজকের পাঠকদের কাছে একটু সবিস্তারে পরিবেশন করা বোধহয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'রাধারমণ মিত্রর কথা উঠলে সুধীন্দ্র বললেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মনে হয় কি যে তিনি বেশি লেখাপড়া করবার সুযোগ পেয়েছেন [?]। হীরেন বললেন, কমিউনিস্টদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে অগ্রণী। আমি প্রশ্ন করি, তাঁর জ্ঞানের কথা না আন্তরিকতার কথা বলছেন? হীরেন বললেন, দুই ক্ষেত্রেই তিনি সমান শ্রদ্ধাস্পদ।

'সুধীন্দ্র বললেন, রাধারমণ কমিউনিস্ট বিরোধীদের কথা জানেন না—সাম্প্রতিক কালের বলশেভিক-বিরোধী সাহিত্যের কিছুই পড়েন নি। ১৯১৮-১৯ সালে যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রমাণ করে যে বিপ্লবের পুরোভাগে মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল না—হোয়াট ম্যান ওয়াস টকিং থ্রু হিস হ্যাট।

'হীরেন মুখুজ্জে বললেন, আপনি তাঁর কথার মধ্যে ঢুকতে পারেন নি। আলাদা ভাষায় কথা বলেছেন—সেই জন্যেই রেগে যাচ্ছেন।

'সুধীন্দ্র এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন আমাকে কেউ একটা টাইপ বললে আমি ভীষণ রেগে যাই। আমি বুঝি না কোনো লোককে এইভাবে মার্কা মারা যায় কি না। আমাকে কেউ বুঝিয়ে দিক, মামুদ [মামুদ হক, অমৃতসরের কোনো কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন, পরে হন জওহরলাল নেহরু-র ব্যক্তিগত সচিব। সম্ভবত প্রগতি লেখক-আন্দোলনের সঙ্গেও ইনি যুক্ত ছিলেন] যে আমার চেয়ে ঢের বেশি ধনী আর ছেলেবেলা থেকে সম্ভ্রান্ত বংশের পরিবেশে মানুষ হয়েছে, সে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যাকে আমার চেয়ে ভাল কেমন করে

বুঝবে? আমি বুঝি না, সুশোভন কেমন করে তাদের কথা আমার থেকে বেশি জানবে। হাউ দি হেল হি নোস হোয়াট আই ডোণ্ট?

'আমি হীরেনবাবুকে বললাম, ঠিক কথা, আপনি রাধারমণ ও সুশোভনের মধ্যে মিল ও সুধীন্দ্র-র সঙ্গে তাঁদের অমিলটা কোথায় বলে দিন।

'হীরেন বললেন, রাধারমণ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছেন—

'অগ্রসর বলতে কি বোঝায়? আমি চেপে ধরলাম—বেশি পড়েছেন, না শ্রমিক সংগঠনের কাজে অভিজ্ঞতা বেড়েছে?

'দুই, উত্তর দিলেন হীরেন।

'সুধীন্দ্র উচ্চ হেসে বললেন, সুশোভন শ্রমিকদের কি দেখেছে? সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের মধ্যে কেউ শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। যারা পুরুষানুক্রমে অভুক্ত, বস্ত্রহীন, গৃহহীন থেকে কোনোক্রমে বেঁচে আছে, তারা যে আমাদের সমাজের অংশ সে-কথা কিছুতেই ধারণার মধ্যে আনতে পারি না, আর কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে আমাদের মধ্যে একজন নিছক আদর্শের তাড়নায় তাদের একজন হয়ে গেছেন। অবশ্য ছিটগ্রস্ত মানুষদের কথা বলছি না।'

সুধীন্দ্রনাথ ছিটগ্রস্ত মানুষের উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টভক্ত, গোঁড়া খ্রীশ্চানদের চিহ্নিত করে বলেন, 'এই লোকেরা আমাদেরই শ্রেণীভুক্ত, এদের আমি বুঝি। তফাতের মধ্যে, গোঁড়ামির বাড়াবাড়ি দেখলে পাশ কাটিয়ে যাই।'

এরপর হেমেন্দ্রলাল রায় যখন প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সত্যিই শ্রমজীবীদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন না?' তখন তাঁর কথায় কান না দিয়েই সুধীন্দ্র বলে গেলেন, 'রাধারমণ যে-দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছেন সে অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। যামিনীদারও [যামিনী রায়] হয়েছে—

'হীরেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আপনাদের দুঃখকষ্টের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থা তুলনা করা যায় না।

'সুধীন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বললেন, যামিনীদা পনর বছর ধরে পেট ভরে খেতে পান নি। শরীর ঢাকার মতো কাপড় যোগাড় করতে পারেন নি। য়ুরোপে থাকতে আমাকে টাকার অভাবে তিন মাস একরকম অভুক্ত থাকতে হয়।

'হীরেন বললেন, সে আলাদা কথা, দারিদ্র কাকে বলে তা আপনি বুঝতে পারবেন না।' [দ্র. পরিচয়-এর আড্ডা, পৃ. ১০৫-১০৭]

শ্যামলবাবুর ডায়েরি থেকে রাধারমণকে কেন্দ্র করে পরিচয়-এর আড্ডায় আলোচিত বিষয়বস্তুর যে-দীর্ঘ প্রতিবেদন আমি তুলে ধরলাম পাঠকেরা একটু

সচেতনভাবে তা পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারবেন, 'সজ্জন' ও প্রতিভাবান বলে পরিচিত সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর বৈদগ্ধ্য-বিলাস এবং অহংবোধ কী পরিমাণ উন্নাসিক করে তুলেছিল। সবকিছুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মধ্যেই যেন তিনি পেতেন আনন্দের স্বাদ।

রাধারমণ মিত্র-র সঙ্গে এর আগে একদিনই মাত্র পরিচয়-এর আড্ডায় তাঁর কিঞ্চিৎ আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল। সেই সামান্য আলাপ-পরিচয়ের সূত্রেই তিনি জেনে গেলেন, 'রাধারমণ বেশি লেখাপড়া করার সুযোগ' পান নি কিংবা 'সাম্প্রতিক কালের বলশেভিক-বিরোধী সাহিত্যের কিছুই পড়েন নি।' এছাড়া রাধারমণ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'হোয়াট ম্যান ওয়াস টকিং থ্রু হিস হ্যাট'—ইত্যাদির মধ্যে বক্রোক্তি ছাড়া কোনো শোভন শালীনতা কি পাঠকেরা লক্ষ্য করছেন? বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ-এর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, আকাদেমিক শিক্ষার দিক থেকেও যিনি সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ-এর চেয়ে কৃতী, যাঁর আদর্শনিষ্ঠা, যুক্তিবাদী অগ্রগামী চিন্তা-ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি গান্ধীজীর মতো মহান নেতা জানিয়েছেন সস্নেহ সমীহ আর শ্রদ্ধা, বিশের দশকেই যিনি ছিলেন শ্রমিক-আন্দোলনের প্রথম সারির অন্যতম নেতা-রূপে স্বীকৃত, ঐতিহাসিক মীরাট কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী রূপ যিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং সর্বোপরি 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে বর্ণিত নান্দনিক চেতনায় পরিশীলিত ও প্রকৃত অর্থেই সংস্কৃতিবান যে-মানুষটির সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-কে উচ্চমানে উন্নীত করতে পারতেন না—সেই নীরেন্দ্রনাথ রায় মতাদর্শগত এক চরম সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আত্মিক বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের আশায় যে-রাধারমণ-এর শরণাপন্ন হয়ে ১৯৩৮ সালে তাঁর কাছে ছাত্রের মতো মার্কসবাদের পাঠ গ্রহণ করেছেন, তাঁকে, তাঁর অসাক্ষাতে, রাধারমণ সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মতো কৃতবিদ্য একজন বুদ্ধি-জীবীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সশ্রদ্ধ উক্তি শুনেও, কীভাবে সুধীন্দ্রনাথ অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে পারলেন, সত্যিই তা বিস্ময়কর। একে অহংসর্বস্ব এক বুদ্ধিবিলাসীর মতিচ্ছন্ন মানসিকতা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

এছাড়া সুধীন্দ্রনাথ অবলীলায় বলতে পারেন, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান মামুদ হক এবং সুশোভন সরকার শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যাকে তাঁর চেয়ে ভালো কেমন

করে বুঝবে কিংবা কেমন করে বেশি জানবে। এসম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত উক্তি: 'হাউ দি হেল হি নোস হোয়াট আই ডোণ্ট?' এই অহমিকাকে পাঠকেরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? তিনি যা জানেন না অন্যে তা জানতে পারে না কিংবা অন্যে যা জানে তিনি অবশ্যই তা জানেন—এই দম্ভোক্তি কি কোনো যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীর কাছে প্রত্যাশিত?

আর, সবচেয়ে হাস্যকর তাঁর দারিদ্র্য-বিলাস। রাধারমণ যে-দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ-এরও নাকি সেই দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা আছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ইয়োরোপে অবস্থানকালে টাকার অভাবে তাঁকে নাকি একরকম অভুক্ত থাকতে হয়'। ভাবুন একবার তুলনাটা! উত্তর কলকাতার ধনাঢ্য বনেদী পরিবারের সন্তান, যিনি আবাল্য প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত তিনি গিয়েছেন ইয়োরোপ পরিভ্রমণে। দেশ থেকে সময়মতো টাকা না পৌঁছানোর ফলে তিনি সাময়িকভাবে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন। হয়তো যে-আহার্য ও পানীয় গ্রহণে তিনি নিত্য অভ্যস্ত তাতে কিছুটা কাটছাঁট করতে হয়েছে মাত্র। কিন্তু উত্তর কলকাতার এক নিঃস্ব, অতি দরিদ্র নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তান রাধারমণকে আবাল্য চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই বড় হতে হয়েছে। এমনকি যৌবনেও দিনের বেলায় নিছক কলের জল খেয়েই মেটাতে হয়েছে খিদের জ্বালা। আর রাত্রে ওজন দরে কয়েকখানা কাঁচা রুটি কিনে খেয়ে শোওয়ার জন্য বেছে নিতে হয়েছে যে-কোনো লোকের বাড়ির রোয়াক। এহেন রাধারমণ-এর দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের সঙ্গে নিজের সাময়িক কৃচ্ছ্রসাধনকে সমপর্যায়ভুক্ত করে পরিচয়-এর আড্ডায় তর্কে মেতেছেন সুধীন্দ্রনাথ। ধনীর দুলালের দারিদ্র্য-বিলাসের এই বিলাপকে অপলাপ ছাড়া সত্যিই কি আর কিছু ভাবা যায়?

এছাড়া শিল্পী যামিনী রায়-এর দারিদ্র্য নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যেসব কথা বলেছেন তার সত্য-মিথ্যা আমি জানিনে। তবে কবি বিষ্ণু দে-র স্মৃতিচারণ-মূলক রচনায় যামিনীবাবুর পারিবারিক জীবনের যে-চিত্র পেয়েছি তাতে তো মনে হয় তিনি ছিলেন বাঁকুড়ার বেশ সম্পন্ন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ। সুতরাং তাঁর আধ-পেট খেয়ে চলা এবং লজ্জানিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করতে না-পারার কথা, অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়।

এরপর দীর্ঘকাল, প্রায় এক বছর, পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণ-এর উপস্থিতি কিংবা তাঁকে নিয়ে কোনো আলোচনা-সম্পর্কিত বিবরণ বা তথ্য শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ নেই। ১৯৩৯ সালের ১৪ জুলাই

দেখতে পাচ্ছি, সুধীন্দ্রনাথ-এর বাড়িতে পরিচয়-এর আড্ডায় হিরণকুমার সান্যাল প্রখ্যাত কবি ও সঙ্গীতশিল্পী হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই আড্ডার আসরে যোগ দিতে এসেছিলেন রাধারমণ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ও কর্মীরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যামিনী রায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, মনীশ ঘটক, মজিদ রহিম, অবনীভূষণ চ্যাটার্জি, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন তরুণ কবি।

শ্যামলবাবু লিখেছেন, 'হীরেন মুকুজ্জে ও সুরেন গোস্বামী হরীন্দ্রকে আলাদা সরিয়ে নিয়ে কিছু কাজের কথা বলে নিলেন। রাধারমণবাবু আমার পাশেই বসেছিলেন। বললেন, দেশকে ভালো করে দেখতে ও বুঝতে হলে বার বার উত্তর অথবা পশ্চিম দিকে না গিয়ে, উচিত দক্ষিণে গিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে আসা।

'…সুধীন্দ্র কী-একটা কাজে উঠে যাওয়া মাত্র আমি হরীন্দ্রকে তুলে এনে ঘরের মাঝ বরাবর এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আবৃত্তি শোনাতে অনুরোধ করলাম। তিনি কোনো ইতস্তত না করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। পরপর কতকগুলি স্বরচিত কবিতা শোনাবার পর কোনো বিরতি না দিয়ে মার্গ সঙ্গীত, ভজন, নিগ্রো স্পিরিচুয়াল, রুশ ও ভারতীয় লোকসঙ্গীত এবং ভারতীয় প্রগতিবাদী-দের আনুষ্ঠানিক গান গেয়ে গেলেন উদাত্ত কণ্ঠে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। পরিশেষে একটি ভজন দিয়ে কণ্ঠ ও ভাবাবেগের আশ্চর্য যাদুকরী বিন্যাসের পরিচয় দিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন।

'আবৃত্তি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সুধীন্দ্র ফিরে এসেছিলেন। তিনি নীরবতার স্তব্ধতা ভেঙে হরীন্দ্রের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আবার আসুন রবিবারে, তাহলে আরো অনেকে শোনবার সুযোগ পাবে।'…

[দ্র. পরিচয়-এর আড্ডা, পৃ. ১৫৫]

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের একটি তথ্য জানাতে চাই। এর আগের সপ্তাহে, অর্থাৎ ৭ জুলাই প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে যে আসর বসে, পরিচয়-এর সেই আসরে সাহেদ সুরাওয়ার্দি একটি পোস্টকার্ড পড়ে জানিয়ে দেন—সরোজিনী নাইডুর ভাই হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক কলকাতায় আসছেন। তিনি নাকি ফোনে সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর বাড়িতে এঁদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করতে বলেন কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সোজা জবাব দেন—'নো'।

এই আসরে উপস্থিত সুধীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে তাই সাহেদ শ্লেষের সঙ্গেই বলেন, 'যত রাজ্যের স্কাউণ্ড্রেল বা তথাকথিত প্রগতিবাদীদের নিজের বাড়িতে তুলতে পারে' সুধীন্দ্র কিন্তু একজন প্রকৃত উঁচুদরের সাহিত্যিককে' জায়গা দিতে পারে না।' সুধীন্দ্র তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, 'হরীন্দ্রকে বড়জোর মিস্টিক বলা যায়, সে সাহিত্যিক নয়।'

এক সপ্তাহ আগে সুধীন্দ্র যাঁকে নিজের বাড়িতে থাকার জায়গা দিতে চান নি এবং সাহিত্যিক হিসেবেও স্বীকৃতি জানাতে অস্বীকার করেছেন, তাঁর বাড়ির আসরে সেই হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও গান শুনে তিনি এতই মুগ্ধ যে, তাঁকেই আবার তাঁর বাড়িতে কবিতা ও গান শোনাতে আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতেও দ্বিধা করেন নি। একদিকে অহংবোধ, অন্যদিকে রসগ্রাহী মনের ঔদার্য ও নান্দনিক চেতনা একই সঙ্গে মিলেমিশে যেন গঠন করেছিল সুধীন্দ্রনাথ-এর স্বভাবধর্ম।

যাহোক, হরীন্দ্রনাথ-এর আগমনবার্তা যে পরিচয়-গোষ্ঠী ছাড়াও প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতা ও কর্মীদের কাছেও পৌঁছেছিল আসরে রাধারমণ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সমর সেন আর সুভাষ মুখার্জি-র উপস্থিতিই তার প্রমাণ। শুধু আড্ডার আকর্ষণে নয়, এত দীর্ঘকাল পরে রাধারমণ যে এসেছিলেন হরীন্দ্রনাথ-এর টানে, একথা সম্ভবত অনুমান করা যায়।

আবার প্রায় আট মাস পরে, ১৯৪০ সালের ২৯ মার্চ, পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণ মিত্র-র নাম উচ্চারিত হওয়ার কথা জানা যাচ্ছে শ্যামলবাবুর ডায়েরি থেকে। এই আসরে সুশোভন সরকার, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুমন্ত্র মহলানবিশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাধারমণও সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন. না হলে শ্যামলবাবু কেন লিখবেন, 'হারীতদা [হারীত কৃষ্ণ দেব] সুধীন্দ্র-র বিরক্তি অগ্রাহ্য করে রাধারমণ মিত্রের মনোরঞ্জন করে চলেছিলেন দ্ব্যর্থক বাক্যের প্রয়োগে।'

[দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ, ১৯৮]

উপরোক্ত বাক্যটি ছাড়া শ্যামলবাবুর ডায়েরিতে রাধারমণ-প্রসঙ্গে অন্য কিছু লেখা নেই। এখানে লক্ষণীয়, রাধারমণ-প্রসঙ্গ উত্থাপনে সুধীন্দ্রনাথ-এর অপ্রসন্নতা।

১৯৪০ সালের ৫ এপ্রিল শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন,

'যে-কোনো কারণেই হোক নীরেন [নীরেন্দ্রনাথ রায়] আসর ত্যাগ করেছেন। আজ জীবনময় রায়কেও আসতে দেননি।'

[দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ, ১৯৯]

আমরা জানি, এই সময় সুধীন্দ্রনাথ-এর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ ও সোভিয়েত-বিরোধিতা পরিচয়-এর আড্ডায় প্রায়শই উচ্চারিত হতো। পক্ষান্তরে, রাধারমণ-এর সাহচর্যে ও সহযোগিতায় ৩/৪ বছর ধরে মার্কসীয় দর্শন গভীরভাবে অনুশীলন করে নীরেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট মতাদর্শকেই জীবনের ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এটাই কি 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হওয়ার অন্যতম কারণ এবং রাধারমণ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ-এর মনে বিরূপতা সৃষ্টির মূলেও কি নিহিত ছিল এইসব ঘটনা ? এর সঠিক উত্তর এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, 'পরিচয়' পত্রিকার আদিযুগের প্রধান পুরুষেরা সম্ভবত সকলেই আজ প্রয়াত।

এরপর ১৯৪০ সালের ১২ এপ্রিল শ্যামলবাবু তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, "কয়েকটি কাজ সেরে সুধীন্দ্র-র বাড়িতে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আসরে নতুন লোক দেখলাম মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী। আর এসে-ছিলেন এলা সেন ও মিনি বনার্জি। তাঁদের সঙ্গে পূর্বপরিচয় ছিল। রাধারমণ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় এতদিনে নিয়মিত সভ্য হয়ে গেছেন।' [দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০০]

ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত শেষ পংক্তিটিতে যেভাবে রাধারমণ এবং অন্য তিন-জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে এবং আড্ডার 'নিয়মিত সভ্য' রূপে তাঁরা স্বীকৃত হয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে এই দিনের আসরে এঁরা সবাই উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামলবাবুর ডায়েরিতে ঐ দিন আসরের আলোচনায় রাধারমণ-এর অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে কিংবা তাঁর প্রসঙ্গে আলোচিত কোনো কথার উল্লেখ নেই। ডায়েরিতে শুধু লেখা আছে : 'যতক্ষণ ছিলেন, এম. এন, রায়কে মনে হলো দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ। কথা বলে নিজেকে খেলো করতে চান না। যেটুকু বলবেন তাই লিখে রাখা হবে বলে গৃহিণীর হাতে ছোট একটিপ্যাডওপেনসিল মজুদ ছিল। তাঁরা কিন্তু দুজনেই মৌন থাকলেন। ···রায়-দম্পতি কাজের দোহাই দিয়ে উঠে যেতে এলা বললেন, রায় বৈঠকী আলাপে আড়ষ্ট কিন্তু সুধীন্দ্র যখন দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, মানবেন্দ্র যে কোনো প্রসঙ্গে ব্রিলিয়ান্টলি কথা বলে থাকেন তখন তিনি নিজেকে সংশোধন করে বললেন, হ্যাঁ,··· আজ অবশ্য একেবারেই মুডে ছিলেন না।

'মেজাজের উল্লেখ করায় অনেকে হাসলেন। বিষ্ণু বললেন, হীরেন্দ্রনাথ বলছিলেন কেউ সরলভাবে জিজ্ঞেস করলে পারত উনি রাশিয়া থেকে চলে এলেন কি কারণে?' [দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০০]

মানবেন্দ্রনাথ ছাড়া শ্যামলবাবুর এদিনের ডায়েরিতে শিল্পী অতুল বসু-র আঁকা সুধীন্দ্রনাথ-এর একখানা ছবি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আলোচনার কথাই শুধু লিপিবদ্ধ আছে।

পরের সপ্তাহে, অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ১৯ এপ্রিলের ডায়েরিতে আমরা পরিচয়-এর আড্ডায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর গ্রেপ্তার হওয়ার কথা জানতে পারছি। আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, সমর সেন, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ যখন হীরেনবাবুকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন আসরে এসে উপস্থিত হন সুশোভন সরকার এবং হিরণকুমার সান্যাল। এর একটু পরে সুরেন গোস্বামী এসে খবর দেন যে, একঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরার পরে হীরেনবাবুকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্যামলবাবু বলেন, এর আসল উদ্দেশ্য হলো এ দেশের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে হীরেনবাবুকে সতর্ক করে দেওয়া। এই কথা সমর্থন করে বিষ্ণুবাবু নাকি রাধারমণ সম্বন্ধে চমৎকার একটি গল্প বলেন। রাধারমণ-এর নামের উল্লেখ ছাড়া সেই গল্পের কোনো বিবরণ শ্যামলবাবুর ডায়েরিতে নেই।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ-এর 'পরিচয়-এর আড্ডা' নামক গ্রন্থে ১৯৪১ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত লেখা ডায়েরি সংকলিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৪০ সালের ১৯ এপ্রিলের পর তাঁর লেখা এই ডায়েরিতে রাধারমণ-প্রসঙ্গে আর কোনো তথ্য আমি অন্তত খুঁজে পাইনি। আমরা জেনেছি, শ্যামলবাবু আরও কিছুকাল পরিচয়-এর আড্ডার বিবরণ তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াণে সেই ডায়েরি আজও অসংকলিত অবস্থায় আছে। সুতরাং তার মধ্যে রাধারমণ-সংক্রান্ত নতুন কোনো তথ্য আছে কি-না তা বলা অসম্ভব। অনুমান করতে পারি, এই সময় 'পরিচয়' পত্রিকা যে-সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, সুধীন্দ্র ও নীরেন্দ্র—'পরিচয়'-এর দুই প্রধান স্তম্ভ পরিচয়-পরিচালনা থেকে যেভাবে দূরে সরে যেতে থাকেন, আর ফ্যাশিস্ট-দানব হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরে প্রগতিপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যেভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তার ফলে পরিচয়-এর আড্ডায় যাওয়ার মতো মানসিকতা তাঁদের না থাকাই

স্বাভাবিক। এই কারণেই মনে হয় রাধারমণও আর সুধীন্দ্রনাথ-এর পরিচয়-এর আড্ডায় যাননি কিংবা যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলেন না।

আমি হিসেব করে দেখেছি, ১৯৩৮ সালের জুলাই থেকে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস, অর্থাৎ প্রায় দু'বছরের মধ্যে পরিচয়-এর আড্ডায় রাধারমণ সশরীরে উপস্থিত থেকেছেন মাত্র বার চারেক। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আড্ডার আসরে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিংবা প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে অন্তত আরও চার বার। এটাও স্মরণযোগ্য যে, ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাধারমণকে পরিচয় এর আড্ডায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করলে সুধীন্দ্রনাথ যে-আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর মনোভাবে তা আর লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর ডায়েরিতে রাধারমণকে আড্ডার আসরের 'নিয়মিত সভ্য' রূপে গণ্য করেছেন। হিরণকুমার সান্যালও তাঁর 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র' নামক গ্রন্থে 'পরিচয়-এর আড্ডা' শীর্ষক রচনায় অবিবাহিত আড্ডাধারী রূপে নিজেকে সহ নীরেন্দ্রনাথ রায়, সাহেদ সুরাওয়ার্দি, বিষ্ণু দে এবং 'বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী রাধারমণ মিত্র'-র নামটিও লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধা করেন নি। [দ্র. উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৮]

যাহোক, পরিচয়-এর আড্ডার সূত্র ধরেই আমি এই নিবন্ধে রাধারমণ-এর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রসঙ্গ অনুসরণ করে তাঁর কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি মাত্র। এর মধ্য দিয়েই সচেতন পাঠকেরা হয়তো বুঝতে পারবেন, তিরিশ আর চল্লিশের দশকের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বাঙলার বিদ্বজ্জনসমাজের এক গরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব-মৈত্রীর বিশিষ্ট সম্পর্কটি।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

১. পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, হিরণকুমার সান্যাল।
২. পরিচয়-এর আড্ডা, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।
৩. তরী হতে তীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৪, পরিচয়, বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ৫-৬, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৭৩।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন : কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অজেয়া সরকার

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সাত দশক প্রায় পার হয়ে এল। বলার অপেক্ষা রাখে না, যাত্রা শুরুর দিনগুলির চরিত্রের সঙ্গে হালফিলের পার্থক্য প্রভূত। একটি সাম্রাজ্যবাদ পদানত অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশে সদ্যোজাত কমিউনিস্ট দলের ভূমিকা সঠিক কেমন হবে, তা নিয়ে নানা আলোচনা-বিশ্লেষণ চলেছে, চলছেও। এদেশের ক্ষেত্রে অন্তত এটুকু বলা যায়ই যে, জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সময়ের ডাকে সাড়া দিতে চেষ্টা করেছে।

বস্তুত এইখান থেকেই একটি নতুন আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে যে, এই 'সাড়া দেওয়ার' প্রয়াস কতটা সফল হয়েছিল? যদি সবসময় সাফল্য না এসে থাকে, তবে নিহিত কারণ কি? আধুনিক কালে এই প্রশ্নগুলি প্রায়শই উচ্চারিত হচ্ছে, কারণ সাম্প্রতিক বেশকিছু গবেষণা থেকে জানা গেছে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিতে এমন কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেগুলি সম্পর্কে দলে ঐকমত্য ছিল না। বরং এও বলা যায়, যে, কঠিন দলীয় সংহতির ব্যাপারটি তিরিশের দশক পর্যন্ত বেশই ঢিলেঢালা ছিল, সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত মাথায় রাখলে। অবশ্য ওই পর্বকে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাপর্ব বলা যায়। সেকারণেই সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ও তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কমিউনিস্ট সংহতির ক্ষেত্র বিশেষে অভাব থাকলেও, সেটিকে খুব গুরুত্ব দেওয়ার কারণ নেই। কিন্তু জটিলতা বাড়ে চল্লিশ দশকে এসে—এবং সে জটিলতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিমণ্ডলে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে সবক্ষেত্রেই ঐকমত্য যে ছিল না শুধু তাই নয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কেও বারংবার মতভেদ হয়েছে। সদ্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং এই নতুন প্রেক্ষিতে শাসক-শ্রেণী হিসাবে জাতীয় বুর্জোয়ার মূল্যায়ন এবং পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে প্রায় সবসময়েই দলীয় বিতর্ক চলেছে। বাস্তবিক, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর

পড়ে—এক, দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী 'বিচ্যুতি' দিয়ে কোনো পর্বকে যদি চিহ্নিত করা হয়ও, তথাপি লক্ষ্য করা যাবে, সেই পর্বেই দলের অভ্যন্তরে আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত নীতির প্রতিবাদী স্বর রয়েছে। হয়ত পালাবদলও ঘটেছে কালের বিচারে দ্রুতই। যদিও তাতে দলের কাঠামো কিমবা মূল লক্ষ্যের কারণে যে সংহতি, তা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। দলের দারুণ দুর্দিনেও নয়। দ্বিতীয়তঃ, কি ঔপনিবেশিক আমলে, কি কংগ্রেস শাসনে—জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা বিশ্লেষণে দলের অভ্যন্তরে নানা দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। আন্তর্জাতিক নানা প্রশ্নও সময়বিশেষে এই ভূমিকা বিশ্লেষণে ছায়া ফেলেছে। ষাটের দশকে মর্মান্তিক ভাঙনের পূর্বাভাস হিসাবে এই বিষয়টি কিছুটা গুরুত্ব দাবি করে।

কিন্তু ঠিক এইখানে থেকেই পরবর্তী জরুরী প্রশ্নটি উঠবে—যে, যদি জানা যায়, গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু প্রশ্নে দলের মধ্যে মতভেদ আগেও হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও দল অটুট রাখা গেছে, তবে ষাটের দশকে এসে দলকে দ্বিখণ্ডিত করতে হ'ল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে দিয়েই প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেনের সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮—১৯৬৪)' পাঠ শুরু করা যেতে পারে।

কমরেড রণেন সেনের বইটির প্রথম ও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এটি একজন কমিউনিস্টের লেখা যিনি তত্ত্ব-রণনীতি-রণ-কৌশলও তৎসম্পর্কীত যাবতীয় আচরণগত দুর্বলতার টানাপোড়েনকে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন একজন কমিউনিস্ট যাঁকে, "কি করে পার্টিটা ভাগ হল, কারা এ-ব্যাপারে উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং তার পিছনের কারণ কি ছিল?" —এই প্রশ্ন জর্জরিত করেছে।

লেখক শুরু করেছেন যে সময়কাল দিয়ে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তা একটি অস্থিরতার যুগ। যুগসন্ধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনীতি তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ প্রতিরোধে টালমাটাল। কিন্তু কমরেড রণেন সেন জানিয়েছেন, এইসব প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তেমন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। "ভারতবর্ষও যে এক রাজনৈতিক বিস্ফোরণের মুখে তা পার্টি, বিশেষতঃ পার্টির নেতৃত্ব বুঝতে সক্ষম হন নি।" পাশাপাশি ছিল বিরোধীপক্ষের 'স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি কমিউনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতার' শ্লোগান। ফলত "এই সময় থেকেই পার্টিতে বস্তুত একটা রাজনৈতিক

বিভ্রান্তি, অনিশ্চয়তা ও বিমূঢ়তা দেখা দেয়—যার প্রমাণ ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনা ও প্রস্তাব"।

কি ছিল সেই প্রস্তাবে? রণেন সেন জানাচ্ছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর্থন ও ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সহযোগিতায় বিশ্ব গণতান্ত্রিক শক্তির জয়ে ভারতবর্ষের শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে"। খুচরো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১৯৪৬-এর এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নতুন মূল্যায়ণ হয় ঠিকই কিন্তু সেখানেও 'মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তিতে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ সর্বজনবোধ্য প্রস্তাব গৃহীত হয় না'। কমরেড রণেন সেন জানিয়েছেন, ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর ও ১৯৪৬-এর এপ্রিলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরে বিভিন্ন জেলা কমিটি ও পার্টি ইউনিটের সাধারণ সভ্যদের সভায় কমরেডরা বহু প্রশ্ন তোলেন যার উত্তর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে ছিল না। বাস্তবিক পার্টির প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও আনুগত্য বোধে সাধারণ কমরেডরা সেদিন কংগ্রেস ও লীগের যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা করেছিলেন।

নবগঠিত কংগ্রেস সরকারের চরিত্র ও পার্টির রণনীতি নিয়েও মতভেদ তীব্র ছিল। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তা প্রকট হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষের সরকার মিছিলের উপর গুলি চালালে একজন মারা যান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের অভিজ্ঞতার নিরিখে কংগ্রেসী জমানার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন—সঙ্গে পান রণদীভে, অজয় ঘোষ এবং ডাঙ্গেকে। অপর পক্ষে পি সি যোশী ও পি সুন্দরায়ার নেতৃত্বে কিছু সদস্য। রণেন সেন জানিয়েছেন, যোশী-সুন্দরায়ার বক্তব্য ছিল—ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে জনগণের বিরাট জয় সূচীত হয়েছে—সরকারকে আক্রমণ করলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে—সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে জাতীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিতে হবে—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও প্রগতিশীল, ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এর বিরোধীরা ক্ষমতা হস্তান্তরকে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে জনগণের আশু বিদ্রোহ দমনের জন্য আঁতাত হিসাবেই দেখেছিলেন।

কমরেড রণেন সেনের দেওয়া এই আভ্যন্তরীণ চিত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে—যে, ষাটের দশকের পার্টি বিভাজনকে যদি নিছক

আদর্শগত মতভেদের দরুণ বলেই ভাবতে চাই, তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, দ্বিখণ্ডিত পার্টির দুটি শাখাতেই যাঁরা নেতৃত্বে আসেন, বছর দশেক আগেও তাঁদের অনেকেরই অবস্থান ছিল ভিন্নরকম।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস ১৯৪৮-এ কলকাতায়। যোশীযুগের শেষ, রণদীভে পর্ব আরম্ভ। কমরেড রণেন সেনের লেখায়, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির পরে বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ। দলিলে এবার বলা হলো, "ভারতের বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদ তার সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত করতে চায়"। নতুন সম্পাদক রণদীভে পলিট ব্যুরো-র সামনে যে নতুন রাজনৈতিক দলিল পেস করেন তাতে নেহরু সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও বিপ্লববিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয় এবং এর আভ্যন্তরীণ নীতি প্রতিক্রিয়াশীল, জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করতে সচেষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়। রণদীভের দলিলে বিপ্লবের "প্রধান শক্তি হিসাবে প্রলেতারিয়েত, সহযোগী শক্তি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক, এমনকি মধ্য কৃষক ও শহরের অত্যাচারিত নিম্ন মধ্যবিত্ত। প্রধান আঘাত হানতে হবে শাসক ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। অন্য বুর্জোয়া শক্তি ও সোশ্যালিস্ট পার্টিকেও বিচ্ছিন্ন করতে হবে। প্রলেতারিয়েত ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, মধ্য কৃষক দ্বারা অনুসৃত ও সমর্থিত হয়ে বুর্জোয়াকে একঘরে করে, বিচ্ছিন্ন করে, তাদের প্রতিরোধ বিফল করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করবে"।

আবারো লক্ষ্যণীয় যে, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পরে যে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি হয়, সেখানেও অনেক বিষয়েই ঐকমত্য ছিল না। যেমন, পার্টির অন্ধ্র-ইউনিট এই দলিলের বিরোধিতা করেছিল যে শুধু তাই নয়, দুজন পলিটব্যুরো সদস্য সহ অন্ধ্র পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী 'বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও রণনীতি-নয়াগণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র' নামে এক পাল্টা দলিলে বলেছিলেন যে, ভারতের বিপ্লব চিরায়ত রুশ বিপ্লব থেকে অনেক অর্থে স্বতন্ত্র, বরং অনেকখানি তার মিল আছে চীনের বিপ্লবের সঙ্গে। এই বক্তব্যের অন্যতম প্রধান উত্থাপক পি সুন্দরায়া। কমরেড রণেন সেন জানাচ্ছেন, যে বাংলার পার্টি ইউনিটকেই কংগ্রেস সরকার, সর্বপ্রথম বেআইনী ঘোষণা করে ২৫শে মার্চ ১৯৪৮-এ এবং তারপরে চলে ব্যাপক ধরপাকড়, সেই বাংলার পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীতেও সংস্কারপন্থী বিচ্যুতি দেখা গিয়েছে বলে রণদীভের দলিলে উল্লেখ হয়। বাংলার অল্প কিছুদিন পরেই অন্ধ্র পার্টি বেআইনী ঘোষণা হয়। লক্ষ্যণীয় এটাই যে,

বাংলায় সংস্কারপন্থী প্রবণতা দেখা গেছে বলে রণদীভের দলিলে উল্লেখ থাকলেও, রণেন সেন লিখেছেন, 'জেনারেল সেক্রেটারী রণদীভে, পলিটব্যুরো সদস্য ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী তাঁদের কিছু সহকর্মী নিয়ে বাঙলার পার্টির পূর্ণ সহযোগিতায় কলকাতায় কেন্দ্রীয় দফতরের কাজ শুরু করলেন"।

কিন্তু যোশীপর্বের যে ধরণের দুর্বলতার প্রতিবাদ হিসাবে 'বাম' রণদীভে-পর্ব শুরু হয় ক্রমশই তা তীব্র সংকীর্ণতাবাদে দুষ্ট বিপথগামী হয়ে পড়ে। কমরেড রণেন সেন লিখছেন, "ক্রমে ক্রমে মতবাদ ও তত্ত্বগত প্রশ্নে এবং সাংগঠনিক ব্যাপারেও পার্টির সাধারণ সম্পাদক সর্বাধিনায়ক ও সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ালেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সব ক্ষমতা পলিটব্যুরোর নামে নিজে আত্মসাৎ করেন, অর্থাৎ পলিটব্যুরোর সব ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। কয়েকজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাঁর হাতের পুতুল হয়ে তাঁর নির্দেশে পার্টির বিভিন্ন ফ্রন্ট পরিচালনা করতেন…রণদীভের ধারণা হয় পার্টিতে ভীষণ সংস্কারবাদের শিকড় গজিয়েছে।…কমরেড রণদীভে নিজের মতামত পলিট ব্যুরোকে গলাধঃকরণ করিয়ে পলিট ব্যুরোর নামে প্রচার করতেন। সংস্কারবাদ উচ্ছেদের নামে বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি এমনকি জেলা কমিটিও ভেঙ্গে দেন। সংস্কারবাদী সন্দেহে অনেক প্রাদেশিক কমিটির সদস্যকে পার্টি থেকে বহিষ্কার (এক্সপেল) বা সাময়িকভাবে বহিষ্কার (সাসপেণ্ড) করে দেন।…প্রাদেশিক কমিটিগুলির পার্টি গঠনতন্ত্রলব্ধ অধিকার খর্ব করে দেন। বিভিন্ন প্রদেশের ও ফ্রন্টের বেয়াড়া (অবাধ্য) কমরেডদের সংস্কারবাদী আখ্যা দিয়ে কলকাতায় আনা হত এবং এখানে কড়া পাহাড়ায় রাখা হত।…রণদীভে ক্রমে অন্যান্য কেন্দ্রীয় কমিটি এমনকি পলিট ব্যুরোর সভ্যদেরও যাচ্ছেতাই ভাবে দলিলে সমালোচনার নামে গালাগালি করতে লাগলেন।"

১৯৪৯ সালের সর্ব ভারতীয় রেল ধর্মঘট সংগঠিত করা সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়েও রণেন সেন তৎকালিন পার্টি নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় "পলিট ব্যুরোর বর্ণিত বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব কোথায়ও ছিল না। তাই ধর্মঘটে বিফলতার পর কিছু পার্টি সদস্য ধর্মঘটের ডাকের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল"। এর পাশাপাশি আমরা স্মরণ করতে পারি কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী রচিত ট্রেড ইউনিয়ন দলিলটি দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে রণদীভের রাজনৈতিক দলিলে সংস্কারপন্থী ভাবধারার নমুনা হিসাবে সমালোচিত হয়। রেলধর্মঘটের ব্যর্থতা এবং তীব্র সরকারী দমননীতির সামনে পার্টির অসহায়তা বস্তুত রণদীভের বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী

পথের সীমাবদ্ধতাকেই ফুটিয়ে তোলে। রণেন সেন যাকে বলেছেন, 'পার্টি কানাগলিতে উপস্থিত হয়েছিল'।

কিন্তু এই অচলাবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলেন সম্ভবত অনেকেই। এই সময়েই কমিনফর্মের পত্রিকায় ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর রণনীতি, রণকৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। যার পরিণতিতে তীব্র হয়ে ওঠে ইনার পার্টি স্ট্রাগল। অল্প কিছুকালের মধ্যেই ওই সম্পাদকীয় সম্পর্কে পলিট ব্যুরোর বিবৃত বের হয়, ১৯৫০-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী। সমস্ত পার্টি সদস্যের উদ্দেশে বিবৃতিতে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডেকে পলিট ব্যুরো তার ভুলের সংশোধন করবে ও যতখানি পার্টি অগ্রসর হয়েছে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু সমস্যা এতে মেটে নি। পলিট ব্যুরোর বিবৃতি বহু সদস্যের কাছেই "পার্টিকে অন্ধ রাখার মতলব, নিজেদের দোষ স্খালনের চেষ্টা, সম্পাদকীয় থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করা, নিজেদের আত্মসমালোচনা থেকে বিরত থাকা বলেই" মনে হ'ল। ফলত আন্তঃ পার্টি সংগ্রাম আরো তীব্র হয়ে ওঠে। কমিনফর্মের সম্পাদকীয়তে চীনা পন্থা ও মাও-সে-তুঙের মত কিছুটা গুরুত্ব পেয়েছিল বলে, যে অন্ধ্র ইউনিট এতদিন পলিট ব্যুরোর দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছিল, তাদের মতই যেন কমিনফর্ম সমর্থিত বলে অনেকে মনে করলেন। দাবী উঠল, পলিট ব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি বদলাও। তাই হ'ল শেষ পর্যন্ত। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সভার প্রস্তাব অনুযায়ী কমরেড রণদীভে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হলেন। সোমনাথ লাহিড়ী, ডঃ অধিকারী, বৈদ্য, এন কে কৃষ্ণাণ, ভবানী সেন সাসপেণ্ড হলেন।

এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় বহিস্কৃত ও সাসপেণ্ড যাঁরা হলেন তাঁদের নামগুলি, যা পরবর্তীকালের পার্টি ভাগের সময়ে নেতৃত্ব বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। শুধু তাই নয়, রণদীভের কাজের সঙ্গে কম-বেশি যুক্ত থাকা বা তাঁর বক্তব্যকে নানা স্তরে মেনে নেওয়ার জন্য যাঁরা কমবেশি সমালোচিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন লাহিড়ী, কৃষ্ণাণ, ভবানী সেন এমনকি রাজেশ্বর রাও।

নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের কাছে যে দলিলটি প্রথম পেশ করেন, তাতে তেলেঙ্গানা ও মৈমনসিংহের পাহাড়ী এলাকা ছাড়া সর্বত্রই পার্টির বামপন্থী উন্মার্গগামীতা, সংকীর্ণতা ও হঠকারিতার সমালোচনা করা হয়। কমরেড রণেন সেন বলেছেন, এই দলিলটি সম্পূর্ণ নয়, তবে তা পুরোনো

পলিট ব্যুরোর লাইনকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ট্রটস্কিবাদী ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে টিটোপন্থী বলে অভিহিত করে। এই নতুন দলিলে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস যে সংস্কারবাদের মূলে কঠোর আঘাত হেনেছিল তাকে গুরুত্ব দিয়েও জানালেন যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ও বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বের ধারণা নিয়ে আসলেও তৎকালিন পলিট বুরোর বাম বিচ্যুতি লেনিন-স্তালিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও উপনিবেশের বিপ্লবের সূত্র থেকে সরে এসে ট্রটস্কি-বাদে শেষপর্যন্ত পৌছল এবং পরিণামে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের ইতিবাচক সিদ্ধান্তগুলির কার্যকারীতা নস্যাৎ হয়ে যায়।

আভ্যন্তরিণ মতাদর্শগত সংগ্রাম কিন্তু থেমে থাকে নি। কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতিতে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের মধ্যে সমঝোতার এক নতুন বিন্যাসও লক্ষ্য করা যায়। রণেন সেন বলেছেন, "সেই অবস্থায় অন্ধ্রের পলিট ব্যুরোর ও কিছু কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা উদ্যোগী হয়ে পার্টিকে তাঁদের কথিত ও প্রবর্তিত লাইনে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে কমরেড রাজেশ্বর রাও ও বাসবপুন্নিয়া বিশেষ চেষ্টা করে ১৯৫০ সালে মে-জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকেন। ··· ··সকলেই যে অন্ধ্র দলিল গ্রহণ করলেন তা নয়। ঐ মতের বিরুদ্ধবাদীরাও মাথা তুলে দাঁড়াল—(ক) পুরাতন সংস্কারবাদীরা, (খ) প্রাক্তন পলিট ব্যুরোর সমর্থকরা, (গ) এই দুই মতের বাইরেও বিশেষ করে বাঙলা ও কয়েকটি শিল্পোন্নত প্রদেশের কিছু কমরেড প্রাক্তন পলিট ব্যুরো ও অন্ধ্র মতের বিরোধী মত প্রকাশ করতে লাগলেন"।

রণেন সেন এভাবেই এই জটিল সময়ের অভিজ্ঞতা-চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচত করেছেন। দ্বন্দ্ব ও সংকটের ঘূর্ণিতে আবর্তিত হতে হতে এদেশের কমিউনিস্টরা কিভাবে পথ চলেছেন, তা এই পর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু অবস্থা কিছুটা বদলায় দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে, কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করার ফলে। যে কটি বিশেষ কারণে নতুন পলিট ব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনী লড়াইতে নামার সিদ্ধান্ত নেয়, রণেন সেন তার উল্লেখ করেছেন। প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে, কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনী প্রচার শুরু করে—শুধু আভ্যন্তরীণ নীতি নয়, সরকারের বৈদেশিক নীতিরও সমালোচনা হয়—কমিউনিস্ট পার্টি সব গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে একতার জন্য আবেদন করে, কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রকৃত ধারক বলে ঘোষণা করে, এমনকি কিছু পরিমাণে নিজেদের ভুলত্রুটিরও প্রকাশ্য সমালোচনা করে।

জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে জনগণকে নির্বাচনী সংগ্রামে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এই সময় থেকে শুরু করে মাদুরায় তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত বলা যায় পার্টি আবার ধীরে ধীরে সংহতি ফিরে পেতে থাকে। পার্টিকে জাতীয় শক্তি হিসাবে তৈরি করার প্রয়োজন গভীর ভাবে অনুভূত হয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে সম্ভ নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির দিল্লী সভায় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা বিষয়ে প্রস্তাব পাশ হয়। বস্তুত এই ধরনের প্রস্তাব এই প্রথম এত গুরুত্ব পায়। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার নেহরু সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীকে কেন্দ্র করে মত পার্থক্য মাথা চাড়া দেয়। নেহরুর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য থেকে দেশের অভ্যন্তরে নেহরু সরকার সমাজতন্ত্রের পথেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সেকারণে মাদুরা কংগ্রেসের লাইন থেকে সরে এসে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার পথ নিতে হবে—এমন বক্তব্যও শোনা যেতে থাকে। রণেন সেন লিখেছেন, 'নিউ এজ' পত্রিকায় ওই সময়ে নেহরুর উপরে কমরেড রামমূর্তির একটা লেখা থেকে এই ধারণা বিস্তারের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। প্রতিবাদে অজয় ঘোষ লেখেন 'নেহরুজ সোশ্যালিজম ঃ এ হোক্স', নামে এক পুস্তিকা।

বস্তুত মাদুরায় তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস (১৯৫৩) এবং পালঘাটে চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের (১৯৫৬) মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেমন, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে অনেক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। রণেন সেনের ভাষায় "১৯৫৪—১৯৫৫-র মধ্যেই পার্টির ভিতরে বাম ও দক্ষিণপন্থী মতবাদের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলতেই থাকে"। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে পালঘাট কংগ্রেসের প্রেক্ষিতে লেখক অজয় ঘোষ ও নাম্বুদ্রিপাদের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, এই দুজন কমিউনিস্ট নেতা অজয় ঘোষ, ও নাম্বুদ্রিপাদ নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাম বা দক্ষিণপন্থী বলে চিহ্নিত করতে চাইতেন না। কারণ এঁরা দুজন মনে করতেন যে, বাম বা দক্ষিণ শিবির উভয় পক্ষই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ থেকে কিঞ্চিৎ সরে গেছেন। আরো কয়েকজন যেমন—ভূপেশ গুপ্ত, সোহন সিং যোশ এবং স্বয়ং লেখক রণেন সেন কোন ফ্যাকশানে ছিলেন না। পালঘাট কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক দলিল পেশ ও গৃহীত হয়, তার উত্থাপক ছিলেন অজয় ঘোষ। রণেন সেন লিখছেন যে, পালঘাট কংগ্রেসে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন অজয় ঘোষই, তার পরেই বলতে হয় নাম্বুদ্রি-

পাদের নাম। রণেন সেনের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, অজয় ঘোষের প্রস্তাব ও বক্তব্যের বিরোধী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই পরবর্তী কালে সি. পি. আই-তে রয়ে যান। আর তৎকালিন 'বামপন্থী' গোষ্ঠীর কোনো জোরালো মুখপাত্র পালঘাটে ছিলেন না, তাঁরা অজয়কে 'দক্ষিণপন্থী ভাবলেও অবস্থার বিচারে অজয় নাম্বুদ্রিপাদ লাইনকেই সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে সি. পি. আইতে রয়ে যান অথচ অজয়কেই পালঘাটে সমর্থন করেছিলেন এমন উল্লেখযোগ্য নাম হ'লো ভূপেশ গুপ্ত ও রণেন সেন।

কমরেড রণেন সেনের বইয়ে পার্টির ভিতরে যে দু ধরণে বিচ্যুতি, বাম ও দক্ষিণ, ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছিল, তার সবথেকে সদর্থক প্রতিবাদী হিসাবে অজয় ঘোষের নামকে তুলে ধরা হয়েছে। পালঘাট কংগ্রেসের পর থেকেই অজয়ের সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। রণেন সেন এই কাজে অজয় ঘোষের সবথেকে ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী হিসাবে নাম্বুদ্রিপাদের নামই করেছেন।

১৯৫৭-র সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই কাজে নামে বলে রণেন সেন মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে, তিনি জানাচ্ছেন, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে—বিশেষ করে, বাঙলায়, অন্ধ্রে, তামিলনাড়ুতে, কেরালয়ে, পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। এতদসত্ত্বেও কিন্তু নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্য যথেষ্ট। এরপরে কেরালয়ে নাম্বুদ্রিপাদের সরকারকে বরখাস্ত করার সময়েও রণেন সেন পার্টির মধ্যে একতা ফিরে আসা লক্ষ্য করেছেন। বাস্তুত কোনো কমরেড ওই সময় নেহরু সরকারকে সমর্থন করেন নি। পরন্তু চীনের সঙ্গে ভারত সরকারের মনোমালিন্যের প্রেক্ষাপটে 'সাধারণভাবে কমিউনিস্টরা চীনের পক্ষে সমর্থন জানাচ্ছিলেন বলে, এই অভিঘাতটিও দলের ঐক্য ধরে রাখায় সহায়ক হয়ে উঠছিল বলে লেখক মন্তব্য করেছেন।

অমৃতসরের পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে দলীয় সংবিধানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ভারতেও শান্তিপূর্ণ অথচ বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় বলে, পার্টি মনে করে। এই অবস্থার পূর্বশর্ত হিসাবে যেমন শ্রমিক-কৃষক ও সহযোগী শ্রেণীর পার্টি নেতৃত্বে শক্তিশালী গণবিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়, যা কার্যত প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে নির্বাচনী পথেও পরাভূত করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। সংসদীয় রাজনীতিকে সংগ্রামের একটি মঞ্চ হিসাবে তত্ত্বগত স্বীকৃতি এই প্রথম দেওয়া হল। লক্ষ্যনীয় এটাই যে, "সামান্য আলোচনার পর সর্বসম্মতি

ক্রমে পরিবর্তন সংবিধানে সংযোজিত হয়"। বাঙলার কিছু প্রতিনিধি যে অতিবিপ্লবী ধরনের বক্তব্য তুলেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত অজয় ঘোষ খণ্ডন করেন, রণেন সেন তা উল্লেখ করেছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কীত যেসব ঘটনা পরপর ঘটে চলেছে রণেন সেন সেসবের একটা সাধারণ বিবরণ দিয়েছেন। গুরুত্ব পেয়েছে শান্তি আন্দোলনের কথা, চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের তত্বগত ও আচরণগত দিক, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে কমিউনিস্টদের লড়াইয়ের কথা। এই সবের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে আসে বিজয়ওয়াদায় পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস। রণেন সেন বলছেন, সেই সময়ে 'বাম' ও 'দক্ষিণ' উভয় গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু আমরা এযাবৎ যা ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ্য করছি যে, 'বাম' ও 'দক্ষিণ' গোষ্ঠীর নেতৃত্বে কিন্তু ধারাবাহিকতা প্রায়শই ছিন্ন হয়েছে। আজ যিনি 'বাম' গোষ্ঠীতে, কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে তিনি 'দক্ষিণ' গোষ্ঠীতে অবস্থান করছেন। এখানে প্রশ্ন তোলা অস্বাভাবিক নয় যে, এই 'গোষ্ঠীবদল ঘটেছে কেন? নিছক, আদর্শগত কারণে? নিছক 'ব্যক্তিগত কারণে? না কি তৃতীয় দুনিয়ার অনগ্রসর কাঠামোয় কমিউনিস্ট পার্টি তার সুনির্দিষ্ট পথ সহজে খুঁজে পাচ্ছিল না বলেই? এই বইটিতে অবশ্য তার কোনো আলোচনা নেই। ঘটনাকে তথ্য হিসাবে দেখা হয়েছে।

বরং বলা যায় ১৯৬১-র বিজয়ওয়াদা কংগ্রেসেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের একটা নির্দিষ্ট আদল তৈরি হ'লো এবং সেটা হ'লো অনেকটাই এবার তত্বগত স্তরে। যে দুটি রাজনৈতিক দলিল পেশ হয়—একটি বামমার্গী যার প্রধান রচয়িতা ভূপেশ গুপ্ত ও রামমূর্তি এবং অন্যটি দক্ষিণপন্থী, যার রচয়িতা ডাঙ্গে, যোশী ও অধিকারী। দুটি দলিলের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী—ভারতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা ও শ্রেণী-চাহিদা, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও শ্রেণী-বিন্যাস এবং পার্টির রণনীত সম্পর্কে মূল্যায়ণ দুটি দলিলে ভিন্ন। ৮১ পার্টির দলিলের ব্যাখ্যাতেও নেতারা একমত হননি।

১৯৬১-র বিজয়ওয়াদায় ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসই শেষ যুক্ত পার্টি কংগ্রেস। এখান থেকেই ভাঙন প্রায় অনিবার্য চেহারায় দেখা দেয়। বইটিতে কয়েকটি সাময়িক প্রসঙ্গ' শিরোনামে রণেন সেন আরো কয়েকটি বিষয়ের উপরে মন্তব্য করেছেন। তবে মূল আলোচনা ১৯৬১-তেই শেষ, শুধু পৃষ্ঠা সংখ্যার বিচারে নয়, গুরুত্বের বিচারেও।

ওভারস্ট্রীট—উইণ্ডমিলার এবং ডোনাল্ডসনের বই পড়ে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসকে বুঝতে চাওয়ার মানসিকতায় রণেন সেনের এই বই নতুন ধাক্কা দেবে। একজন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা কমিউনিস্টের লেখা বলে শুধু নয়, তিনি যে বিষয়টিকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছেন, অর্থাৎ পার্টির ভেতরে নানা টানাপোড়েন ও পার্টি ভাগ—তা নানা কারণেই এখনও আমাদের ভাবনাচিন্তার সিংহভাগ জুড়ে থাকে।

বইটিতে একধরণের নির্মোহ উপস্থাপনা রয়েছে। আবারও বলি, ঘটনা এখানে তথ্য হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনার গভীরে তেমন আলোকপাত হয়নি। অর্থাৎ কেন এমন হ'লো, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় নি। বস্তুত রণেন সেনের বই একটি প্রশ্নকেই নানা তথ্য দিয়ে তুলে ধরেছে শক্তিশালী করেছে—তা হলো, পার্টি ভাগ সত্যিই অনিবার্য ছিল কি? মতাদর্শগত সংঘাত প্রথমাবধি পার্টিতে ছিল। কখনও 'বাম', কখনও বা 'দক্ষিণ' ঝোঁক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আবার পার্টির ভেতরে প্রতিবাদও সংগঠিত হয়েছে বিচ্যুতির তীব্রতম সমালোচনাও হয়েছে। সঠিক পথ অন্বেষণে পার্টি অক্লান্তও থেকেছে। তারজন্য কিন্তু পার্টি আগে কখনও ভাঙে নি। বরং এটাই তো ঐতিহাসিক সত্য যে, সব সংকটের অন্তরালে একটি ঐক্যের স্বর সবসময়েই বেজেছিল। রণেন সেন বারংবার বলেছেন অজয় ঘোষের কথা—অজয় আরো কিছুদিন বাঁচলে, রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলে এত সহজে পার্টি ভাঙা যেত না। বলেছেন, অজয় ঘোষের সহযোগী নাম্বুদ্রিপাদের কথা। জানিয়েছেন, নেতৃত্বের একটি অংশ কখনও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির শিকার না হয়েও বাম ও দক্ষিণ দুই গোষ্ঠীকেই পার্টি কাঠামোয় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, যেমন ভূপেশ গুপ্ত।

আজকের সংকটের দিনে এসব জানা আমাদের জরুরী ছিল। বিশেষ করে একজন প্রবীণ কমিউনিস্টের কাছ থেকে জানা। কোনো কুৎসা নয়, কোনো তোষণ নয়, কোনোরকম ভাবে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাখ্যা নয়—এই অভিজ্ঞতার বিনিময়, আমাদের, গবেষক–রাজনৈতিক কর্মী—বামপন্থী ইতিহাসের যেকোন তন্নিষ্ঠ পাঠককে, শিক্ষিত করবে, সচেতন করবে বলেই আশা রাখা যায়। আরও আশা করা যায়, যে প্রশ্নটি এই বইয়ের সর্বাঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভাবে পরিব্যাপ্ত, প্রকৃত ইতিবাচক অর্থে তার উত্তর খোঁজার কাজটিও তাতে উপকৃত হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮—১৯৬৪)—রণেন সেন, বিংশ শতাব্দী, ৫০ টাকা।

ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল অনেক গভীরে। আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক উন্মাদনা-প্রসংগ বহিরাবরণ হিশেবে দেখা গেলেও এর অন্তর্নিহিত সমস্যা অন্যত্র। সমাজ-অর্থনৈতিক সমস্যা এবং কোনো কোনো গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার রূপকে প্রকট করে তুলতে পারে। অর্থাৎ ধর্মীয় দ্বন্দ্বের মূল সূত্র সাধারণত অন্যত্র থাকে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার পিছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ স্পষ্ট ছিল। ফলে খুব সংগত কারণেই রাজনীতিও এসে গেছে। সে সময়কার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল তাতে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম কোথাও ছিল না। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পিছনের ব্যাপারগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ভয়ংকর চেহারা যে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই বা কেন, একই ধর্মের বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ের মধ্যেও দ্বন্দ্ব কম দেখা দেয় নি। সেটাও সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কি! কিন্তু আজ সাম্প্রদায়িকতা প্রসংগের আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। প্রথমেই যে ব্যাপ্তির কথা বলেছি তা এখন খানিকটা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িকতা বলতে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় দ্বন্দ্বের কথাই মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিশেবে বিবেচিত। দেখা দরকার, এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত কবে থেকে এবং কেন? এর ঐতিহাসিক পটভূমিই বা কী। আধুনিক যুগে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়েছে বৃটিশ শাসকদের প্রচেষ্টায়। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের নানা ফন্দি-ফিকির তারা তৈরি করেছে। এমন কি জাতীয়তা-বাদী নেতাদের মধ্যে অনেকেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। এর পিছনে ধর্ম নয়, অন্য স্বার্থ তাদের নাচিয়েছে। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নটি সমস্যা সমাধান অপেক্ষা জল ঘোলা করেছে অনেক বেশি। এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রশ্রয়ে। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন, "মুসলমান ও হিন্দু হিশেবে দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ লক্ষ্য আলাদা, এবং তারা স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেছে। জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে একমাত্র

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল এই যে, জাতীয়তাবাদীরা চাইতো এই দুই সম্প্রদায়, সম্প্রদায় হিশেবেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হোক আর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা চাইতো একে অপরকে এড়িয়ে চলতে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। উভয় পক্ষই সাম্প্রদায়িকতার যুক্তি মেনে নিয়েছিল। জাতীয়তাবাদীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসাধনে সচেষ্ট ছিল, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাদের যুক্তিকে আরো সম্প্রসারিত করেছে।" এর সঙ্গে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িকতার স্বপক্ষে ইন্ধন তো ছিলই। আর এই সমস্ত পাপের বোঝা আজও আমাদের বইতে হচ্ছে।

গৌতম নিয়োগীর 'ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা'তে নানা দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়েছে। নিবেদন, ভূমিকা ও সহায়ক রচনাপঞ্জী ছাড়া মোট এগারোটি বিভিন্ন সময়ে লেখা নিবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই সমস্ত আলোচনা বিশেষ দিক নির্ণয়ে সাহায্য করবে। "ইতিহাস পাঠ এবং সাম্প্রদায়িকতা" নিবন্ধে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আলোচনা সম্পর্কে সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উত্তাপে ইতিহাসের ব্যাখ্যা কিছুটা একপেশে হয়েছে। দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, সেকালের রাজনীতি মুসলিম ও ইংরেজ শাসকদের তুলনায় ছিল অহিংস মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।" কিন্তু প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজারাও যে অহিংসায় বিশ্বাসী এমন প্রমাণ কিন্তু আমাদের হাতে নেই। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করতেন এবং নিজ ধর্মাবলম্বী শত্রুদের ও বিনাশ করতেন ধর্মের নাম করেই।" (পৃ. ৫)। তাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত ধর্মকে হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করেছেন। এমনকি প্রাচীন-মধ্যযুগে "হিন্দু-মুসলমান উভয় রাজের ক্ষেত্রে মন্দির ধ্বংসের প্রধানতম কারণ অর্থনৈতিক—মণিমুক্তা সংগ্রহ এবং ধনদৌলত লুঠ; আর অন্যতম বড়ো কারণ রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।" (পৃ. ৬)। এ ব্যাপারে একটি স্তরের মানুষের মধ্যে স্বার্থের ঘুণ বাসা বেঁধেছিল। উপরতলার সাম্প্রদায়িকদের সাহায্য করার জন্য একদল উচ্ছিষ্ট ভোগী ঐতিহাসিক ক্রমাগত তথ্যবর্জন ও তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস রচনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। "সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ বা দ্বন্দ্ব তেমন সাড়া জাগায় না, যতক্ষণ না উপরি-কাঠামো সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। যৌথ সংস্কৃতির মিলন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তথাকথিত নিচু শ্রেণীর মানুষের

মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু ইতিহাসের পাঠের ক্ষেত্রে সাধারণত সাম্প্রাদায়িকতার প্রতিপত্তিই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে যা ভবিষ্যৎ সমাজকে অবক্ষয়ের দিকেই ঠেলে দেয়। "সব জাতি, সব ধর্ম, সব ভাষা, সব সংস্কৃতি মিলে কালপরম্পরার মধ্য দিয়ে" ভারতবর্ষের যে ইতিহাস গড়ে ওঠার কথা তা "বিকৃত ইতিহাসপাঠের শিকার হয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যেন আমাদের মনে ঢুকে জাতীয় জীবনকে কলুষিত না করে, একথা মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করার দিন এসেছে।" (পৃ. ১১)।

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামি অনেক সময়ে ঐতিহাসিককে আচ্ছন্ন করে। তাই ইতিহাস পাঠের আগে ঐতিহাসিকের পরিচয় জরুরি। যদি কোনো ঐতিহাসিক ধর্মীয় গোঁড়ামির শিকার হন, তবে "ইতিহাস রচনা ও পঠন-পাঠন বদলে যাবে—তথ্য হবে বিকৃত, আকর-উপাদান হবে ইচ্ছেমত নির্বাচিত, মনোমত না হলেই তথ্য চেপে যেতে হবে এবং এই কলুষের ফলেই ব্যাখ্যা হবে সাম্প্রদায়িক, যা ইতিহাসানুরাগী মানুষদের বিভেদপ্রবণ করে তুলবে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ইতিহাস চর্চার সবচেয়ে বড়ো দুষমন।" (পৃ. ১৫)। গৌতমবাবু "ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ইতিহাসচর্চা" নিবন্ধে এই বিষয়টি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকদের কোনো স্থান নেই, সেখানে ইরফান হাবিব, বিপানচন্দ্র, রোমিলা থাপার প্রভৃতি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের রচনা ইতিহাস-পাঠের ক্ষেত্রে আলাদা মাত্রা সংযোজন করেছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য ঐতিহাসিকদের বিশেষ দায়িত্ব পালন করা উচিত। তবে প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার "সাম্প্রদায়িক তথা ধর্মীয় গোঁড়ামি আমাদের সমাজে চিরকালই ছিলো, তবে তা যতোখানি শাসক শ্রেণীর মধ্যে ততোখানি সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়।" (পৃ. ২৫)।

"প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস" নিবন্ধে গৌতমবাবু ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চার বিস্তৃত রূপ-রেখা পর্যালোচনা করেছেন। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ব্যাপ্তি উপরি-কাঠামোর স্বার্থ-সিদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। এমনকি ইতিহাস রচনার কাঠামোয় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়। এর বিরুদ্ধে আধুনিক অসাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদদের নিরন্তর কলুষমুক্ত ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা কতখানি উল্লেখযোগ্য তা এই নিবন্ধে স্পষ্টতই প্রতীয়মান। বিশেষ করে স্বাধীনতাত্তোর "ভারতবর্ষে বহু লেখক, গবেষক, ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা ভারত-ইতিহাসকে খণ্ডিত এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে না দেখে সমগ্র বিষয়ের মধ্যে তথ্য

ইতিহাসের পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন।" (পৃ ৫১)। গৌতমবাবু তামসমুক্ত ইতিহাস চর্চার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গৌতমবাবুর আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা "রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ : একটি ইতিহাস-বিরোধী বিতর্ক"। একটি মহাকাব্যের চরিত্রকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক যে জিগির তোলা হয়েছে তার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সঙ্গত কারণেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। এই রামজন্মভূমি নিয়ে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতির লড়াই প্রবল। শুধু রাজনীতি নয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। আলোচ্য নিবন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য প্রমাণ জড়ো করে রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াসকে সার্থক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। এই বিষয় নিয়ে বাংলায় এমন তথ্যবহুল লেখা আর চোখে পড়ে নি।

এই বইয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা "মুক্তমতি বুদ্ধিজীবী ইরফান হাবিব"। এটি লেখকের সঙ্গে হাবিবের একটি সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায়, হাবিবের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট মনোভঙ্গি। হাবিব ঐতিহাসিক তথা বুদ্ধিজীবীদের অসাম্প্রদায়িক তথ্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। আরেকটি সাক্ষাৎকার এই বইতে স্থান পেয়েছে. সেটি হলো "সেকুলার রাষ্ট্রের ধর্মই হলো নাগরিক ধর্ম"। গৌরকিশোর ঘোষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন লেখক। গৌরকিশোর অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল এবং ধর্ম যে রাষ্ট্রের নিয়ামক শক্তি হতে পারে না, তা তো বাংলাদেশ বেরিয়ে যাওয়াতেই প্রমাণিত। আমাদের পক্ষে তো হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে যাওয়াই সহজ ছিল। তা তো আমরা নিই নি। ···এই দেশ হলো সেকুলার, গণ-তান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক। এবং এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশের প্রধান ধর্মই হোক সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার ধর্ম।" (পৃ. ১০২)। অসাম্প্রদায়িক সমাজ রাষ্ট্র গড়ে তোলার দিকেই ঝোঁকটা যে প্রবল তা গৌর-কিশোরের সাক্ষাৎকারে স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। সংবিধান অনুযায়ী আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ বলতেই হবে। কিন্তু সমস্ত স্তরের মানুষের মন থেকে কি সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উৎপাটিত হয়েছে? যদি হতো, তা হলে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বন্ধ হতো। ধর্ম নিয়ে রাজনীতির খেলা চলত না।

এই বইয়ের "আর্যদের আদি বাসস্থান," "হোসেন শাহ : পুনর্বিচার" "মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক," "ভারত-ইতিহাসে টিপু সুলতান"

নিবন্ধগুলি লেখকের মুক্ত মনের পরিচায়ক। এই বিষয়গুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক জাগরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। উল্লেখযোগ্য আর দুটি অধ্যায় হল, "কিছু স্মরণীয় বই : বই নিয়ে তর্ক" এবং "সহায়ক রচনাপঞ্জী"। সহায়ক রচনাপঞ্জীটি এমনভাবে লিখিত যে, সেটিকে আমি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।

আলোচ্য বইটিতে ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে এই বইটি যে অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা—গৌতম নিয়োগী। পুস্তক বিপনী। পঞ্চাশ টাকা।

ঋত্বিক ঘটকের গল্পে সমাজবাস্তবতা

চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক আমাদের কাছে সুপরিচিত হলেও গল্পকার হিসাবে তিনি ততটা পরিচিত নন। হয়তো সেটি তাঁর সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নের অভাবেই।

'ঋত্বিক ঘটকের গল্প' এই সংকলন গ্রন্থটি পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে কী বলিষ্ঠ তাঁর সমাজ সচেতনতা। একজন সচেতন শিল্পী কখনও সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর সৃষ্টিতে তাই অবশ্যম্ভাবী ভাবে দেখা দেয় সামাজিক সংঘাত, সমস্যা, ঐতিহ্য ও আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র আমাদের দেশীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দলিল। তাঁর গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর গল্প প্রসঙ্গে এই সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় গোপাল হালদার বলেছেন—"...ঋত্বিকের শিল্প প্রয়াস বহুমুখী হলেও তার প্রধান ক্ষেত্র বোধহয় মানুষের প্রতি মমতার প্রকৃততম মানুষকে আপনার কাছে পাবার আগ্রহেই—চলচ্চিত্র। অনেকদিন পরে আজ ঋত্বিকের গল্প হাতে পেয়ে তাই বহু কথা মনে পড়ল—অশান্ত

ঋত্বিকের সেই প্রথম আয়োজন অশান্ত সেই যুগের খণ্ডে খণ্ডে চিত্ররচনার উৎসাহ।"

ঋত্বিক ঘটকের শিল্প বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের এক অশান্ত সময়ের সাক্ষী। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ যখন দুঃস্বপ্নের মত আছড়ে পড়েছে বাঙালী তথা ভারতীয় জনজীবনের উপরে, হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, সেই সংকটময় মুহূর্ত ঋত্বিকের শিল্প রচনার সময়। তাই "ঋত্বিক ঘটকের গল্প" সংকলনটিতে সংগৃহীত একাধিক গল্প সমাজ-বাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যে চারটি গল্প বিশেষভাবে নজর কেড়েছে সেগুলি হল 'এজাহার', 'চোখ', 'কমরেড' এবং 'সড়ক'।

আমাদের সমাজে নারী তার মর্যাদা হারিয়েছে বহু কাল। সে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত, শোষিত; এমনকি নারীর কাছেও নারী মূল্যহীন। নারীর বিষাক্ত, যন্ত্রণাময়—বিবাহিত জীবনের নজির আজও ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজের বুকে। 'এজাহার' গল্পটি তারই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। জয়ার বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবনের যে প্রতিচ্ছবি পাই তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী—

"জয়া। একগাদি বাসন হাতে ছেঁড়া কাপড় পরে জয়া ঘামছে. আর কোমরে হাত দিয়ে মামুলি সেই কোঁদনের ভঙ্গীতে এক প্রৌঢ়া অপরূপ ভাষা ব্যবহার করতে যাচ্ছেন। ফুলের মতো মেয়েটার পা দিয়ে খড়ি উঠতে আরম্ভ করেছে, চুল রুক্ষ, চোখ গর্তে, গায়ের রং কেমন রোগগ্রস্ত হলদে। রক্ত কমতে শুরু করেছে।" (পৃঃ ২০) জয়ার প্রেমিকের হাতে তার স্বেচ্ছামৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে সে যেন মুক্তি পেতে চেয়েছিল এই কঠোর জীবন থেকে। নারীর অবহেলিত জীবনের প্রতি লেখকের গভীর সহানুভূতি এখানে প্রকাশিত।

একজন সচেতন সমাজবাদী শিল্পী হিসাবে ঋত্বিক ঘটকের গল্পে অনিবার্য-ভাবে আসে কারখানা, শ্রমিকের উপর মালিকপক্ষের শোষণ, শ্রমিক-আন্দোলনের প্রসঙ্গ। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শ্রমিককে বঞ্চিত করেই তো কর্তৃপক্ষের মুনাফা। সেই মুনাফার জন্য জঘন্যতম কাজ করতেও কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত হয় না। 'চোখ' গল্পটি কারখানার উঁচুমহলের স্বার্থপরতা, জিঘাংসা এবং শ্রমিকদের জোটবদ্ধতার অপূর্ব চিত্রায়ণ। শ্রমিকের মুখোমুখি প্রকৃতপক্ষে মালিক দাঁড়াতে ভয় পায়। তাই কানপুরে রতনলাল কটন মিলসে স্পিনিং-এর কর্তা রায়সাহেব ইউনিয়নের নেত্রী রুক্মিণীয়াকে সমীহ করে। তার চোখ রায় সাহেবকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। ওয়্যারহাউসের গুদামে আগুন ধরাতে

যাবার সময় অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী রুক্মিণীয়াকেও আহুতি দেওয়া হয়। তার উপরেই গুদামের অগ্নিকাণ্ডের দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রুক্মিণীয়ার মৃত্যু হলেও তার চোখের হাত থেকে রায়সাহেব নিষ্কৃতি পান নি। রুক্মিণীয়াব ছেলে বহন করছে তার মার চোখের সেই আশ্চর্য দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে, সঞ্চারিত হয় সমস্ত শ্রমিকদের চোখে। রায়সাহেব সেই চোখের মিছিলে অভিভূত—"তাঁর পৃথিবীতে ছেয়ে গেল ওই চাউনিতে। কত চোখ! ...কত রুক্মিণীয়ার চোখ।" (পৃ. ১৩১)

শ্রমিক আন্দোলনের উপরে লেখা উল্লেখযোগ্য গল্প 'কমরেড'। শ্রমিক আন্দোলনের সফলতার পিছনে থাকে শ্রমিকদের কত আত্মত্যাগ, ধৈর্য্য ও কার্যসহিষ্ণুতার ইতিহাস। তার থেকে অনেক সময় পদস্খলনও ঘটে। একসময়ের জঙ্গী শ্রমিক নেতা তখন হাত মেলায় মালিকপক্ষের সঙ্গে। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতার কোন স্থান নেই। তাই শ্রমিকনেতা ঝাব্বুর মতই তাদের স্তব্ধ করিয়ে দেওয়া হয় চিরতরে। এভাবে বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে ঝাব্বুর অতিপ্রিয় বন্ধুকেই এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়।

ঋত্বিক ঘটকের শিল্পরচনার একটি বড় বিষয় হল দেশভাগের বেদনা। সেই বেদনা ছড়িয়ে আছে তাঁর চলচ্চিত্রে, প্রবন্ধে, গল্পে। 'সড়ক' গল্পটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। দেশভাগ বাঙালী জীবনেরউপর এ এক চরম আঘাত। নিজের ভিটেমাটির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক। দেশভাগ অজস্র মানুষকে করেছে ঘরছাড়া, নিরাশ্রয়। ইসরাইল ও তার ঘরে আশ্রিত বৃদ্ধাটি ছিন্নমূল দুটি মানুষ। বাস্তুহারার বেদনা তাদের যেন মিলিয়ে দেয়। যে ইসরাইল বলেছিল যে তার এতদিনের ঘরে তার মৃত ছেলের স্মৃতি-বিজড়িত ঘরে যে আশ্রয় নেবে, তাকে সে খুন করবে,—সেই ইসরাইলই তার ঘরে আশ্রয়প্রার্থী বৃদ্ধাকে যত্ন করে, ঘরের সবকিছু গুছিয়ে দেয়, তাকে খাওয়ায়। আর বৃদ্ধার কণ্ঠে শুধু পদ্মাপারের গল্প। আসলে এই ভিটেছাড়া হবার বেদনায় তো বৃদ্ধা ও ইসরাইল দুজনেই একাত্ম। তাই ক্রোধের পরিবর্তে ইসরাইলের মনে দেখা দেয় বৃদ্ধার প্রতি অনুকম্পা। আর এরমধ্যেই মানবিকতার বিকাশ, মানুষের বাঁচার পথ।

সমাজের শোষিত, বঞ্চিতদের প্রতি ভালবাসা এই গল্পগুলিতে উপস্থিত। সমাজের বৃহত্তর জটিলতার প্রেক্ষাপটে ঋত্বিক ঘটক স্থাপন করেছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের। মানবিক রসে তাঁর গল্পের এই চরিত্রগুলি উজ্জ্বল। সুনিপুণ ভাষাবিন্যাসে তিনি জীবনের বাস্তবতাকে ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছেন।

ইন্দ্রানী ঘোষাল

ঋত্বিক ঘটকের গল্প। ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। ৩০ টাকা

আগুনের গল্প

লেখক হিসেবে কার্তিক লাহিড়ীর নাম পরিচিত হলেও, তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের কোনো যথার্থ মূল্যায়ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দীর্ঘদিন ধরে লেখনী সচল আছে, এমন একজন লেখকের পক্ষে এ জিনিষ দুর্ভাগ্যের। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি উপন্যাস 'সৌরভের ঘরে আগুন' এবং 'শনি' পড়ার পর এই মূল্যায়ণ কর্মটিকে আরো জরুরি মনে হয়, কেননা হালফিলের সাহিত্য-ধারার থেকে তাঁর বিষয়বস্তু ও চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণই আলাদা। সমাজ বাস্তবতার যে উজ্জ্বল ধারাটি বাংলা গদ্যচর্চাকে এতদিন সমৃদ্ধ রেখেছে, কার্তিক লাহিড়ী সেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিয়েই তাকে নানাভাবে বিস্তৃত করতে চেয়েছেন।

প্রকাশিত দুটি উপন্যাসেই ধরতে চাওয়া হয়েছে একজন মানুষের অসহায়-তাকে, বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে এই কলুষিত সময়ের আঘাতে প্রতিমুহূর্তে যে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে মিল এইটুকুই—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কহিনীর পরিণতি আমাদের নিয়ে যায় পৃথক কোনো উপলব্ধিতে। 'শনি' উপন্যাসের নায়ক নিখিল। ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রী রেবাকে নিয়ে তার নিটোল সংসার। অন্ততঃ বাহ্যিকভাবে দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। নিখিলের ভালো চাকরি, উন্নতি এবং আরো উন্নতির যে পূর্বনির্দিষ্ট পথ, সেই পথ দিয়েই ভালোভাবে এগিয়ে যেত তারা। কিন্তু প্রথম থেকেই এই স্বকল্পিত বেলুনটি চুপসে যেতে থাকে, এবং নিখিল দিশেহারা হয়ে যায়। ছড়ানো এই সুখের মধ্যেও একটা চোরাটান যেন তাকে পেছনে টানতে থাকে চারপাশের পরিবেশে। মানুষজন সবই যেন ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে। নিখিল কিছু বুঝতে পারে না, কাউকে বোঝাতেও পারে না। শুধু নিজের মধ্যে ভেঙে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও অবশিষ্ট থাকে না। নিজের ছায়াকেও তখন বিশ্বাস করা যায় না। "আয়নার সামনে নিখিল, তার ছায়া আয়নার মধ্যে। দুজন প্রতিপক্ষের মতো ছায়া ও কায়া মুখোমুখি। এখন আলো উজ্জ্বল, তবু সমস্ত আয়না জুড়ে ছায়া-ছায়া অন্ধকার, সেই তরল অন্ধকার পটে নিখিলের শরীর, সে মুখ বাড়ালো দেখার জন্য"।

মুখ বাড়ালেও সে কি নিজের ছায়াকে দেখতে পাবে? হয়তো তা আর সম্ভবও নয়। কেন এমন হয়? উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিখিল বিদীর্ণ হয়ে যায়। আর তার মধ্যেই তার সংগ্রহে আসে একটি বন্দুক। মাঝে মধ্যে

শিকারে যাওয়ার শখ ছিল তার। সেই বন্দুকই এখন হয়ে ওঠে জীবনের ভরসা। অন্ততঃ নিখিল মনে মনে ভাবে, এই বন্দুক দিয়ে জীবনের একটি জায়গায় জিততে হবে, অনেক পাখি শিকার করে নিজের অবদমিত সত্তাকে একটুখানি জাগিয়ে তুলতে হবে। ব্যর্থতা আসে সেখানেও এবং শেষপর্যন্ত এই ব্যর্থতাই যেন পাখি হয়ে তাকে পৌঁছে দেয় আত্মহননের দোড়গোড়ায়। এছাড়া নিখিলের জন্য আর কী-ই বা অবশিষ্ট ছিল?

ছোট পরিধির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজে লেখক বেশ সফল। তুলির কয়েকটি আঁচড়ে বিষয়টি ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাই ঘটনার উত্থান পতন অথবা চরিত্রদের টানা-পোড়েন তত প্রাধান্য পায়নি। বরং সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখা হয়েছে নিখিলের দিক থেকে, একটি বিন্দু থেকে ক্রম-উন্মোচনের মতো খুলে গেছে তার অস্তিত্বের প্রতিটি অংশ। কার্তিক লাহিড়ীর কথনভঙ্গিটি জটিল, কখনো তা গল্পের ঋজুতা অতিক্রম করে চলে যায় অন্য কোনো দিকে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে গল্পের এই নম্রতা বিষয়বস্তুকে ধারণ করতে পারে না। যে জটিল ও হিংস্র সময়কে তিনি তুলে ধরতে চাইছেন, গল্পভঙ্গির কারণে তার সেই উদ্দেশ্য কোথাও কখনো ব্যহত হয়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু একই কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয় তার অন্য উপন্যাস 'সৌরভের ঘরে আগুন'-এর ক্ষেত্রে। এখানে গল্পভঙ্গি বিষয়ের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। মনে হয় এর কারণটি নিহিত আছে দ্বিতীয় উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর মধ্যে। অস্তিত্বের ক্রমউন্মোচন এখানে প্রধান নয়, বরং সৌরভকে কেন্দ্র করে তার চারপাশকে তিনি যেন দেখতে চাইছেন, যেখানে সৌরভ স্থির, শুধু তার চার-দিকের দৃশ্যপট বদলে বদলে যায়। ফলে ভাষার সাহায্যে একটি চলমান জীবনের ছবি তৈরি হয় এবং এখানেই কার্তিকবাবুর স্বচ্ছ ভাষা নতুন ধরণের আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় উপন্যাসে ব্যক্তির অসহায়তাকে ধরা হয়েছে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু এটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস সম্ভবত বলা যাবে না, কারণ সৌরভের আদর্শগত শূন্যতা থেকে কোনো রাজনৈতিক বোধে উত্তরণ ঘটে না, যেটিকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্যতম শর্ত বলতে পারি। বরং সৌরভ মধ্যবিত্ত একজন মানুষ, যে বিভিন্ন চক্রান্তে পড়ে নিজেক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। কোনো সিদ্ধান্তে না এসেই বলা যায়, কোথাও যেন লেখক সৌরভের প্রতি একধরণের সহমর্মিতা বোধ করেন। এটাকে কি নিজের

শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ বলা যাবে ? কিন্তু প্রশ্ন আসে অন্যদিক থেকে। সৌরভ যে উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশ নেয়, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সে যদি সফলও হত, তাহলে কি দেখা যেত ? হয়তো আর একজন জননেতার সংখ্যা বাড়ত। সৌরভ তো একটা লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যই নির্বাচনে নামে, তাহলে রাজনীতির হিংস্র চেহারা দেখে সে ভীত কেন ? এই চেহারা কি অজ্ঞাত ছিল তার কাছে ? ক্ষীণভাবে হলেও মনে হয়, কোথাও যেন এই উপন্যাসটি সামগ্রিক রাজনীতি সম্বন্ধেই পাঠককে বিমুখ করে তোলে।

অন্যদিকে এর মাধ্যমেই লেখক দক্ষভাবে বর্তমান রাজনীতির কলুষকে তুলে ধরেছেন। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, আদর্শ, মূল্যবোধ সবকিছু ভেঙে চুরে যাচ্ছে, তৈরি হয়ে যাচ্ছে ক্ষমতার চারপাশে বাদুড়ের মতো ঝুলতে থাকা কিছু মানুষ, ভোগসর্বস্বতা গ্রাস করছে মানুষের শুভবোধকে। সৌরভ, একজন মাঝারি মাপের কনট্রাক্টর, সরকারী বকেয়া টাকা পাওয়ার লোভে নির্বাচনে দাঁড়ায়। কারণ নিয়ম আছে, যে কোনো প্রার্থীর টাকা বকেয়া থাকলে, সরকার নির্বাচনের আগে তা মিটিয়ে দিতে বাধ্য। এরপরই সৌরভ চলে যায় রাজনৈতিক চক্রান্তের মুঠোয়। শিকার হয় চক্রান্তের, পিছিয়ে আসার রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাসরোধী এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে, কোনো সমাধান নেই, বস্তুতঃ সৌরভ এখন আগুনের বাসিন্দা। "মানুষ কি গেণ্ডুয়া খেলার ভাঁটা হয়ে গেল তবে। তুমি আমি সকলে। আর যারা সেই খেলা খেলছে তারা বহাল তবিয়তে আমাদের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে বেশ। আমি কি তাদের শনাক্ত করতে পেরেছি কখনো ?"

শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নটি অমোঘভাবে চলে আসে আমাদের মধ্যেও। এখানেই লেখকের সার্থকতা। আশা করব, বইদুটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে এবং আমরা লেখক হিসেবে কার্তিক লাহিড়ীর অবস্থানটি ক্রমে চিনে নিতে পারব।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

শনি। কার্তিক লাহিড়ী। উন্মুক প্রকাশনী। পঁচিশ টাকা

সৌরভের ঘরে আগুন। কার্তিক লাহিড়ী। বিজ্ঞাপন পর্ব। কুড়ি টাকা

একশিলা পাথরে চোখ রেখে

বাংলা কবিতাকে সরাসরি মুখের ভাষায় বা আটপৌরে বক্তার চালে ছোটানোর প্রয়াস শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশক থেকে। এর ফল হয়েছিল মিশ্র। একদিকে কবিতার গতি হয়েছিল একরোখা, তেরিয়া ও সরাসরি সংযোগমুখী; অন্যদিকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছিল তার রাজবহুন্নত মেজাজ, ক্ল্যাসিকাল আর্তি ও গূঢ় সংবাদ।

এই দুই বিপরীতমুখী প্রবাহের সন্ধিতে দাঁড়িয়ে দু দশকেরও ওপর কবিতা লিখে যাচ্ছেন শুভ বসু। লোকায়তের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের মেলবন্ধনে, ব্যক্তিচেতনা ও সমাজ-চৈতন্যের সমাহারে যে বহুমাত্রিকতায় তিনি বাঁধতে চেষ্টা করছেন তাঁর অনুভূতিমালা, সেই সংকল্পের মৌলিপাহাড়ের নাম—বিষ্ণু দে। সফলতা-ব্যর্থতা পরের কথা, সাহিত্যবিচারে তা আপেক্ষিকও বটে, তবু ঐ একশিলা পাথরের দিকে চোখ রেখেই 'নশ্বরতাকে ছুঁয়ো দি'-র কবির পদযাত্রা। এবং বলা বাহুল্য, এই দুশ্চর অভিযানের পায়ে পায়ে লেগে থাকে মিছিলে নিজেকে না মেলাতে পারার অভিমান ও কিছুটা একা হওয়ার অহংকার-ও বা।

কোনো অটল বিশ্বাস বা সহজসাধনে সাজতে চান নি বলেই শুভ-র অসন্তোষ প্রশ্নমুখর। এই অসন্তোষ পরিবেশ, দেশ-মহাদেশ, সমাজ ও মানুষের চূর্ণ-বিচূর্ণ কাচের টুকরোয় রক্তাক্ত, অবিশ্বাসের ঘন ঘন মাথানাড়ায় আলোড়িত।

ফলে, তাঁর অনেক কবিতাই শুরু হয় প্রশ্ন থেকে যা আপ্তবাক্য মেনে নেওয়া বা যে কোনো সংকটের সরলীকরণের প্রতিবাদী। 'কোথায় এই তেপান্তরের সীমা?' (প্রেতপুরুষের ঈশারায়), আমাদের এই প্রহরে / কোথায় যুগল নাগিনী?' (মৃত্যু আর প্রলয়ের স্তব), 'তাহলে কি সমস্তই আকস্মিকতা?' (সবচেতনের দুর্গে), 'এই বহুদূরে চলে আসা হলো কোনো অনিবার্যতায়?' (সে ছবি আজ দূরের), 'পিকাসোর পারাবত, তোমার ডানায় সেই তাকত রয়েছে (ক্যালপুরুষের তলোয়ার), 'সেখানে পৌঁছোনো যায়?' (স্থির তারাটির সঙ্গী), 'তুমি কি স্বপ্নের থেকে এলে, / রক্তকরবীর দীপ্তি লাগা?' (মোহন বিভ্রম), 'রাজা, তোমার আলোয় কেন এখনো সারা পথে / শ্যামসমান তৃষ্ণা মেনে ধর?' (শ্যামসমান শিখায়) সরাসরি এ-ধরণের প্রশ্নেই শুরু হয়ে যায় শুভ-র অনেক কবিতা যা দীক্ষিত পাঠকের

সামনে তুলে ধরে পরবর্তী পর্বগুলির ভাঁজে ভাঁজে উত্তর খুঁজে নেওয়ার দায়! পাঠক ক্রমাগত ঢুকে যেতে বাধ্য হন বহুকষ্টের একাকার ডাক ছাড়িয়ে নিজের ভিতরে এবং বলা বাহুল্য, সেই গণবিরল পথে অপরিচয়ের অন্ধকার নিবিড় হতেই থাকে। এমন কি এই আশংকাও থেকে যায় এ হেন প্রশ্নোত্তরে সমর্পিত কবিতামালা একধরণের অভ্যাসের খাঁচা তৈরি করে ফেলছে না তো?

শুভ বসু শিক্ষিত কবি। 'শিক্ষিত' বিশেষণটি বসাতে পেরে আমি আনন্দিত, কারণ এই শতকের অন্তিমে মুষল পর্বের হোতা মূঢ়, মূল-অচেতন যদুবংশের ধাবমান পায়ের শব্দ প্রতিদিন প্রখর ভাবে বেজে চলেছে আমাদের শ্রবণে। এই অপহারকদের কাছে হয় তো কবিতাই আর এক দ্রৌপদী!

শব্দপ্রয়োগ ও ছান্দসিকতায় শুভ অভিজাত। মিশ্র ছন্দের ব্যবহারে তাঁর সাহস ও দক্ষতা কখনো কখনো হঠকার মনে হতে পারে। অথচ এ-ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে কবি পেছপা হন না। অবলীলায় ব্যবহার করেন শুদ্ধ, তৎসম থেকে দিশি-বিদিশি এমন সব শব্দ, যা বহুসময় নতুন আলো ও মাত্রা জেলে দেয় তাঁর কবিতায়। ফলে সেখানে 'প্রাকপুরাণিক গম্ভীর নিরালোকে' অনায়াসেই এসে দাঁড়ায় 'ম্যানিকিন-অবতার' বা 'মডেলবালিকা'। পোটেমকিন-এর 'বাখুলিনচুখ'-রা ঢুকে পড়ে দহনপ্রধান তৃষ্ণায় জ্বলজ্বল 'মানবিক মমতার পটে দ্রুততায়'।

একদিকে শুভ-কে টানে সময়ের নিরলোক নেতি, যেখানে কেবল 'ছায়ার গ্রাস প্রবলা ত্রাস', যেখানে 'হাতের পাহাড় জাদুকরা ডাকিনীর টান' এবং 'জমায়েত টুটে গেছে কবে, হাত থেকে ছিঁড়ে গেছে হাত।' আবার মাধ্যাকর্ষণের অন্যপ্রান্তে থাকে কংকালীতলা পেরোনো, এককথায় যাকে বলে মৃত্যুত্তীর্ণ ভালোবাসার জন্য চরম আর্তি—'রাক্ষসের কৌতুকের শিকার এখন যদি / বজ্র ও কুসুম, তবু নওল কিশোর, / তোমার ব্রত কি আজো ভালোবাসা নয়?" (কিশোর, সন্ন্যাস নয়)।

মেধাবী মননের প্রতিটি রন্ধ্রে যে সংশয় ও পুনর্বিবেচনার দাবি কথা বলে ওঠে, শুভ বসুর 'নশ্বরতাকে ছুঁয়ো দি'—তারই একটি অশ্বেতপত্র। তাঁর কষ্টকর সন্ধান নুড়িপাথর ও ঝর্ণার প্রকৃত সমাহারে ব্রতযাত্রী তৃষ্ণার্তের শান্তি পাক।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নশ্বরতাকে ছুঁয়ো দি। শুভ বসু। প্রমা, কলকাতা-৭৩। বারো টাকা

দায়বদ্ধতার সংজ্ঞান্তর

নাটক: দায়বদ্ধ
প্রযোজনা: সায়ক
রচনা: চন্দন সেন
পরিচালনা: মেঘনাদ ভট্টাচার্য
আলোচিত অভিনয়: রবীন্দ্রসদন, ২৯ মার্চ, ১৯৯২

সাম্প্রতিক অতীতে আমাদের কলকাতায় সাংস্কৃতিক মানচিত্রে আর কোনো বিশুদ্ধ মৌলিক নাটক নিয়ে এত হৈচৈ হয়েছে কি? সম্ভবত—নয়। 'চাঁদ বণিকের পালা'র কথা হয়ত মনে আসতে পারে কারো কারো। ঠিক, খুবই উত্তেজনা-আলোড়ন উদ্দীপনা ছিল 'চাঁদ বণিক'কে নিয়ে। কিন্তু তার সবটাই ছিল প্রযোজনা-নিরপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া তার রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং শম্ভু মিত্র। অতএব সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতটাই ছিল ভিন্ন।

কিন্তু 'দুই হুজুরের গপ্পো', 'সোনার মাথাওয়ালা মানুষ', 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' প্রভৃতির আংশিক সাফল্য সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে, চন্দন সেন নামটার সঙ্গে সঙ্গেই যুগান্তর সৃষ্টির অনুষঙ্গ আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে।

তবু যে তাঁর সাম্প্রতিক 'দায়বদ্ধ' নাটক নিয়ে এত আলোড়ন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া এ বছরের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের শিরোপা, থেকে 'শিরোমণি পুরস্কার' পর্যন্ত, তাতে সত্যি বলতে কি, মনের গোপনে একটু ধন্দই দানা বাঁধছিল।

ভয় ছিল, দেখতে বসে শেষ পর্যন্ত মোহমুক্তির বেদনা স্বীকার করতে হবে না তো? এমনিতেই তো সচেতন সংস্কৃতি-কর্মী হিসেবে আমরা যা কিছু জনপ্রিয়, তার সম্পর্কেই বিরাগ বোধ করার উত্তরাধিকার প্রায় জন্মসূত্রেই অর্জন করে ফেলেছি।

তবু সেদিন চন্দন সেন ও সায়কের এই অধুনাতম রচনাটির স্বাদ পেতে গিয়ে হলে ঢোকার আগে থেকে যবনিকা পতন পর্যন্ত সময় জুড়ে বারবার 'দায়বদ্ধ'-র অসামান্য মঞ্চসাফল্যের সাক্ষী হতে হতে এই সত্য অনুভব করতে পেরে মনে অহংকারই হচ্ছিল যে, এখনো কলকাতা খাঁটি জিনিসের কদর

করার ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। মনে হচ্ছিল, অনুপলব্ধ এবং ইয়োরোপে একদা জনপ্রিয় ও বর্তমানে তামাদি তত্ত্বের ইলাসট্রেশন হিসেবে কিছু সংলাপসম্পন্ন নাটকীয় বা নাট্যপ্রতিম পরিস্থিতির শৃঙ্খলার পৌনঃপুনিকতাকে নিত্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত দর্শক যেন খুঁজছিলেন আমাদের চারপাশের জীবনের দৈনন্দিনতার ভেতর লুকিয়ে থাকা নাটকের ক্রিয়াশীলতা।

তত্ত্বনেশাতুর আমরা নিত্য অর্ধমনস্কতাবশত যেসব মানুষের গায়ে গা লাগিয়ে বাজার করি, বাসে-ট্রামে চড়ি ও আরো হাজারটা কাজে লিপ্ত হই এবং জীবনের প্রায় কিছুই জানি না, তাদের জীবনের কাহিনীর ভেতরেও রয়ে গেছে এমনই নাটক, যার যথাযথ আবিষ্কার আমাদের নিয়ে যেতে পারে শুদ্ধ মানবিক এক মহান অভিজ্ঞতার চূড়ায়। বস্তুত, ঠিকমতো ধরতে পারলে কখনো কখনো মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাহিনীর ভেতরেও পাওয়া যেতে পারে যে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার অনেক ওপরকার চিরন্তন কোনো মানবিক সত্যের মূর্তরূপ—তারই চমৎকার উদাহরণ হয়ে রইল 'দায়বদ্ধ'।

সত্যি কথা বলতে কি, দায়বদ্ধ-টায়বদ্ধ শুনলেই যে, আমাদের মনে দলসর্বস্বতার এক প্রবলপ্রতাপান্বিত ও সর্বগ্রাসী সংজ্ঞারূপ ফুটে ওঠে, তার বদলে নাট্যকার যে এখানে শাদা চোখে একেবারে সাধারণ ব্যক্তিগত মানবসম্পর্কের কাহিনীর ভেতর থেকে সন্ধান করে নিতে পারেন দায়বদ্ধতার নতুন সংজ্ঞা ও স্বরূপ, তার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে দর্শকমহলে লব্ধ নাটকটির ঈর্ষণীয় সাফল্যের কারণ।

আঠেরো বছর আগে শিলচরের এক চক্রবর্তী ডাক্তারগিন্নি নিরন্তর অপমানের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে গেলে হৃদয়বান পরিচালক ও সঙ্গীতপ্রেমী গগন মিত্রের চেষ্টায় রক্ষা পান। সেই থেকে তাঁর ও তাঁর তিন বছরের শিশুকন্যার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় গগন মিত্রের জীবন। তার পরিণতিতে 'চক্রবর্তীগিন্নি' সেই শিশুকন্যা সহ গৃহত্যাগ করে গগন মিত্রের সঙ্গেই নূতন সংসার পাতেন পশ্চিমবঙ্গের এক মফঃস্বল শহরের কোনো এক কলোনি অঞ্চলে।

সেখানে সেই শিশুকন্যাটি গগন মিত্রের কন্যা হিসেবে বড় হতে থাকে। তারপর, তিন বছরের কন্যা যখন পরিপূর্ণ তরুণী ও মেধাবী ছাত্রী এবং গগন মিত্রের সঙ্গে বাৎসল্য ও বন্ধুতায় ভরা এক সুন্দর সম্পর্কে বিকশিত হতে থাকে, তখনই, আচমকা বজ্রপাতের মতো ভয়াবহ এক সংকট গ্রাস করে নেয় তাঁদের তিনজনকেই।

এই সংকটটিকেই চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন নাট্যকার। এজন্য বাস্তু

কোনো কিছুর সহায়তা নিতে হয় নি তাঁকে। মানুষের সব সংকটের মূলে থাকে মনের ভেতর নীরবে গেঁজিয়ে ওঠা যে-বিষ, তার প্রত্যয়গম্যতাকে অসামান্য মুন্সীয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার এবং এটি ব্যবহার করতে গিয়ে এমন টানটান নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনি যে দর্শক হিসেবে আমাদের বিস্মিত হতে হয়—একদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সঙ্গে তাঁর অন্বয়বোধের গভীরতায়, অন্যদিকে অসামান্য নাট্যবোধ ও সেই বোধ রূপায়ণের মুন্সীয়ানায়।

নাটক শুরু হয় স্নিগ্ধ হালকা চালে। জীবনসঙ্গিনী সীতা ও তরুণী কন্যা ঝিনুককে নিয়ে গগন মিত্রের সংসারে। নাটকের মেজাজের সুরে সুর মিলিয়ে তার কণ্ঠে তখন জগন্ময় মিত্রের 'সাতটি বছর আগে' গানটির সুর। দেখে ভাবাই যাবে না এমন একটি পরিবারের ভেতরেও রয়েছে বিধ্বংসী নাটকীয়তা, যার বিস্ফোরণ ঘটবে সামান্য পরেই। সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেটুকু প্রস্তুতি, তার সবটাই হয়েছে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়। কিন্তু সে বিস্ফোরণ যখন ঘটে, তখন তা আমাদের প্রায় মুহূর্তের মধ্যে আমূল নাড়া দিয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে স্বস্তির কথা এই যে, অতিনাটকীয়তার ছায়াটিকেও কিন্তু মঞ্চের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেন নি নাট্যকার। পরিস্থিতির অক্ষুণ্ণ স্বাভাবিকতা ও প্রতিটি নাট্য-চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রত্যয়গম্যতার দৃঢ় গণ্ডীতে বেঁধে দিয়েই সম্ভবত তিনি অতিনাটকীয়তায় সমস্ত সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, এতক্ষণ নাট্যকারের গুণমুগ্ধতায় যে মশগুল থাকা গেল, সেই সুকৃতির অনেকখানি স্বভাবতই পরিচালকের ওপরেও বর্তায়। কেন না, আমার বর্তমান আলোচ্য চন্দন সেন রচিত 'দায়বদ্ধ' নাটকটির মঞ্চরূপ। ফলে, বর্তমান আলোচনার মুগ্ধতা, ভালোলাগা বা মন্দলাগা সবকিছুই যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা আসলে নাট্যকার-এর রচনাদক্ষতা ও পরিচালকের প্রয়োগপ্রতিভার যৌগিক অবদান।

আবির্ভাবের পর, অল্প সময়ের ভেতরেই কিন্তু মেঘনাদ ভট্টাচার্য অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছেন। দৃশ্যপরিকল্পনায় নাট্যকারের কল্পনাশক্তির সঙ্গে তাঁর পরিমিতিবোধ-সম্মত প্রয়োগ নৈপুণ্যই সম্ভব করে তুলেছে নাটকটির এই সফল মঞ্চায়ন।

অবশ্য ভুললে চলবে না—দীপেন সেনের করা মঞ্চ, মুরারি রায়চৌধুরীর সংগীত ও গোপাল দাসের আলো তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

এটা নিশ্চয় সম্মিলিত প্রয়াসেরই ফল যে, প্রতিটি দৃশ্যের রূপবাণী আকাঙ্ক্ষিত অনুষঙ্গ সৃজন করে নেয়, যা দর্শকদের সঙ্গে প্রায় আমূল অন্বয় প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে। মঞ্চ-আলো-ধ্বনি ও অভিনয়ের সুসমন্বিত সংহতি কীভাবে একটি অমর নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করে তোলে তার চমৎকার উদাহরণ হয়ে থাকে সেই দৃশ্যটি, যেখানে আত্মহননপ্রয়াসী মুমূর্ষু কন্যাকে ঘরের দরজা ভেঙে বের করে আনে গগন, আর তারপর ঢাকের বাজনার তালে তালে প্রায় মহেশ্বরের তাণ্ডবপ্রতিমা রচনা করে মঞ্চ থেকে বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

অবশ্য, বলে নেওয়া ভালো, দৃশ্যটি বর্তমান প্রযোজনায় ব্যতিক্রমের উদাহরণ নয়, বরং সমগ্র নাটক জুড়েই এমন চড়া ও মৃদু সুরের বহু দৃশ্যের উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর, যা বিভিন্ন বিভাগীয় পরিচালকের সঙ্গে মূল পরিচালকের বোঝাপড়া তথা সমন্বয়েরই চমৎকার উদাহরণ।

এ সমস্ত সত্ত্বেও সাফল্য এত সার্বিক হতো না, যদি অভিনয়ের ক্ষেত্রটি এখানে দুর্বল হয়ে যেত। অথচ সমস্যা হলো 'সায়ক'-এ খুব নামী অভিনেতার সংখ্যা বেশি নয়। মেঘনাদ ভট্টাচার্য অবশ্য ব্যতিক্রম। উঠতি অভিনেতাদের ভেতর অন্যতম হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন।

কিন্তু 'দায়বদ্ধ'-র অন্যতম মহিমা এ-ই যে, প্রত্যেকের কাছ থেকেই সে তার সমস্ত দেয়টিকে নিংড়ে বার করে আনতে পেরেছে।

মেঘনাদ ভট্টাচার্য অভিনীত গগন মিত্র চরিত্রটি সম্ভবত গত কয়েক দশকের গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজিত নাটকের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় ভূমিকাভিনয়। এখানে অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর গায়ন ক্ষমতাটিও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেটির অভাবে চরিত্রটি এত সফল হতে পারত না। বস্তুত, জগন্ময় মিত্র আর সুধীরলাল চক্রবর্তীদের সুর দিয়েই যেন প্রকৃত বোধন ঘটেছিল গগন চরিত্রটির। প্রকৃত হৃদয়বান ও জাতে মাতাল এই লরি ড্রাইভারটির চাপা অভিমান, সরলতা, ভালোবাসা, ক্রোধ ও চকিত ভাবান্তরের বিভিন্ন মুড যে সাফল্যে রূপায়িত করেছেন মেঘনাদ ভট্টাচার্য, বর্তমান প্রযোজনার—মঞ্চ-সাফল্যটির মেরুদণ্ড তাই-ই। তবে সামান্য একটু খেদ জাগে এই ভেবে যে, খাদে যদি তাঁর কণ্ঠ আরো খানিকটা সবল হতো, তাহলে কোনো কোনো নাট্যমুহূর্ত সম্ভবত আরো সফল হয়ে উঠতে পারত।

গগন মিত্রের মতো চরিত্রের, অভিনেতা যেখানে মেঘনাদ ভট্টাচার্য, বিপরীতে অভিনয় করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। এই কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন বেবি সরকার। এ-ক্ষেত্রে নির্বাচনটির জন্য পরিচালকের অবশ্যই

অন্তত একটি ধন্যবাদ প্রাপ্য। লরি ড্রাইভারের সাংসারিক পরিবেশের পক্ষে খানিকটা অপ্রত্যাশিত সাংস্কৃতিকবোধ সচেতন, সম্ভ্রমযোগ্যা প্রায় অভিজাত চরিত্রটি এই নির্বাচনের গুণে সহজে আমাদের প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। চরিত্রটিকে যে আমরা মোটামুটি সহজে বুঝতে পারি তার পেছনে বেবি সরকারের চেহারাটি কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। অবশ্য শুধু এই নয়, অভিনয়েও চমৎকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। আগাগোড়া নীচু পর্দায় বাচন ও আচরণের স্বাভাবিকতা বজায় রেখেও নাটকীয় পরিস্থিতিকে কীভাবে রসসিক্ত করে তুলতে হয় তার কৌশলও চমৎকার আয়ত্তাধীন আছে তাঁর। বিকৃত সংশয়ের দ্বিধা, সেই সংশয়ের বিস্ফোরণে জ্বালা যন্ত্রণা ও ধ্বংসের সমীপবর্তী অবস্থায় ভয়—চমৎকার স্বাভাবিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

কিন্তু আমাদের চরম তারিফ আদায়ের জন্য যেন প্রকৃত মেধাবীর ধৈর্যে অপেক্ষা করেছেন শেষ দৃশ্যটি পর্যন্ত, যেখানে সংশয় ও সন্দেহজাত আত্মিক যন্ত্রণার অবসানে সীতা গগন ও তাঁর সম্পর্কের ভেতর আবিষ্কার করে নিয়েছে প্রত্যয়ের স্থিরভূমি। ওই অংশটিতে তাঁর অভিনয় মুগ্ধকর স্মরণযোগ্যতায় সমৃদ্ধ।

সেদিনকার অভিনয় দেখে অন্তত মনে হচ্ছিল ঝিনুকের মতো অত্যন্ত অস্তিত্বসংকটাপন্ন চরিত্রের রূপায়ণেও একজন অভিনেত্রী হিসেবে গভীর নিষ্ঠায় কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন মৌসুমী সাহা।

চরিত্রটিকে তিনি দর্শকদের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন তো বটেই, তার চেয়েও বড় কথা, চরিত্রটির প্রতিটি পর্যায়কে চমৎকার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাঞ্জলও করে তুলেছেন। গগনের অফুরন্ত প্রশ্রয় ও সীতার কঠোর শাসনের মাঝখানে যখন নাটকের শুরুতে প্রথম তাকে দেখি, তখন সম্ভবত সেও জানত না যে একটু পরেই তার জন্মবৃত্তান্ত বর্তমান নাটকের চরম সংকটবিন্দু রচনা করবে। আঠারো বছর ধরে যাকে সে বাবা জেনে এসেছে, তার প্রকৃত জন্মদাতা যে তিনি নন, বরং মা-এর প্রাক্তন স্বামী হলেন শিলচরের চক্রবর্তী ডাক্তার, সে খবর তার কাছে এমনিতেই বিধ্বংসী। উপরন্তু, সে যখন বোঝে যে তার আর গগনের মমতাময় সম্পর্কের ভেতর সীতা খুঁজে নিয়েছে কুৎসিত সন্দেহের বীজ, তখন তার অস্তিত্বেরই পক্ষে সেটা চরম মর্মান্তিক হয়ে ওঠে।

বলাই বাহুল্য, মঞ্চে সেই মর্মান্তিকতাকে অভিনয়ে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা খুব কম কৃতিত্বের কথা নয়। মৌসুমী সাহা যে সেদিন ঐ কৃতিত্বের

ভাগীদার হতে পেরেছিলেন, দর্শকেরা বোধ হয় কেউই সে কথা অস্বীকার করবেন না। গগন আর সীতার সঙ্গে আদুরে মেয়ে হিসেবে, অতঃপর প্রেমিক দেবুর কাছে জটিল মানসিকতার প্রেমিকা হিসেবে একাধিক মুডে সুন্দর সাবলীলতার সঙ্গেই অভিনয় করেছেন তিনি।

বিশেষত অল্পপরিচয় জানার অল্প পরে—এক চরম সংকটের মুহূর্তে, চূড়ান্ত সংকটজনক এক পরিস্থিতিতে দেবুর সঙ্গে ঈষৎ স্খলিত উচ্চারণে ও মুভমেন্টে যে-অভিনয় ক্ষমতার স্বাক্ষর তিনি রাখতে সমর্থ হন, তাতে দর্শকমাত্রেরই তাঁর সম্পর্কে প্রত্যাশা বেড়ে ওঠে। হয়তো ক্রমে ক্রমে তিনি একদিন বাংলা মঞ্চের একজন প্রধান অভিনেত্রী হয়ে উঠতে পারবেন, এই বিশ্বাস সেদিন সন্ধ্যায় বর্তমান আলোচকের মনেও বেশ গভীরভাবেই শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে।

আলাদা সমস্যা ছিল গগনের পেশাগত শাগরেদ-জীবনের ভূমিকায় অভিনেতা হারু চক্রবর্তীর। মূল কাহিনী ও নাট্যচরিত্রের সে কেউ নয়। আবার নাটকটির গড়নের দিক দিয়ে তার ভূমিকাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণও বটে। এমন ক্ষেত্রে অভিনেতাকেই তাঁর অভিনয়ের জোরে চরিত্রটির গুরুত্ব নাটকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হয়। সেই পরীক্ষায় মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন হারু চক্রবর্তী। বিশেষত শেষ দৃশ্যে তিনি যেভাবে আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেন, তাতে তাঁর অভিনয়ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকে না।

নাটকটির প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে চমৎকার অভিনয় করেছেন নিরঞ্জনের ভূমিকায় পিনাকী গোস্বামী। চড়া ও নাটকীয় পরিস্থিতির আনুকূল্যে নাটকীয় অভিনয় দেখানোর সুযোগ বিশেষ জোটেনি তাঁর। মূলত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই অভিব্যক্তির সাধারণ স্বাভাবিকতা বজায় রেখে নাটকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন তিনি।

অবশ্য খেদ থেকে যায় দেবুর ভূমিকায় শ্যামল ঘোষের জন্য। নাটকটির পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ও পরিস্থিতির পক্ষে তাঁর সুযোগ ছিল আরো খানিকটা সফল হয়ে ওঠার। দুঃখের বিষয়, চেহারায়, চলনে-বলনে বা অভি-ব্যক্তিতে যতখানি বিশিষ্টতার ছাপ এখানে কাম্য, তার প্রতি শ্যামলবাবু পুরো সুবিচার করতে পারেন নি। অথচ এ বিষয়ে তাঁর অতিরিক্ত দায়টির কথাও সম্ভবত তাঁর মনে রাখা উচিত। কলকাতার নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে একজন

অতি-প্রধান অভিনেতার সঙ্গে যে মিলে যায় তাঁর নাম, সেই কাকতালীয় ঘটনাও নিশ্চয় তাঁর ওপরে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত দায় আরোপ করে।

সব মিলিয়ে 'দায়বদ্ধ' হয়ে ওঠে কলকাতার নাট্যপ্রেমীদের জন্য আগামী দিনের আশ্বাস। আর, এই কারণে চন্দন সেন এবং মেঘনাদ ভট্টাচার্যের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। কেননা পরবর্তী প্রযোজনাগুলি বিচারের সময় আমরা অবশ্যই 'দায়বদ্ধ'-র সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতটি ভুলতে পারব না।

তবে, একথা সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত থাকা বোধ হয় অনুচিত যে, মানবিক সমস্ত সৃজন প্রয়াসের মতো 'দায়বদ্ধ'-ও ত্রুটি-দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারে নি।

সমগ্র নাটকটির ভেতর নাট্যকার রাখেন নি কাল-নির্দেশক কোনো ব্যঞ্জনা, যাতে আমরা বুঝতে পারি গগন-সীতা-ঝিনুকের নাটকীয় সংঘাতময় সম্পর্কের জীবনলীলা আমাদের এই বাংলার ঠিক কোন কালখণ্ডের ঘটনা। এই বিষয়ে ইঙ্গিতটি ব্যতীত জীবনের যে-কোনো ছবিকেই অতি সামান্য পরিমাণে হলেও অপূর্ণ মনে হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের বর্তমান নাটকটিতে এমন কালনির্দেশ হয়তো নাট্যকারের কাছে গৌণ মনে হয়েছে। তবু মানতেই হয়, এর অভাবে দর্শকদের মনে কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতার খোঁচা চলতেই থাকে। অন্তত 'দায়বদ্ধ'-র মতো প্রায় অবিশ্বাস্য সাফল্যের অধিকারী কোনো নাটকের পক্ষে।

শুভ বসু

আচার্য সুকুমার সেন

বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী এক বিশাল মহীরুহ-ব্যক্তিত্ব ৩ মার্চ মঙ্গলবার আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর ব্যাপ্ত বিস্তৃত সারস্বত আশ্রয়ে শুধু আমরা,—তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা নয়, পরবর্তী প্রজন্মও নিজেদের প্রস্তুত করার নিশ্চিত আশ্বাস পেতে থাকবে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর জন্ম। পিতা হরেন্দ্রনাথ সেন, মাতা নবনলিনী দেবী। শৈশব কেটেছে দেশে, তাঁর দেশ বর্ধমান জেলার রায়না থানার গোতান গ্রামে। তাঁর আত্মজীবনী 'দিনের পরে দিন যে গেল'-র প্রথমখণ্ডে তাঁর সেই গোতান গ্রামের শৈশবের স্বপ্ন-মধুর দিনগুলোকে এবং কৈশোরের বেড়ে ওঠাকে অপূর্ব সরস ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন তিনি।

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই ইংলিশ স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে তিনি 'মোহিনীমোহন মিশ্র মেডেল' পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। কিন্তু তারও আগে তাঁর সারস্বত-ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল নানা পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্যে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার শিক্ষার অনেকখানি পাওয়া প্রবাসীর পৃষ্ঠায়।' এ ছাড়া বর্ধমান রাজ পাবলিক লাইব্রেরি থেকে আনা প্রচুর বইও তাঁর সারস্বত-জীবনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল।

ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রথম বই তিনি পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজী সোপান'। প্রবেশিকার পর আই-এ. পড়েন বর্ধমান-রাজ কলেজে। সংস্কৃত, বাংলা ও অঙ্ক—তিনটি বিষয়ে লেটার পেয়েছিলেন। এরপর সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে তিনি বি-এ পাশ করেন। সঙ্গে পাশের বিষয় ছিল দর্শন-শাস্ত্র। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পারেটিভ ফিললজিতে এম-এ পাশ করেন ও স্বর্ণ-পদক পান। ১৯২৪ সালে পেয়েছিলেন 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি'। ১৯২৬-এ পান 'মোয়াট মেডেল।' ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে মৌলিক গবেষণা করে তিন বার 'গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার' এবং দু'বার 'স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেডেল' পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৩৭ সালে পান পি-এচ্. ডি ডিগ্রি।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসেবে

১৯৩০ সালে। অবশ্য তার আগে থেকেই তিনি অনরারি লেকচারার হিসেবে কাজ করছিলেন। '১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের 'খয়রা অধ্যাপক' হন। তার দু'বছর আগে তিনি ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ হন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নানাধরনের স্বীকৃতিও পেয়েছেন। রবীন্দ্র-পুরস্কার, বিদ্যাসাগর-পুরস্কার ছাড়াও আনন্দ-পুরস্কার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামেন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়েছেন। বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পেয়েছেন ডি-লিট উপাধি। এছাড়া ১৯৫৫ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত তিনি সাহিত্য একাডেমির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৪ সালে সাহিত্য একাডেমির ফেলো হন। নানা কন্ফারেন্সে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও পুনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও তিনি কিছু দিন পড়িয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই উজ্জ্বল ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন দিয়ে তাঁকে বিচার করলে, সে-বিচার এত বেশি আংশিক হয় যে, সুকুমার সেন নামক প্রতিষ্ঠানের প্রায় কোনো পরিচয়ই এতে ধরা পড়ে না। তাঁর রচিত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' এখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী গবেষক ও অধ্যাপকদের পক্ষে অপরিহার্য। তাঁর প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'পঞ্চজনাঃ' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়। বৈদিক সাহিত্যের ওপর গবেষণামূলক এই প্রবন্ধ পেয়ে 'প্রবাসী'র তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে এই বিষয়ে আরও কিছু প্রবন্ধ চেয়েছিলেন। এরপর নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং গ্রন্থাবলী বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে নিজস্ব পরিচয়ে উদ্ভাসিত করেছে। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর মতো দুটি বিশাল কীর্তি ছাড়াও তাঁর গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনালোকিত অথবা স্বল্পালোকিত নানা প্রদেশে। দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিতের গবেষণার পরও তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মর্ম-সত্য অন্বেষার চাবিকাঠি। তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী', 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য', 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ', 'বিচিত্র সাহিত্য', 'বিচিত্র নিবন্ধ', 'বঙ্গভূমিকা', 'বাংলা স্থান নাম' প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্য সংস্কৃতি, দেশ-কাল সম্পর্কে তাঁর ব্যাপ্ত জিজ্ঞাসার পরিচয় বহন করে। ভারতীয়

মহাকাব্যের মর্মকথা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অনায়াসে অবাধে বিচরণ করেন বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস'-এর সংক্ষিপ্ত অথচ সারময় কলেবর তারই পরিচায়ক।

আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, তাঁর সর্বাধিক প্রিয় লেখক তিনজন—প্রথম রবীন্দ্রনাথ. দ্বিতীয় কালিদাস এবং তৃতীয় ও-হেনরী। তাঁর এই রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগকে তিনি শুধু নিজের রসাস্বাদনেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। গবেষণা-মূলক গ্রন্থরচনার মাধ্যমেও তা সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। 'রবীন্দ্র-রচনার ভূনির্দেশিকা', 'পরিশ পরিজনে রবীন্দ্র বিকাশ', 'রবীন্দ্রনাথের গান' প্রভৃতি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর বহু নিবন্ধ ও গ্রন্থের মধ্যে 'হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচার' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থাবলীও বাংলা সাহিত্যের বহু লুপ্ত মণিরত্নকে উদ্ধার করেছে বলা যায়। তাঁর সম্পাদিত 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল', 'মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, 'চৈতন্য-চরিতামৃত', 'চৈতন্য ভাগবত', 'বিপ্রদাসের মনসাবিজয়' 'বিষ্ণুপালের মনসা-মঙ্গল', 'শেখ শুভোদয়া', 'বৈষ্ণবপদাবলী', 'চর্যাপদ' প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

তাঁর গবেষক অনুসন্ধিৎসু ও বিপুল মননসমৃদ্ধ সৃষ্টির বাইরেও একটি লঘু শিল্পী-মন তাঁকে দিয়ে রচনা করিয়েছে 'কালিদাস তাঁর কালে', 'যিনি সকল কাজের কাজি, 'সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ', 'ভূতের গল্প' প্রভৃতি। তাঁর প্রিয় শিল্পী কালিদাসই হয়েছেন তাঁর ডিটেকটিভ গল্পগুলির গোয়েন্দা। একেবারেই প্রথম কৈশোরে পড়া ভূত-পেত্নি, রাক্ষস-খোক্ষস, পাঁচকড়ি দে'র গল্প, শার্লক হোমস-এর গল্পই দীর্ঘকাল তাঁর অন্তরে যে-রসের প্রবাহ বইয়ে রেখেছিল, এই সমস্ত রচনায় যেন আমরা তারই পরিচয় পেলাম। ভাষাতাত্ত্বিক,সাহিত্যের ঐতি-হাসিক গবেষক সুকুমার সেন বাঙালীর সারস্বত-চর্চাকে যে-স্তরে উন্নীত করেছেন আমাদের সবটুকু কৃতজ্ঞতা, সবটুকু শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁর সেই ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না। কিন্তু এর বাইরেও এক সহজ মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বের, এক অভিমানী পণ্ডিতের আর সেই সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির নানা সংকটে ব্যথাদীর্ণ এক মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর আত্মজীবনী 'দিনের পরে দিন যে গেল'-র দুটি খণ্ডে। সুখপাঠ্য এই আত্মজীবনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর স্বপ্নময় শৈশব আর কৈশোর, পারিবারিক জীবনের নানা স্নেহ-বন্ধন। এই আত্মজীবনীতেই নিজের সম্পর্কে তাঁর নিঃসংকোচ ঘোষণা: 'আমি পাণ্ডিত্যের পন্থী, পণ্ডিত নই। পণ্ডিতের মর্যাদার চেয়ে পাণ্ডিত্য-পথিকের মর্যাদাই আমার কাছে বরণীয়।' সত্যই তাই, তাঁর যে কোনো বিষয়েরও

আলোচনাকে আমরা গ্রহণ করি তাঁরই নিজের চোখে দেখা বিষয় হিসেবে। আর এই বোধই তাঁকে অন্য আর পাঁচজনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা দেয়। আমাদের সংস্কৃতির বহুব্যাপ্ত ক্ষেত্র থেকে তুলে আনা. তাঁর ফসলগুলি আমরা হয়তো বহুকাল ধরেই আমাদের সংস্কৃতি-চর্চার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হবো। এখন যেমন, ভবিষ্যতেও তেমনি বহু চর্বিতচর্বণে তাঁরই প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো আরও পল্লবিত হবে। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা পুরুষ হিসেবে তাঁর স্থান থাকবে অনন্ত। তাঁর শূন্যস্থান তাই সহজে পূর্ণ হবার নয়। লোকান্তরিত এই মনীষীর স্মৃতির প্রতি আমরা জানাই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সত্য গিরি

মহত্তম শিল্পী সত্যজিৎ রায় স্মরণে

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের পর বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বাঙালী যাঁকে নিয়ে গর্ব করতে শুরু করেছিল, বিশ্ববন্দিত বাঙালী সংস্কৃতির সেই শ্রেষ্ঠতম প্রতিভু সত্যজিৎ রায় গত তেইশে এপ্রিল কালসন্ধ্যায় চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

একথা সত্যি, তিনি ছিলেন প্রতিভাদীপ্ত বিখ্যাত রায়-পরিবারের সন্তান। কিন্তু শৈশবে পিতৃহীন সত্যজিৎকে নিজের ভাগ্য নিজেকেই প্রায় গড়ে নিতে হয়েছে। তাঁর বহুমুখী সুপ্ত প্রতিভাও কোনো জাদুমন্ত্রে হঠাৎ বিকশিত হয়নি। প্রতিভার ইস্পাতে তাঁকেও প্রতিদিন শান দিতে হয়েছে শ্রমিকের মতো বিপুল শ্রম আর নিষ্ঠা বিনিয়োগ করে। এইভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন রূপদক্ষ পূর্ণাঙ্গ এক শিল্পী। অবশেষে তাঁর শিল্পী-সত্তার বিস্ময়কর বিস্ফোরণ ঘটে এযুগের সব শিল্পধারার সমন্বিত রূপ চলচ্চিত্রর মাধ্যমে।

১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট। বহু বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পেল বসুশ্রী, বীণা, শ্রী এবং ছায়া সিনেমা-হলে। দু-একটি সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলা ছায়াছবির গতানুগতিক ধারায় যুক্ত হলো বিস্ময়কর শিল্প-সুষমামণ্ডিত এক নতুন চলচ্চিত্রের ধারা। প্রসারিত হলো চলচ্চিত্রের নতুন দিগন্ত। বাংলা-ছায়াছবির মরা গাঙে সত্যজিৎ আবির্ভূত হলেন সঞ্জিবনী মন্ত্র নিয়ে ভগীরথ

রূপে। তারপর ১৯৯১ সালে নির্মিত 'আগন্তুক' পর্যন্ত একটানা তাঁর অগ্রগতি। সত্যজিৎ-এর অতুলনীয় প্রতিভার স্পর্শে তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চলচ্চিত্রেই উদ্ঘাটিত হয়েছে মানবমহিমার কোনো-না-কোনো দিক, সংযোজিত হয়েছে নিত্য নতুন চিত্রভাষা। সমগ্র বিশ্ব বিনীতভাবে স্বীকৃতি জানিয়েছে তাঁর মহত্তম প্রতিভাকে। তিনি হয়েছেন বিশ্ববরেণ্য এক চলচ্চিত্র স্রষ্টা।

তাঁকে নিয়ে ছিল 'পরিচয়'-এর অন্তহীন গর্ব। সত্যজিৎ ছিলেন 'পরিচয়'-এর একান্ত আপনজন, সুখ-দুঃখের সাথী। কখনো প্রচ্ছদশিল্পী, কখনো-বা লেখক তিনি 'পরিচয়'-এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন তাঁর বহুমূল্য সহযোগিতা। আর, আমৃত্যু তিনি ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার পরিচালন-সমিতির বহুমান্য সদস্য।

আজ মনে পড়ে, তাঁর 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাবার পর যখন আন্তর্জাতিক কোনো স্বীকৃতি বা সম্মান সত্যজিৎ পান নি, তখন 'পরিচয়' পত্রিকা তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে 'পথের পাঁচালী'-র অমর স্রষ্টাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দ জানিয়ে ঐ চলচ্চিত্রের এক সদর্থক মূল্যায়ন করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি নিয়েও 'পরিচয়' সত্যজিৎ-এর মহত্তম চলচ্চিত্র-ভাবনাকে পাঠকমনে যথাসাধ্য সঞ্চারিত করে দিতে চেষ্টা করেছে। এই নিয়ে ঘটেছে 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় অনেক তর্ক-বিতর্ক। স্বয়ং সত্যজিৎ সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন, আর শামিল হয়েছেন সত্যজিৎ-পরিচালিত চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সত্যজিৎ-এর মহাপ্রয়াণে আজ সব কিছুই স্মৃতিমাত্র। আমরা সত্যিই শোকস্তব্ধ। তবু সেই নির্মম-নিষ্ঠুর অথচ গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিগুলো আমাদের যেন প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে ফিরছে।

আমাদের আত্মার আত্মীয় সত্যজিৎ আমাদের প্রকৃতই নিঃস্ব করে পঞ্চভূতে বিলীন হলেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালী সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি আমাদের হৃদয়াকাশ শূন্য করে এক বিষাদঘন অন্ধকারে চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেল।

আমরা 'পরিচয়' সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে শোকাহত মন নিয়ে অমর স্রষ্টা সত্যজিৎ-এর স্ত্রী-পুত্র এবং পুত্রবধূকে জানাই আমাদের আন্তরিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি। এই মহত্তম শিল্পীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে 'পরিচয়' জানাচ্ছে তার সশ্রদ্ধ সম্মান।

সম্পাদক, পরিচয়

পরিচয়

পঁচাত্তর বছরের সাহিত্য সময় সংস্কৃতি

মে দিবস

শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতি
দীর্ঘজীবী হোক্

"ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন—গুন্ গুন্ স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র-ধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে॥"

"ওরা কাজ করে"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখা যায়। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলিও দৃশ্যমান। কিন্তু বিদ্যুৎ তরঙ্গ দেখা যায় না। চেনা যায় সেই বিদ্যুৎ দিয়ে যার ফলে বাতি জ্বলছে, পাখা চলছে, কলকারখানায় উৎপাদন হচ্ছে, জলসেচ করছে চাষীভাই।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে না-দেখা যে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত উন্নয়নের শপথ নিয়ে তার আর এক নাম প্রগতি।

"ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা।"

—রবীন্দ্রনাথ

এই অশিক্ষা দূর করতে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হাওড়া জেলা সার্বিক সাক্ষরতা পরিষদের নেতৃত্বে সাক্ষরতার অভিযান শুরু করেছে।

আসুন, আমরা সবাই এই অভিযানের শরিক হই।

—স্বদেশ চক্রবর্তী

মেয়র

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

"...ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

......রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ..............

SANKHA GHOSH

Emperor Babur's Prayer and Other Poems

translated with an introduction Kalyan Ray

Cover Design : Purnendu Pattrea Rs. 50·00

NIRENDRANATH CHAKRAVARTI

The King without Clothes

tr. Sukanta Chaudhuri

Cover Design : Purnendu Pattrea Rs. 20·00

BISHNU DEY

History's Tragic Exultation

tr. Bishnu Dey and others

Cover Design : Hemanta Mishra

First Akademi Edition Rs. 50·00

SAHITYA AKADEMI

Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road,

New Delhi-1

Jeevantara Bhavan, 23A/44X, Diamond Harbour Road,

Calcutta-53 (Ph : 49-7406)

পরিচয়

৬১ বর্ষ ১০-১২ সংখ্যা মে—জুলাই ১৯৯২ বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৯৯

পঁচিশ বছরের বাংলা সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র
মণীন্দ্র রায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও
ব্যবস্থাপনা-দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতির অবস্থা

রমাকান্ত চক্রবর্তী

১

পশ্চিমবঙ্গে এখন 'সংস্কৃতি' বলে কিছু আছে কি না, অনেক শিক্ষিত বৃদ্ধ বাঙালি, মধ্যবয়স্ক বাঙালি রাগতভাবে এ প্রশ্ন করে থাকেন। সত্তরের উপরে যাঁদের বয়স, তাঁরা এককালে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিশিষ্ট বাঙালিকে সক্রিয় দেখেছিলেন। সত্যজিৎ রায়েরও খুব নামডাক ছিল। তিনিও চলে গেলেন।

সাধারণ বাঙালিদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই 'সংকট' সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তারও কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত এ ধারণাতে কিছু বিখ্যাত বাঙালিদের প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্থান কী হবে—তা নির্ভর করে তাঁদের সম্পর্কে প্রচারের ব্যাপকতার উপরে। দ্বিতীয়ত এ ধারণাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থান নেই। শিক্ষকদের বেতনের হার বর্দ্ধিত হলেও তাঁদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পায়নি। 'গণ্ডায় গণ্ডায় বি. এ, এম. এ, ডক্টরেট ঘুরে বেরোচ্ছে'—এইরূপ মন্তব্য প্রায়শ শোনা যায়। তৃতীয়ত এ ধারণাতে মানববিদ্যার ও বিজ্ঞানের কোন গুরুত্ব নেই। এ সব বিদ্যাচর্চার এমন কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় না, যা সকলেই সহজে বুঝতে পারে। অধুনা বিজ্ঞানবিষয়ক চেতনার সম্প্রসারণের জন্য, মান বৃদ্ধির জন্য অনেকেই প্রশংসনীয় ভাবে বিচেষ্টিত। কিন্তু সাফল্য লাভ করার জন্য তাঁদের অনেক সময় লাগবে। চতুর্থত সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাতে উচ্চমানের চিত্রশিল্প, সঙ্গীতশিল্প, বাদনশিল্প, হাতের কাজ, কান্তিবিদ্যা নিতান্ত অস্পষ্ট কারণ ভাল ছবি, ভাল গান, ভাল বাজনা, ভাল হাতের কাজ, নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে ভাল আলোচনা, এমন কী প্রকৃত অর্থে সৎ সাহিত্য শিক্ষিত, নাগরিক বাঙালিদেরও দুরধিগম্য। যে সময়, সদিচ্ছা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা

এবং পরিশীলিত সাংস্কৃতিক বোধ থাকলে এ সব দেখা যায়, দেখলে বোঝা যায়, শোনা যায়, শুনলে তারিফ করা যায়, তা অধুনা দুর্লক্ষ্য। পক্ষান্তরে মার্কসবাদী সংস্কৃতির মান এখন এই ডামাডোলের মধ্যেও এতই উচ্চ, এত বেশি সভ্য এবং সংস্কৃত. এত জটিল তত্ত্ব খচিত যে, খুব শিক্ষিত দর্শক এবং পাঠকও তার মর্ম বুঝতে পারেন না। কাজেই, সংস্কৃতি সম্পর্কে লোকধারণায় বহু আলোচিত, বহুশ্রুত নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের মার্কসবাদী সংস্কৃতি কোন চিহ্নিত মাত্রারূপে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হল না।

এমন শোনা যায়, কলকাতায় একটা নবনাট্য আন্দোলন আছে। কিন্তু তার প্রভাব কোথায়? অলীক কুনাট্য রঙ্গে, লোকে মজে রাঢ়ে বঙ্গে। এমন সব যাত্রা বার করা হয়েছে, যার আখ্যা শুনলেই বুকটা কেঁপে ওঠে। এসবই লোকে টিকিট কেটে শত শত রথতলার মাঠে দেখছে। ওদিকে কলকাতার সিনেমা প্রধানত বোম্বাই-ছবির সিনেমা। "ওহ্! শালা! গুরু, গুরু"— এ ধরণের বিটভাষাই এখন প্রায়শ শোনা যায়। ষষ্ঠ দশকেও রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা কিছুটা শ্রাব্য ছিল; এখন তা অশ্রাব্য।

মনে হয়, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচলিত আলোচনার ধারা এখন কিছুটা পালটানো দরকার। প্রচলিত আলোচনা প্রধানত স্মৃতিকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে বৈচারিক মূল্যায়ন প্রায়শ থাকে না, থাকে অবিশ্বাস্য গৌরবগাথা। এক সময়ে এভাবেই জমিদারদের জীবনী লেখা হত। হোমরাচোমরা বাঙ্গালিরা যা ভেবেছেন, যা লিখেছেন, যা করেছেন, সব ঠিক্। এমন কী মার্কসবাদী সাহিত্য সংস্কৃতির দু'একটি অত্যাধুনিক বিবরণেও এই সামবৈদিক গাথা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আরে বাপু! অমুক মার্কসবাদী, তমুক মার্কসবাদী যদি এমন সব দুর্দান্ত কৃতিত্বই দেখিয়ে থাকেন, তবে লোকে তা জানে না কেন? তাঁদের নাম, কাম ঢক্কানিনাদে প্রচার করার দরকার হচ্ছে কেন? যাঁরা মার্কসবাদী সংস্কৃতির মূল্যায়ন করেন, তাঁদের মধ্যে কারু কারু মনে এ প্রশ্ন জেগেছে। একজন সঙ্গত কারণে লিখেছেন:[১]

তাই শতাব্দীর শেষ দশকে দাঁড়িয়ে বিগত কয়েক দশকের দ্বন্দ্ব বিরোধহীন নিস্তাপ স্মৃতি-রোমন্থনকেই বরং ক্লেশদায়ক মনে হয়। প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তার প্রগতিহীনতার চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে?

এখন, হোমরাচোমরাদের একটু প্রেক্ষাপটের পিছনে রেখে গ্রামের মানুষের কথা এবং শহরের মানুষের কথা ভাবার সময় হয়েছে। এ ভাবনারও একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমি রয়েছে। ১৯৬৭তে পশ্চিমবঙ্গের

রাজনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টগণ এবং সমাজবাদ দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য বাম-পন্থীগণ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭৭-এ একত্রিতভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁদের ক্ষমতা এখন পর্যন্ত নিরঙ্কুশ, প্রায় একচ্ছত্র। তাঁদের রাষ্ট্রাদর্শে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে, সামাজিক ধ্যানধারণায় বহুবিধ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন চেয়েছিলেন তাঁরা। ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে তাঁরা অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেন ; তাঁরা পশ্চিম-বঙ্গে ধর্মের নামে কোন বড় রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখন পর্যন্ত হতে দেননি। তাঁরা সর্বদা প্রগতির এবং পরিবর্তনের সমর্থক। তাঁদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কেন্দ্রিকতা এবং বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে ভারসাম্যের ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এখন, তাঁদের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামনগরের সংস্কৃতি কী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার প্রবণতাগুলো কী এসব প্রশ্ন ভাবা দরকার। অগণিত মানুষের কথাই প্রধান; আর সব অপ্রধান না হলেও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। আমাদের দেশে প্রথমাবধি বড় মানুষরাই সর্বক্ষেত্রে বরিষ্ঠ হয়ে আছেন। উচ্চ মানুষদের কথা জেনে উচ্চ মানুষরাই যদি অনুপ্রাণিত হন, তবেই মঙ্গল। এই ঐতিহ্যসম্মত মঙ্গলবোধ এখন আর তো চলে না। রামমোহনের কাল থেকে জ্যোতি বসুর কাল পর্যন্ত উচ্চ বাঙ্গালিরা যতোটা নিয়েছেন, ততোটা দেননি। এমন ভাল জিনিস নেই যা উচ্চ বাঙ্গালিরা নেননি। কিন্তু তাতে কী হল ? এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম, ১৯০৪-এ রচিত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র'-তে। তিনি লিখেছেন :[২]

এ সময় গ্রামে অত্যন্ত জলাভাব ...পুষ্করিণীগর্ভ শুকাইয়া সেখানকার মাটি পর্যন্ত চৌচির হইয়া গিয়াছে। ঠিক মধ্যস্থলে পাঁকের উপর কয়েক অঙ্গুলি মাত্র জল আছে...দুই তিন দল ছেলে সেই আইলের বিভিন্ন দিকে গামছা ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিতেছে...দৈবাৎ দু-একটা পিপাসাক্রান্ত কপোত আকণ্ঠ জলপানের আশায় বহু দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া ঘর্মাক্ত বক্ষে কম্পিত পক্ষে পুষ্করিণীতীরে বসি বসি করিতেছিল, ছেলেদের উচ্চহাস্যে ভয় পাইয়া তাহারা আবার তখনই উড়িয়া দূরে পলাইল।

এই অসামান্য বিবরণে বাঙ্গালার সংস্কৃতি ক্ষেত্রের শূন্যতা যেন চিত্রলক্ষণে পরিস্ফুট। তার মাটি পর্যন্ত ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। কাদা থেকে চ্যাঙ, আর বেলে মাছ ধরা হচ্ছে। কয়েকটি কপোত যেন সুস্থ মূল্যবোধের এবং

সাংস্কৃতিক প্রসারণের প্রতীক রূপে উড়ে এসেছিল, ঘর্মাক্ত বক্ষে কম্পিত পক্ষে। তারা উড়ে দূরে পালাল।

২

কেবল শূন্যতার খোঁজ করে করে শূন্য হয়ে যেতে হয়। সে পণ্ডশ্রম অর্থহীন। নেতিবাচক বিবরণ লেখা সহজ; কারণ খুঁৎ সহজেই ধরা পড়ে। কোন পুষ্করিণীতেই কী জল নেই? সর্বত্রই কী মাটি ফেটে চৌচির?

বিগত চব্বিশ-পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অনুন্নত গ্রামও আছে; দুর্গাপুরের বাঁধ পার হয়ে যখনই বাঁকুড়াতে, এবং বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়াতে প্রবেশ করা গেল, তখনই চোখে পড়ল রৌদ্রদগ্ধ জনহীন শুষ্ক মাঠ; দুর্বল মাটির ঘর; অভাবগ্রস্ত নরনারী; জীবনীশক্তিহীন উলঙ্গ শিশু। কিন্তু কোন কোন গ্রামে স্বচক্ষে পরিবর্তনের এবং উন্নয়নের নিদর্শন দেখেছি। কৃষক সমাজের স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কারের বাস্তব রূপায়ণের নীতি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল তার অনুপূরক নীতিরূপে গ্রাহ্য হয়।[৩] যেখানে পূর্বে কিছুই ছিল না, সেখানে বাঁধান রাস্তাঘাট হয়েছে। বাজার বসেছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রেজিস্টারি করে ভূমিহীন বর্গাদারদের মধ্যে ভূমিবণ্টন সর্বত্র সমানভাবে না হলেও একটি অর্থবহ স্তরে এসেছে। চারদিকে সবুজ ধানক্ষেতের মাঝখানে কলেজ দেখা যায় কোথাও। কৃষিতে নিযুক্ত মজুরের আয় বেড়েছে। সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত। বহু গ্রামে ব্যাঙ্ক আছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পের রূপায়ণও দেখা যায়। অসংখ্য মৌজায় বিদ্যুৎ যায়। কোন কোন জেলাতে স্বাক্ষরতা সম্প্রতি তৃণমূলে প্রসারিত হয়েছে।

গ্রামের মানুষ এখন আর মূর্খ মূক রামা কৈবর্ত আর হাশিম শেখ নয়। পূর্বে গ্রামের মানুষকে শহরে বাবুরা নিতান্ত চাষা ভাবতেন। কিন্তু জ্ঞানগম্যি নাই, লঘুগুরু জ্ঞান নাই—এমন লোক শহরে যদিও বা দেখা যায়, গ্রামে এখন আর দেখা যায় না। যে কোন গ্রামে গেলে, মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে এই বোধ হয় যে তারা বোকা নয়। বামফ্রন্টের সুদীর্ঘ শাসনে গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তি চৈতন্যের এই প্রখরতা একটি অসাধারণ ঘটনা। নানা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদের সমস্যা অতীতেও খুব তীব্র অথবা গভীর ছিল না। অধুনা জাতবিচারের যুক্তি বিলীয়মান। পূর্বে 'ছোটলোক' শব্দটির একটি জাতি এবং পেশাভিত্তিক ব্যঞ্জনা ছিল। নিম্নজাতির

অনুন্নত লোকদের অব্রাহ্মণ জীবনধারার জন্য 'ছোটলোক' ভাবা হত। এখন চারিত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্য কোন ব্রাহ্মণ 'ভদ্রলোক'ও 'ছোটলোক' রূপে কুখ্যাত হতে পারেন। ব্যক্তির এবং সমাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নির্বাচন এখন গভীর অর্থ বহন করে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া ঐতিহ্যসম্মত সামাজিক সম্পর্ককে এবং মূল্যবোধকে সর্বদা খাতির করে না।

রবীন্দ্রনাথ এককালে স্বদেশী সমাজের সার্বভৌমত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যেহেতু শ্রেণীবিভেদের কথা তখন আমাদের দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তাই স্বদেশী সমাজ প্রসঙ্গে সামাজিক শ্রেণীভেদের বিষয়টিকে তিনি কোন গুরুত্ব দেননি।[৪] তিনি এই সমাজের চিরন্তনতা দেখে মুগ্ধ হন। একজন পণ্ডিত এমন মন্তব্য করেছেন যে স্বদেশী সমাজের বৈবিক তত্ত্ব অপ্রত্যক্ষভাবে 'সরকারী পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনাকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছে'।[৫] শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরে এই দেখাতে চেষ্টা করেন যে, সার্বভৌম পল্লীসমাজ সভ্য সংস্কৃতির এবং মূল্যবোধের অভাবে ভেঙে পড়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর সংস্কারক-নায়ক জমিদার পুত্র রমেশ পল্লীসমাজের বিধানকে অগ্রাহ্য করলেন। ওদিকে তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'র ছিরু পালের মতো গ্রামীণ মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের ফলে রাঢ় বাঙ্গালার গ্রামীণ কৌমজীবন দুর্বল হয়ে পড়ল। অধুনা সর্বত্র সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত; পল্লীসমাজের একাধিক ঐতিহ্য এখন রাষ্ট্র দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, রাষ্ট্রের নিয়মানুসারে বর্জিত হয়েছে। পুরাতন গ্রামীণ সমাজ বিন্যাসের আর পূর্বের মতো স্থিতিশীলতা নেই। এখন গ্রামে সমাজের বিশেষ কর্তৃত্ব নেই; এখন সেখানে রাজনৈতিক দলের এবং দলের নেতাদের গুরুত্বই বেশি। গ্রামাঞ্চলে এখন রাজনীতি সার্বভৌম।

হুগলির ও বর্ধমানের কোন কোন গ্রামে গিয়ে দেখেছি—একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এককালে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মানকরের মধ্যবিত্ত বলেছিলেন: 'জমিজমা আছে কিছু। করে আছি মাথা নিচু॥' তাঁরই কবিতায় দু'বিঘা জমির মালিক দুর্বল মধ্যবিত্ত তাঁরই গ্রামের জমিদার-'মহারাজা'র দ্বারা নিপীড়িত হন। এখন এঁরাই কোথাও বা প্রতিপত্তিশালী, কোথাও বা প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য বিচেষ্টিত। গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধভাবেও আধুনিকতার প্রবর্তক। গ্রামের কৌমজীবনের সঙ্গে এই শ্রেণীর মানুষের সম্পর্ক ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। তাঁরা সর্ববিধ সমস্যার সমাধান রাজনীতিতেই দেখতে পাচ্ছেন।

পূর্বের কৌমজীবনে কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না। সুবৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে যে কী কঠোর ভাবে শৃঙ্খলা রক্ষিত হত তা আমি নিজেই দেখেছি। আমার প্রতাপান্বিতা পিতামহী ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ভগ্নী। আমাদের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের কোন ব্যক্তি আমার পিতামহী ঠাকুরাণীর কথার উপরে কথা বলার সাহস দেখাতেন না। গ্রাম্য সমাজে জমিদার, ব্রাহ্মণ এবং গুরু, সৈয়দ অথবা উলামা. উচ্চশূদ্র কিংবা অভিজাত মুসলমান "শিষ্ট"—বর্গ গ্রামীণ জীবনের নিয়ন্তা ছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাবই ছিল একান্নবর্তী পরিবারের এবং চণ্ডীমণ্ডপ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌল নিয়ম। এখন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, এমন কী 'লড়াকু' ভাগচাষী নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিচেষ্টিত। কিন্তু ব্যক্তিসত্তা তো নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব লাভ করে না। রাজনৈতিক মতবাদ এবং দল তাতে ভাগ বসায়। রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারে, প্রসারণে যাঁরা সক্রিয় থাকেন, তাঁদের দল ভারি হয়; দলে না থাকলে ব্যক্তির কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। তাই, গ্রামে অধুনা প্রকৃত অর্থে কোনরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে কী না, এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

১৯৬১-তে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় নির্মলকুমার বসু ভারতের পাঁচ রকমের গ্রামের উল্লেখ করেছিলেন।[৬] তখন পশ্চিমবঙ্গে এবং সমগ্র উত্তর ভারতে, নির্মলকুমারের ভাষায়, 'অনির্দিষ্ট আকারে পুঞ্জীভূত'-গৃহবিশিষ্ট গ্রামের সংখ্যাই বেশি ছিল। এখনও এরকম গ্রামের সংখ্যাই বেশি; কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে; বেড়েছে নূতন বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা। যে কোন মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট গ্রামে প্রবেশ করলেই সংখ্যাতীত শিশু দর্শককে ঘিরে ধরে। গ্রামীন মধ্যবিত্তের সুস্পষ্ট নাগরিকতাও এবিষয়ে বিবেচ্য। তার ফলে গ্রামের প্রচলিত গঠনও ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনে সরকারি গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকতে পারে। থাকতে পারে পঞ্চায়েতের ভূমিকা।

পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক নৈতিক প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলা যায় যে এ প্রশ্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর নৈতিকতার মান বিষয়ক বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পঞ্চায়েতের ভূমিকা বিশেষভাবে দেখা যায় একদা অনুন্নত ডানকুনি থেকে শুরু করে চাঁপাডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। পর্যাপ্ত আলুর চাষ এবং সক্রিয় গ্রামীণ পঞ্চায়েৎ এই অঞ্চলের চেহারা পালটিয়ে দিয়েছে। কার্লমার্কস-বর্ণিত কৃষি এবং হস্তশিল্প-সমন্বিত, স্বয়ং-

সম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ সমগ্র ভারতে সর্বত্র আদৌ ছিল কী না, এখন এ প্রশ্ন তোলা হয়।[৭] কিন্তু এখন যে তা আর নেই—সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অধুনা অনেক প্রাচীন এবং নূতন গ্রাম, না শহর না গ্রাম। গ্রামগঞ্জের বাজারে চারদিক থেকে, বিদেশ থেকেও, পণ্য আসে। গ্রামাঞ্চলে মানুষের চাহিদা বেড়েছে, পণ্যের বাজারও সম্প্রসারিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিচারে গ্রামে রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ, কৌম-ব্যবস্থায় সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের হস্তাবলেপ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব—এ সব বাঞ্ছনীয় ছিল কী না, অথবা কলিযুগের লক্ষণ কী না, তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। দুঃখবাদের এবং অদৃষ্টবাদের দু'হাজার বছরের ঐতিহ্য তো সহজে যায় না; যখনই প্রচলিত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, অথবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায়, তখন কলিযুগের ঐতিহ্যবাহিত তত্ত্বই জনমানসে জেগে ওঠে। ঐতিহ্যবাহিত প্রচলিত জীবনধারার পরিবর্তনে অথবা আধুনিকীকরণে আধুনিক রাষ্ট্রের ভূমিকা আদিতে নেতিবাচক, পরে ইতিবাচক; কেন না, নূতন করে কিছু গড়তে হলে পুরাতনকে অনেকটাই ভেঙে ফেলা দরকার। কিন্তু চিন্তাভাবনা না করে পুরাতনের বিনাশসাধন সর্বাংশে ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। নূতনকে গ্রহণ করার, নূতনের সঙ্গে মিলমিশ হওয়ার প্রবণতা এবং ক্ষমতা থাকা চাই।[৮] তা যদি আদপেই না থাকে, তবে যে কী হয়, তা অনেক গ্রামের ভেঙে পড়া চিকিৎসাকেন্দ্রের, ছত্রাকাবৃত বিদ্যালয়গৃহের, এবং দলবাজিতে আর দুর্নীতিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঞ্চায়েতের অবস্থা দেখলেই অনুমান করা যায়। গ্রামীন ক্ষেত্রে যন্ত্রের অথবা উন্নত টেক্‌নলজির প্রচলন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা যদি গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থদের একচেটিয়া সম্পত্তি হয়, তবে তার যে কী দুর্ভাগ্যজনক কুফল হয়, একটি সুলিখিত প্রবন্ধে আবুল বাশার তা দেখিয়েছেন।[৮] তার প্রথম কুফল, আবুল বাশারের বর্ণময় ভাষায়, 'পুঁজির সঙ্গে পুঁজিহীনের বিসংবাদ, যন্ত্রকৌলীন্যের অভিশাপ'। অবশ্য, তিনি যখন ঘোষণা করেন, 'যন্ত্র আসলে তার প্রতিপক্ষ চায়। গরিব তার প্রতিপক্ষ'—তখন তাঁর যুক্তিতে শিল্পবিপ্লবকালীন "লাডাইট্"—আন্দোলনের যন্ত্রধ্বংসী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধিকাংশ মানুষ যাতে বিজ্ঞানের এবং টেক্‌নলজির ব্যবহারের সুবিধা পায়—তাই ছিল সমাজবাদের প্রধান যুক্তি। পুঁজিবাদেই 'যন্ত্রকৌলীন্য' দেখা যায়।

'যন্ত্রকৌলীন্য' আছে। তার সুবিধা ভোগ করে বড় বড় জোতদার। তাঁরাই আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের লোক। ফলত গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-

সংগ্রামের ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়ছে। কোন মার্কসবাদী ধনী ; কোন মার্কসবাদী গরিব। তবে মার্কসবাদের ভিত্তিতে শ্রেণী সংগ্রামের কী রূপ হবে? এ তো প্রায় ধাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে নবনির্মাণের ক্ষেত্রে, সম্ভবত এ ধরনের ধাঁধা এড়াবার জন্য, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য 'আত্মশক্তি'র উপযোগিতার কথা লিখেছেন। 'এই আত্মশক্তির পাত্র বা বিষয়ী শুধু ব্যক্তি নয়, সামাজিক পরিমণ্ডলী', লিখেছেন তিনি।[৯] 'আত্মশক্তি'র অভাব জড় বিপ্লবকে, অথবা প্যাসিভ্ রেভোলিউশনকে সমাসন্ন করে তুলেছে। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের মতে, তার মোকাবিলা করতে হলে 'রাষ্ট্ররতি'-র 'সম্মোহ' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রস্তাবটি গভীরভাবে চিন্তণীয়।

৩.

বিবিধ পরিবর্তন সত্ত্বেও কেন গ্রামাঞ্চলে পুরাতন সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হয় না এ প্রশ্নের সমাজতাত্ত্বিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং সম্ভাব্য উত্তর বিতর্ককণ্টকিত। এটা বোঝা যায় যে সমাজে ঐতিহ্যের প্রভাব সমাজের গঠনের মধ্যেই একটি বিশিষ্ট উপাদানরূপে স্থায়ী হয়, এবং কখন কখন রূপান্তরের প্রক্রিয়াও তাতে দেখা যায়। সংস্কৃতির রূপান্তর সাধারণ অর্থে ঐতিহ্যেরও রূপান্তর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে এখনও মধ্যকালীন ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু দেবতার কাছে যা প্রার্থনা করা হয়, তাতে ঐতিহ্যের রূপান্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা চাওয়া হয়, তাতে আধুনিক জীবনেরই প্রতিবিম্ববিভ্রম দেখা যায়। অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা'র পাঁচটি সুবৃহৎ খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বহু তথ্য আছে।[১০]

চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ঝিকুড়বেড়ে গ্রামে 'বাবা ভূতনাথের কাচারি'-তে প্রধানত যে সব প্রার্থনাসহ আর্জি পেশ করা হয়, সেগুলো হল :[১১]

১. রোগব্যাধির নিরাময়।
২. জমিজমা সংক্রান্ত মামলাতে জয়লাভ।
৩. পুত্রকন্যা লাভ।
৪. পুত্রের সাইকেলের দোকান ভাল ভাবে চলা।
৫. জমিতে অধিক ধান হওয়া।
৬. মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্র পাওয়া।

৭. বিপথগামী জামাতার চিত্তশুদ্ধি।

৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে সাফল্য লাভ।

৯. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর মনে রাখা। [একটি ছাত্রী ভূতনাথ বাবাকে এক বোতল মদ দিয়ে এই প্রার্থনা জানালেন।]

১০. স্বামীর উপার্জন বৃদ্ধি।

১১. মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ এবং প্রার্থনা পূর্ণ হলে বাবাকে মদ্যমাংস উপহার দানের অঙ্গীকার।

১২. গাভীর গর্ভ।

১৩. মোরগের মড়ক নিবারণ।

প্রার্থনার এই নমুনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবঙ্গের লোকবিশ্বাস কোন জ্ঞানভক্তিমার্গাবলম্বী উচ্চ আধ্যাত্মিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। আগেও হয়নি, এখনও হয়নি। সংসারক্ষেত্রে অসহায় নরনারী যখন ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম্য সমাজ থেকে, রাজনীতি থেকে কোন সাহায্য কিংবা আশ্বাস পায় না, তখনই প্রাগৈতিহাসিক যাদুবিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধরণের 'বাবা'র এবং 'মা'র দরবারে প্রার্থনা জানায়। এভাবে 'বাবা', 'মা' এবং তাঁদের পুরোহিতগণ এখনও গ্রামাঞ্চলে অরাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসরূপে বিরাজ করেন। এককালে গ্রামাঞ্চলের প্রাগাধুনিক সংস্কৃতিতে স্মৃতিশাস্ত্রের, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব ছিল। তার কারণ, প্রাগাধুনিক কালে এ সবের পৃষ্ঠপোষক ছিল প্রধানত গ্রামের সমৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী পরিবার সমূহ। এর মধ্যে এম. এন. শ্রীনিবাস কথিত 'সংস্কৃতকরণ' এর প্রক্রিয়াও ছিল।[১২] কিন্তু এখন সংস্কৃতকরণ প্রধানত অর্থোপার্জনের উপরে এবং যন্ত্রকৌলীন্যের উপরে নির্ভরশীল। এই নূতন সামাজিক-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রাহ্য হয়ে ওঠার ফলে ধর্মের পৌরাণিক শাস্ত্রীয় ভিত্তি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস দুর্বল হয়নি। সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে যে তুলনামূলক সাফল্য অর্জন করেছে, তাতে রাজনীতিদ্বারা প্রভাবিত ধর্মীয় ঐতিহ্যের রূপান্তর দেখা যায়।

প্রাগাধুনিক কালে কন্‌স্‌পিকুয়াস্‌ কন্‌সাম্পশন-এর, অথবা দৃশ্যমান ভোগের নিদর্শন দেবমন্দির নির্মাণে স্পষ্টীভূত। ডেভিড্‌ ম্যাক্‌কাচ্চন্‌ লিখেছিলেন :[১৩]

১৬ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা দেশের মন্দির নির্মাণে এক পুনর্জাগরণ আসে যার ফলে স্থাপত্যের আকৃতি ও পোড়ামাটির অলংকরণে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয় যা ইংরেজ আমলেও অনেকদিন পর্যন্ত হ্রাস পায়নি।

কিন্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এল ; এখন শুধু যে প্রাগাধুনিক আঙ্গিকে আর মন্দির নির্মিত হয় না, তাই নয় ; স্থানীয় মন্দিরগুলো ভেঙে যেতে থাকলেও মানুষ বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় না। পুরাকীর্তির যথার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে আধুনিক গ্রামবাসিদের চেতনা নেই। এই চেতনাহীনতার ফলে শিল্পকর্মরূপে পট এবং শিল্পীরূপে পটুয়ারাও এখন প্রায় অবলুপ্ত। অবলুপ্ত হয়েছে ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের চতুষ্পাঠীসমূহে সংস্কৃতচর্চা. কারণ সংস্কৃত ভাষার এবং সাহিত্যের মূল্য এখন স্বীকৃত হয়না. এবং টুলো পণ্ডিতেরও এখন কোন সামাজিক আভিজাত্য নেই। অথচ সাবেক কালের জাতিভিত্তিক বাসস্থানের বিন্যাস, কিংবা একটি বা দুটি বিশেষ জাতি অধ্যুষিত গ্রাম এখনও দুর্লক্ষ্য নয়।

ব্রতানুষ্ঠান সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :[১৪]

কামনা এবং তার চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া যখন একেরই মধ্যে কিম্বা অসংহত ভাবে দশের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অবস্থায় রইল তখন সেই একেরই সঙ্গে বা একে-একে দশের সঙ্গে তার লোপ হয়ে গেল। কিন্তু এক ভাব এক ক্রিয়া যখন সমস্ত জাতিকে প্রেরণা দিলে তখন সেটি ব্রত হল, এবং বেঁচেও রইল দেখি।

অবনীন্দ্রনাথ কথিত 'একভাব একক্রিয়া'র সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা সংহত এবং স্মার্ত মূল্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত পল্লীসমাজের সংযোগ ছিল। এখন সেই সংযোগ নেই। অবনীন্দ্রনাথ যে সব সুন্দর ব্রতানুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন, তাদের কথা এখন আর শোনা যায় না। ব্রতপালিকাদের সামাজিক শ্রেণী তাঁর কালেও এক ছিল না। যদি পঞ্জিকা বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে বলতেই হবে যে, এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা পঞ্জিকা অনুসারে ধর্মকৃত্য পালন করেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, রামনবমী ব্রত, সত্যনারায়ণ ব্রত, শনৈশ্চর ব্রত, বিপত্তারিণী ব্রত, ষট্‌পঞ্চমী ব্রত—এধরণের পৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান করেন।[১৫] মেয়েদের ব্রত এখনও আছে, কিন্তু অঞ্চলভেদে তাদের মধ্যে প্রভেদও লক্ষণীয়।

অবনীন্দ্রনাথ যে কামনার এবং তার চরিতার্থতার কথা উল্লেখ করেছেন, গ্রামাঞ্চলে বিবিধ পরিবর্তনের ফলে হয়তো তারও রূপান্তর হয়েছে। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ এখন কী চায়? এ প্রশ্নের উত্তরে আগে যে সব কথা সরলভাবে বলা হত এখনও কী সে সব কথা বলা হয়? তা বোধ হয় নয়, কারণ গ্রামের নরনারীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং চাহিদা স্বাভাবিক কারণেই

পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে। এখন শুধু গোলাভরা ধান নয়; সঙ্গে একটা চাকরিও থাকলে ভাল হয়। কেবল পাকা বাড়ি থাকলেই হবে না; ঘরে "বোকা বাক্স" দূরদর্শন যন্ত্র থাকলে আভিজাত্য বাড়ে। সন্তানের জন্য শুধু দুধভাত নয়; তার পুষ্টির জন্য সুদূর গ্রামাঞ্চলের বাজারেও "ফ্যারেক্স", "নেসটাম", "ম্যাগি" পাওয়া যায়। তাও তাকে খাওয়ালে আভিজাত্য বাড়ে। এসব কেনার ক্ষমতা সম্পন্ন গৃহস্থও আছে। তাই বোধ হয় প্রাগাধুনিক ব্রতের কোমল, করুণ, প্রতীকায়িত কাব্যভাষা এখন আর তেমন শোনা যায় না।

৪

১৯৬১তে নির্মলকুমার বসু লিখেছিলেন:[১৬]

ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যবদ্ধ রূপকে একটি পিরামিডের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে। জনসাধারণের বাস্তব জীবন ইহার সুবিস্তীর্ণ ভিত্তিভূমি। সেই স্তরে বহু দৃষ্টিগোচর পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু উহা যতই উপরে উঠিয়াছে প্রভেদগুলি ততই মিলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে নানাভাবে নাগরিক কৃষ্টির বিস্তারের ফলে, জনসাধারণের বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, পূর্বে দৃষ্ট অন্যান্য পার্থক্যগুলো কমে যাচ্ছে। গত পঁচিশ বছরে যে প্রশ্ন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হল: নাগরিক কৃষ্টির সম্প্রসারণের সীমা কী? গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা প্রধানত কাজ পাবার জন্য এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা লাভের জন্য, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে নগরের প্রসারণের সমর্থক। শহর এগিয়ে এসে গ্রামকে গ্রাস করলেও গ্রামের মানুষ কখন তাতে আপত্তি করে না। যে কোন দিক থেকে কলকাতার যতো কাছে আসা যায়, ততোই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নগর সম্প্রসারিত হচ্ছে, ঠিকই; কিন্তু নাগরিক সংস্কৃতি বলতে, বুর্জোয়া অর্থেও আমরা যে সর্বজনীনতা, মনের উদারতা, সুরুচিবোধ, সভ্য আচার ব্যবহার বুঝি, তাও কী সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রসারিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তরে কতগুলো তথ্য দেওয়া যায়। এখন পশ্চিমবঙ্গের দুর্গম গ্রামাঞ্চলেও কলকাতা থেকে বাস ও ট্রেন যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত 'ফ্যাশন'। গ্রামেও আছে রেডিও, টেলিভিশন। এসব প্রচার মাধ্যমে বোম্বাইয়ের এবং দিল্লীর মানুষের পথচারী অথবা 'পেডেস্ট্রিয়ান্'-সংস্কৃতি

দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আবুল বাশার ঠিকই লিখেছেন: [১৭]

ভিডিও-সিনেমার এই সংস্কৃতি গ্রামের নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ করছে নিয়ত। আলকাপ, কবিগান, বাউল-সঙ্গীত ইত্যাদির দিক থেকে আজকের গ্রামীণ তরুণের মনকে এই ভিডিও বিক্ষিপ্তভাবে হটিয়ে টেনে নামাচ্ছে বিকৃত অসুস্থ উত্তেজক কালচারের পাঁকে। হিন্দী সিনেমার দাপটে বাংলার গ্রামজীবন সংস্কৃতিগতভাবে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে বসেছে…

গ্রামাঞ্চলে পূর্বে বহুশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ প্রেমগীতি এখন অনেক ক্ষেত্রে হিন্দী সিনেমার নায়কনায়িকাদের গান। কোন কোন গ্রামে অশ্লীল ছবি পর্যন্ত দেখান হয়। আবুল বাশার হিন্দী সিনেমার এই দুর্দান্ত কল্পসংস্কৃতির দ্রুত প্রসারের জন্য গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি পিছিয়ে পড়া অংশকে দায়ী করতে চান।[১৮] কিন্তু এ ব্যাপারে গ্রামীণ ধনীদের কোন দায়িত্বই কী নেই? তাঁরা কী শ্রেণী হিসেবে সর্বদা 'সুস্থ' সংস্কৃতির সমর্থক এবং প্রবর্তক?

আবুল বাশার কী আর দেখেননি যে, রাস্তার ধারে ট্রাক-চালকদের হোটেলে অথবা ধাবাতে, এবং ট্রাক-সারাই করার ছোট ছোট কারখানাতে যে সংস্কৃতি অনাবৃত, তাও ঠিক গ্রাম-বাঙ্গালার সংস্কৃতি নয়? এসব ধাবা এবং কারখানা পরিবেশকে এবং কাছাকাছি গ্রামসমূহের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে অবিশ্বাস্যভাবে কলুষিত করে চলেছে। জাতীয় সড়ক ধরে রৌদ্রদগ্ধ ধূলিধূসরিত উত্তর ভারত, যার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের পার্থক্য সামান্যই—যেন ভারতের মৌলিক একতার তত্ত্বটিকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত করার জন্য বাঙ্গালার গ্রামাঞ্চলে নিজের আসন পেতেছে। সমগ্র গ্রামবাঙ্গালার সঙ্গে সমগ্র ভারতের ক্রমবর্ধমান সংযোগ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আদপেই সুফলপ্রসূ হচ্ছে না। এটা তো ভাল কথা নয়।

০

৫

পশ্চিমবঙ্গে অনুসূচিত আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা আটত্রিশ। ১৯৮১-র আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫·৬৩ জন আদিবাসী। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনায় আদিবাসীদের প্রসঙ্গ প্রায়শ অনুক্ত থাকে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, সংস্কৃতির আলোচক অথবা ব্যাখ্যাতাগণ উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক এবং তাঁদের সঙ্গে আদিবাসীদের হয়তো কোন পরিচয় নেই। প্রবোধকুমার ভৌমিক লিখেছেন: [১৯]

দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসন আমাদের মনে এক ঔপনিবেশিক মনোভাবের সৃষ্টি করেছে তা গোটা সমাজকে নানাভাবে জর্জরিত করেছে।·· ব্রিটিশ রাজশক্তি ও তাদের অনুগত ক্রীতদাসগোষ্ঠী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ এই দেশের অধিবাসীদের খণ্ডিত জনগোষ্ঠী হিসাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছে, ফলে দীর্ঘ সময়ে বৃহত্তর বঙ্গসমাজের পারস্পরিক নির্ভরতা বা আত্মীয়তা ভ্রান্ত বিচারে বিশ্লেষিত। বরং বিরোধ ও বিদ্বেষের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত।

আবার একথাও বলা যায় যে, সব দোষ ভদ্রলোকদের নয়। আদিবাসীদের মধ্যেও এমন একাধিক গোষ্ঠী আছে, যারা তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং লোকব্যবহারকে প্রাণপণে ধ'রে রাখতে চায়। অবশ্য এটাও দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ঐতিহ্য প্রচলিত আদিবাসী-ঐতিহ্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। এম. এন. শ্রীনিবাস লিখেছেন ঃ [২০]

Sanskritization is not confined to Hindu castes but also occurs among tribal and semitribal groups such as the Bhils of Western India, the Gonds and Oraons of Central India, and the Pahadis of the Himalayas.

সাংস্কৃতিক লেনদেনের প্রক্রিয়া এখন আরও জোরদারহয়েছে, কারণ রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যে আদিম বাসিন্দাদের প্রচলনির্ভর জগতেও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন যে, সরকারের অর্থ অকৃপণ হাতে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা হলেও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীগণ এখন পর্যন্ত তিমিরাবৃত। এখনও নিরন্ন সাঁওতাল পরিবারে মা তাঁর শিশু সন্তানকে ভাত খেতে দিতে না পেরে মহুয়ার মদ পান করিয়ে মুহ্যমান করে রাখেন।[২১] বাস্কে লিখেছেন ঃ [২২]

আজ চোখে পড়ে, লোধা কলোনির ঘরগুলো ভেঙে ঝুপড়ি হয়ে গেছে, টিনগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে। লোধারা আবার সেই পূর্বের অবস্থাতেই ফিরে এসেছে।···খড়িয়াদের অবস্থা লোধাদের মতই এবং সব দিক থেকে তারা বহু পেছনে পড়ে আছে···শবরদের [স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, বনবাদাড়, শিকরবাকর, বিশীর্ণ ··] ভূমিজদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি হো-দের জন্য বহু টাকা খরচ করলেও ফল পাওয়া গেছে সামান্যই·· যাযাবর বিরহড়দের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কোন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করেননি ··শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুণ্ডাদের মধ্যে তা

সফল হল না…১৯৭১-এ ৯০'৪৮ শতাংশ মাহালি নিরক্ষর ছিল…বামফ্রন্টের আমলেও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না…অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আদিবাসী উন্নয়নের নামে শুধু পরিকল্পনা ও ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে। কাজ সেরকম হয়নি। সাঁওতালদের ক্ষেত্রে অবশ্য ততখানি হয়নি…

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মার্কসবাদী। লক্ষণীয়, তিনি বারবার আদিবাসীদের প্রসঙ্গে নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতাবোধের কথা লিখেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে নানা কারণে আদিবাসীগণ আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক উন্নয়নের ধারনার এবং পরিকল্পনার অর্থই উপলব্ধি করতে পারেন না। মহত্তর ব্রাহ্মণ্য বাঙালি-সংস্কৃতির প্রবল অভিঘাতে দুর্বল আদিবাসী নিজেকে বাঁচাবার জন্য স্বধর্মে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে চান; জ্ঞানবুদ্ধির মণিমুক্তাখচিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে তাঁরা সন্দেহপূর্ণ নয়নে অবলোকন করেন মাত্র; তাতে অংশগ্রহণ করতে চান না। আদিবাসীদের উন্নতি অবনতির প্রশ্নটি তাঁদের নিজস্ব বিশ্ববীক্ষণের, নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। তা কী মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগণ বুঝতে চেষ্টা করেন? আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্তর এবং প্রকৃতি যে কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে, বিতর্ক থাকবে।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে কতগুলো সিদ্ধান্ত করা যায়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমাদের দেশে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। যা পূর্বে কয়েকটি পাঁচশালা পরিকল্পনার পরেও ছিল ধীর সমীর, তা, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৬৭-র পর থেকে ক্রমশ একটা পাগলা হাওয়াতে পরিণত হয়েছে। তাতে কী কতোটা ধরে রাখা হবে, কী উড়িয়ে দেওয়া হবে, মানুষ তা ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছে না। বহু শতাব্দী ধরে অকথ্য দুঃখকষ্টের সঙ্গেই মানুষের নিবিড় পরিচয় আছে। হঠাৎ "পরিকল্পিত" সুখের হাওয়া গায়ে লাগলে তাদের মনে সন্দেহ জাগে। অন্তত আদিম বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক অনিশ্চয়তা, ব্যক্তিমানুষের এবং সমাজের দোদুল্যমানতা শুধু গ্রামাঞ্চলে, কিংবা আদিবাসীদের মধ্যেই দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সংস্কৃতিতেও তা দেখা যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতার যে ক্ষেত্রসমূহ তৈরি করেছিল, কলমের আঁচড়ে সেগুলোর কিছু রইল, কিছু অপসৃত হ'ল।

ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে আসা গেল ; কিন্তু সেখানে দেখা গেল দিগন্ত ঢেকে দেওয়া ধ্বংসস্তূপ ; কবির ভাষায়, "একমাত্র বিরাট কবর, প্রান্ত থেকে প্রান্তে প্রসারিত।" মুঘল সাম্রাজ্যের অবসানেও এ অবস্থা দেখা গিয়েছিল। প্রবল সাম্রাজ্যবাদের রাহুগ্রস্ত ভারতের প্রাণশক্তি যখন প্রায় অপগত, তখনই সামনে সামনে এল নব নির্মাণের সমস্যা। দেশের কংগ্রেসি কর্ণধারগণ এ জন্য যেসব নীতি গ্রহণ করলেন, তাতে ইউরোপিয় আদর্শ উদারনীতির সঙ্গে, ধনতন্ত্রের নীতির সঙ্গে অযৌক্তিকভাবে মিশ্রিত হল সমাজবাদ ; প্রচলিত, দৃঢ়মূল দুষ্প্রতিরোধ্য ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে মিশিয়ে ফেলা হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। এ পরিকল্পনায় ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধির ভাগ ছিল কম। তাই পরিকল্পনার রূপায়ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ হল ; সেই ত্রুটি ঢাকবার জন্য হাজার হাজার রীম্ কাগজে মুদ্রিত হ'ল স্টাটিসটিক্স, যাকে বলা যায় একধরণের শাস্ত্রীয় সাংখ্যিক শ্রৌতসূত্র। বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ক্লেদ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তাকে আর এই শ্রৌতসূত্র দ্বারা ঢেকে ফেলা যাচ্ছে না। তবে এ বিশ্লেষণেও নাগরিক মধ্যবিত্তদের সাংস্কৃতিক দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'— প্রবাদটি তাঁদের অসামান্য ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। কেবলই উপর থেকে 'সংস্কার' হতে থাকলে, সে সংস্কারের অবধারিত সীমাবদ্ধতা ও অনিবার্য ব্যর্থতার জন্য, উপরের লোকরাই জনমানসে নন্দঘোষে রূপান্তরিত হন।

৬

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোক, গ্রামে বাস করলেও, নানা কারণে এবং নানাভাবে শহরের উপরে নির্ভরশীল। শহরের গুরুত্ব কেবলই বেড়ে চলেছে। নগর সংস্কৃতির আলোচনা কলকাতার প্রসঙ্গ তুলেই শুরু করতে হয় ; তার কারণ কলকাতার অনন্যতা।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে একাধিক বড় শহর আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কলকাতাই একমাত্র সর্বগ্রাসী শহর। নদী যেমন পাড় ভেঙে গ্রামাঞ্চলকে গ্রাস করে, তেমনি শহর কলকাতা সমস্ত দিকে গ্রামকে উদরস্থ করে। রাধারমণ মিত্র 'কলিকাতা দর্পণ'-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে এই 'রাক্ষুসে সহরের পশ্চাদ্‌ভূমি ক্রমশঃ অতিশয় প্রসারিত হয়ে উঠল ; কীভাবে অতিকায় অক্টোপাসের মতো রেলপথের, স্থলপথের, জলপথের, বায়ুপথের অশেষ শুঁড় বাড়িয়ে এ শহর সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব ভারতকে নিবিড় আশ্লেষে আবদ্ধ করে

রেখেছে। কেউ কেউ বলেন, কলকাতা মরতে বসেছে, মরে গেছে। "গলা শুকু শুকু আকাশ ছাই" হলেও কলকাতা মরবে? যদি মরেই গিয়ে থাকে কলকাতা, তবে কেন প্রতিদিন সমগ্র ভারত থেকে অগণিত লোক এখানে আসেন? কলকাতার জনারণ্য কেন প্রতিদিন এমন গভীর হয়ে ওঠে?

উত্তরে ক্রমবর্ধমান শিলিগুড়ি সহর, পশ্চিমে আসানসোল সহর কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। তার মাঝে কলকাতার প্রতিস্পর্ধী আর কোন বড় সহর নেই। এককালে ভাগীরথী-তীরবর্তী হুগলি-চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া সাংস্কৃতিক বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু উনিশ শতকেই এসব প্রাগাধুনিক সহর কলকাতারই দূরবর্তী অংশ হয়ে উঠেছিল। অধুনা তাদের আলাদা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য,—হয়তো ময়রার দোকানের কোন স্বাদু মিঠাই। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর গৌরবহীন হয়ে পড়ল। ঢাকার কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কৃষ্ণনগর, নদে-শান্তিপুর, বনগ্রাম, বর্ধমান, বোলপুর, এমন কী কালনা-কাটোয়া, আসানসোল থেকে মানুষজন কলকাতায় আসেন, আবার ফিরে যান। এই অশেষ, অশান্ত গতায়াত, দিনযামিনী সায়ংপ্রাত শুধু ট্রেনের খাঁচাতে শেষ হয়ে যাওয়া, মফঃস্বল সহরগুলোর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচক অর্থ বহন করে। যে অসংখ্য মানুষ সকালে কলকাতার দিকে রওনা হন, আবার সন্ধ্যায়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন, তাঁদের পক্ষে স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখা সম্ভব হয় না। গাড়িতে নববর্ষ উদ্‌যাপন, রবীন্দ্রজন্মোৎসব করা পিটুলির গোলাজল খেয়ে দুধের স্বাদ মেটান ছাড়া অন্য কিছু নয়। এককালে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, হুগলি স্থানীয় কলেজগুলোর জন্য বিখ্যাত ছিল। এই খ্যাতি এখন নেই।

গঙ্গার দুই তীরে কলকাতার উপরে নির্ভরশীল বহু শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এসব স্থানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকলেও কোন উল্লেখ্য সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ আছে কী? মফঃস্বল সহরে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় দেখা যায়, গ্রামীণ ধনীদের অথবা মধ্যবিত্তদের সন্তানরা তাতে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু এছাড়া আর অন্য কোনভাবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পড়ে কী না, তা গবেষণার বিষয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি,—মফস্বল বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক মাষ্টারমশাই আছেন, যাঁরা সেখানে অধ্যাপনা করার বিষয়টিকে নিজেদের দুরপনেয় কলঙ্ক বলে মনে করেন। সুযোগ পেলেই ফুরুৎ করে উড়ে পালান।

প্রসঙ্গত ভয়াবহ বেকার সমস্যার বিষয়টিও বিচার্য। যাবতীয় সৃষ্টিশীলতার উন্মেষের লগ্নে বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত তরুণতরুণী শিক্ষালাভ করেও কর্মহীনতার, এবং কর্মহীনতাজাত বুভুক্ষার করাল গ্রাসে পড়েন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেকারদের—হলেনই বা তাঁরা উচ্চশিক্ষিত—কী কোন অবদান রাখা সম্ভব? যেখানে লক্ষ লক্ষ তরুণতরুণী বেকার, সেখানে সংস্কৃতিবিষয়ক বাগাড়ম্বর বিড়ম্বনামাত্র। যাঁদের চেষ্টা করেও কাজকর্ম জোটে না, তাঁদের মধ্যে যদি 'অপসংস্কৃতি'র কিংবা নৈরাজ্যবাদের সংক্রাম ঘটে, তবে তার প্রতিবিধানের উপায় কী?

মফঃস্বল সহরে এবং কোন কোন বড় গ্রামে বহু রকমের পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয়, মফঃস্বলে পত্রপত্রিকার প্রকাশনের যথেষ্ট যুক্তি অথবা উপযোগিতা থাকলেও, সেখানে দারিদ্র্যকবলিত অধিকাংশ পত্রপত্রিকার মান ভাল নয়। কোথাও বা এসব পত্রপত্রিকা 'নিরপেক্ষ'; কোথাও রাজনৈতিক দলবাজির হাতিয়ার; কোথাও হলুদরঙের সংবাদে স্বাদে গন্ধে নর্দমাতুল্য। এরই মধ্যে হয়তো কোন রুচিবান সম্পাদক প্রাণপণে তাঁর প্রশংসনীয় পত্রিকাতে সৎসাহিত্য প্রকাশ করে যাচ্ছেন। অধুনা অনেক মফঃস্বল সহরে বইমেলা বসছে। তাও একটি ইতিবাচক তাৎপর্যবহ ঘটনা।

৭

ইংরেজি *Culture* শব্দটির যে সব অর্থ অভিধানে দেখা যায়, তাতে তার কোন একটি সুনির্দিষ্ট উৎসের, সুনির্দিষ্ট রূপরেখার ব্যঞ্জনা নেই।[২৩] *Culture*-এর আপেক্ষিকতাও তাতে অনুক্ত। অবশ্যই *Culture*-এর উৎস মানুষ। কিন্তু সংস্কারবান মানুষ তো বেদান্তের ব্রাহ্মণ-এর মতো বিমূর্ত, দুর্জ্ঞেয় নয়। বিশেষভাবে যখন কলকাতার মতো সুবিশাল নগরের সংস্কৃতির প্রসঙ্গ ওঠে, তখন তার কেন্দ্রবিন্দু হয় কলকাতার মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন, কলকাতার মানুষ কী শুধুই বাঙ্গালি? অথচ, কলকাতার সংস্কৃতির প্রচলিত বিবরণ ধারাতে বাঙ্গালিদেরই সীমাহীন প্রাধান্য দেখা যায়। আগে তাতে শ্বেতাঙ্গ বাদশা-বেগমদের প্রাধান্য ছিল। সাহেবরা কী করত, কী না করত,—এসব নিয়ে এখনও কৌতূহলের অন্ত নেই। পরে নানা কারণে বাঙ্গালিরা প্রাধান্য পেল। যাঁরা ঐতিহ্যসম্মত ভাবে কলকাতার মধ্যবিত্ত-বাঙ্গালি-সংস্কৃতিকেই সর্বোচ্চ সংস্কৃতিরূপে বিচার করেন, তাঁরা এখন সর্বক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিদের সামান্যতা

কিম্বা খর্বতা দেখে সর্বদা হাহুতাশ করেন। উনিশ শতকের বাঙ্গালি-রেনেসাঁসের সন্দেহজনক তত্ত্ব এই আক্ষেপ থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব বড় বড় বাঙ্গালি, বাঙ্গালিদের মৌলিক ভারতীয়তার উপরে জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু, যখনই কলকাতার সংস্কৃতির প্রসঙ্গ ওঠে, অথবা আলোচিত হয়, তখনই সুবিধা অনুসারে এই তথ্য ভুলে যাওয়া হয় যে, কলকাতায় বহু অবাঙ্গালি এবং অহিন্দু নাগরিক পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, এবং ভবিষ্যতে থাকবেন। তাঁরা উহ্য, অথবা বাহ্য। এতো বড় রঙ্গ, যাদু, এতো বড় রঙ্গ!

এই বিশাল কলকাতা সহর বাঙ্গালি ভদ্রলোকদের গর্বের সহর হলেও সেখানে 'বাঙ্গালি জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। বাঙ্গালি ভদ্রলোকরা ক্রমশ কলকাতার তটস্থ হচ্ছেন। এককালে কলকাতার যে সব অঞ্চলে 'বাবু'-কাল্চার বিকশিত হয়েছিল, সে সব অঞ্চলে এখন অবাঙ্গালিদেরই আধিপত্য দেখা যায়। প্রায় সমগ্র মধ্য কলকাতা কালোয়ার-পট্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন কোন জায়গায় বাঙ্গলা ভাষা শোনা যায় না। ওদিকে যে বাঙ্গলা ভাষা রাস্তাঘাটে, বাজারে, ট্রামে-বাসে, অফিসে আদালতে, সিনেমা হলে শুনতে হয়, তাতে থাকে পিড্‌জিন্‌-ইংরেজি [তা পূর্বেও ছিল], কিন্তু বাজারে হিন্দী; এবং বেশ কিছু পরিমাণে, জননাঙ্গব্যঞ্জক অশ্লীলতা। এই বিচিত্র পরিমণ্ডলেই বাঙ্গালি-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য গবেষিত এবং আলোচিত হয়।

কিছু লোক গোয়াবাগানের কিম্বা গর্চা লেনের বিস্তীর্ণ বস্তি দেখে কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্ষয় সম্পর্কে অবহিত হন। এঁদের মধ্যে নাক-কুঁচকানো বাঙ্গালি আছেন, অবাঙ্গালি ভারতীয় আছেন, আবার গুন্‌টার্ গ্রাসের মতো সাহেবও আছেন। কালীঘাটের কালী এবং বস্তি এখন অসভ্যতার এবং অবনতির প্রতীক রূপে জগদ্বিখ্যাত। অথচ, বস্তি যেহেতু বস্তি, তাই সেখানে শিক্ষাদীক্ষার কিংবা উচ্চ সংস্কৃতির নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও, একটি পরিস্ফুট সামাজিক জীবন আছে, কর্তব্য-অকর্তব্য কর্ম সম্পর্কে অলিখিত বিধি-নিষেধ আছে। আর আছে বস্তিতে গ্রাম থেকে আসা মানুষের গ্রামীণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। এমন কী কলকাতার তটস্থ যে সব উদ্বাস্তু-উপনিবেশ আছে, সেখানে পূর্ববঙ্গীয় জীবনধারা এবং লোকাচার এখনও অদৃশ্য হয়নি। এক উঠান বিশিষ্ট বারো ঘরের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। একথাও জোরের সঙ্গে বলা যায়

যে, উত্তর কলকাতার ভীম ঘোষ লেনের সংস্কৃতি, কিংবা রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংস্কৃতি স্বরূপতঃ ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের সংস্কৃতি থেকে, কিংবা সাদার্ণ এভেন্যুয়ের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন হ'লেও, গুণেমানে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। অথচ, যাঁরা বাঙ্গালির উচ্চ সংস্কৃতির কথা বলে এখনও আনন্দিত হন, তাঁরা কখনই বাঙ্গালির 'নিম্ন'-সংস্কৃতির কথা ভুলেও একবার ভাবেন না। তাঁদের সঙ্গে বস্তির সম্পর্ক এখন বস্তি থেকে গৃহকর্মের জন্য আসা দাসীদের সন্ধানেই সীমাবদ্ধ। দাসীদের বেতন দু'টাকা বাড়াতে হলেই ভদ্রমহিলাদের এবং ভদ্রলোকদের মস্তকে বজ্রপাত হয়। এই সীমাহীন দম্ভের জন্য, সহানুভূতির অভাবের জন্য, যেমন ব্যর্থ অনুসূচিত আদিবাসীদের উন্নয়ন প্রকল্প, তেমনি ব্যর্থ কলকাতার বস্তি-উন্নয়ন প্রকল্প। সত্য সত্যই বস্তির উন্নয়ন হ'লে ঝি যদি বাসন মাজতে না আসে!

৮

প্লেটোর *Apology*-তে সক্রাটেসের বচন উদ্ধৃত হয়েছে :

> …the life which is unexamined is
> not worth living…[২৩ক]

এরকম চিন্তা কী এখন বাঙ্গালি ভদ্রলোকদের মানসে জাগে? তা তো মনে হয় না। রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যথাসম্ভব গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের সকলকেই অল্প বিস্তর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু, প্রচলনির্ভরতাই যেখানে বহু শতাব্দের শক্তিশালী ট্রাডিশন্ সেখানে কার এমন সাধ্য যে তাকে নিশ্চিহ্ন করে? অবস্থার পরিবর্তনে ভদ্রলোকদের প্রচলনির্ভরতা কিছুটা রূপান্তরিত হয় মাত্র, নিশ্চিহ্ন হয় না। ছেলেমেয়েকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা, একটি নিরাপদ ভাল পাড়ায় ভাল ফ্ল্যাট্ বাড়িতে থাকা, একজন দীর্ঘস্থায়ী কাজের লোককে অল্প বেতনের বিনিময়ে পাওয়া,—কলকাতার সর্বত্র ভদ্রলোকদের বিচারে এগুলো পরম প্রাপ্তি। একটি রঙ্গিন টি ভি., একটি ভি. সি. আর, একটি মারুতি গাড়ি থাকলে সোনায় সোহাগা।

পুঁজিবাদীরা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার জন্য কম কষ্ট করেনি আবার উদ্বৃত্ত মূল্য বিরোধী সাম্যবাদী। সমাজবাদী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে সংগ্রামী মানুষের প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণের নজির আছে। কিন্তু এখন দেখা যায়, 'তৃতীয়'—বিশ্বের মানুষরা শোষণ এবং দুঃশাসন প্রায় মেনে নিয়েছে।

শোষণের এবং দুঃশাসনের অবসান ঘটানোর জন্য যে মানসিক এবং কায়িক শ্রম প্রয়োজনীয়, ক্লান্ত, নাবিকহীন জলযানের মতো ইতস্ততঃ ভাসমান, স্বাভাবিক কারণে শান্তির এবং স্বস্তির পক্ষপাতী তৃতীয় জগতের মানুষ সেই শ্রম আর করতে পারছে না।

এই শ্রমবিমুখতা বাঙালি ভদ্রলোকদের জীবনধারায় এবং আচার ব্যবহারে দেখা যায়। তাঁরা তেমন কিছু সুযোগ সুবিধা না পেলেও, সুযোগসুবিধা লাভের জন্য, ইন্‌কিলাবের জিগির তুলে কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া, অন্য কোন কষ্ট অথবা পরিশ্রম করতে চাইছেন না। এ ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ছাড়া অন্য পথ নেই। একদিকে সহুরে ভদ্রলোকদের প্রবহমান রক্ষণশীলতা, অন্য দিকে সুযোগের সন্ধানে প্রয়োজনে আত্মবিক্রয়। একদা বিপ্লবের কথা। কিছুকাল পরে ধর্মাশ্রমে গমন। একদিকে সতীত্ব, একগামিতা কীর্তিত। অন্যদিকে সংখ্যাতীত বিবাহবিচ্ছেদের মামলা। একদিকে প্রকাশ্যে মার্কস-কথিত দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদ-প্রশংসা। অন্যদিকে পারিবারিক ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে, অথবা ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনিশ্চয়তা বোধে, কালীপূজা, শিব-রাত্রি পালন, তারাপীঠে রাত্রিবাস, এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মদ্যপান। এ সবই গতানুগতিক।

আচারে, ব্যবহারে, দৃষ্টিভঙ্গিতে এরকমের গতানুগতিক সাংস্কৃতিক স্ববিরোধ পূর্বেও ছিল। ইদানীং তা খুব বেড়েছে। মূল্যবোধের কোন স্থায়ী রূপ নেই। গোলাম কুদ্দুসের মতে এর জন্য দায়ী স্বাধীনতার পরে বিকশিত ধনতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ। তিনি লিখেছেন ঃ[২৪]

"মূল্যের এই তরঙ্গসঙ্কুল আবর্ত লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভারত-ভূমিতে ধনতন্ত্র রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে, কেননা মূল্যই ধনতন্ত্রের নিয়ামক শক্তি। অথচ ধনতন্ত্রের যেটা প্রাণবস্তু, যার নাম উদ্বৃত্তমূল্য, তা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনার কথা শোনা যায় না, বা তার সঙ্গে অন্যান্য মূল্যের যে কী গভীর নাড়ির যোগ, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য চোখে পড়ে না"।

ধনতান্ত্রিক উদ্বৃত্তমূল্যের সঙ্গে প্রচলিত সংস্কৃতির দৃশ্য-অদৃশ্য সংযোগ সম্পর্কে একটি পূর্বপক্ষমূলক তত্ত্ব কিম্বা যুক্তি অবশ্যই উদ্‌ভাবিত হ'তে পারে। কিন্তু শুধু একটি বিশেষ অথচ প্রচলিত তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা আধুনিক কোন মূল্য বোধের ব্যাখ্যাতে অতিব্যাপ্তি দোষ থাকতে পারে। স্বাধীন ভারতে ধনতন্ত্রের জাঁকিয়ে বসার তত্ত্বটিও বিতর্কিত। অনেক মার্কসবাদী মনে করেন যে, ফিউডালিজম্‌ এখনও ভারতভূমি থেকে অপসৃত হয়নি। যদি ধরে নেওয়া

যায় যে. সত্য সত্যই স্বাধীন ভারতে ধনতন্ত্র জাঁকিয়ে বসেছে—কোন প্রাসঙ্গিক প্রমাণ উপস্থাপিত না করে গোলাম কুদ্দুস তাই ধরে নিয়েছেন—তবুও প্রশ্ন উঠবে: এ ঘটনার পূর্বে যে অতি পুরাতন, দৃঢ়মূল ঐতিহ্য আমাদের দেশে ছিল, তা কী আর নেই?

নাগরিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্ববিরোধপূর্ণ প্রবণতার কারণ, অথবা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ অন্যভাবেও নির্ণয় করা যায়। নিজেদের অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলার জন্য ভদ্রলোকসহ সব নাগরিকবর্গই এখন অত্যন্ত বস্তুবাদী। অথচ বিশেষভাবে ভদ্রলোক—বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য আধ্যাত্মিকতার এবং সদাচারের আদর্শ এখনও ঐতিহ্যসম্মত, সে ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করার উপায় নেই। ভদ্রলোকরা তাই এখন দোটানায় পড়ে, হুতোমের ভাষায় গাজি মিঞার ধ্বজার মতো এ পাশে ও পাশে দুলছেন।[২৫] ব্যক্তি-মানুষের জীবন এমন বিবিধ সমস্যা-প্রপীড়িত। একবার সহরের রাস্তায় বার হ'লে বাড়ি ফেরার নিশ্চয়তাও থাকে না। এমতাবস্থায় ভোলে বাবা ছাড়া কে আর তাঁকে উদ্ধার করবে? এই অনিশ্চয়তাবোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে সহর কলকাতার অশেষ লোকধর্ম, যা নিয়তই রাস্তায় রাস্তায়, হাটে বাজারে, পাড়ায় পাড়ায় বংশবিস্তার করে চলেছে. যাকে ভাঙিয়ে বেশ কিছু লোক, এমন কী পুলিশ পর্যন্ত, দু'পয়সা রোজগার করছে। এডওয়ার্ড শিলস্ বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকখানায় পূর্বপুরুষদের ফটো দেখে যেন কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন।[২৬] কিন্তু পূর্বপুরুষপূজনে মনটা ভাল থাকে। এটা এখনও ভদ্রতার ঐতিহ্যজাত সংস্কার। ঐতিহ্য যথাসম্ভব মেনে চললেই ভারতের মতো সুপ্রাচীন সভ্যতা-সম্পন্ন দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে দেশের সভ্যতার সঙ্গে কিছুটা আত্মিক সংযোগ রাখা সম্ভব হয়, তা না হ'লে তাঁরা তো 'বাইরের লোক' হয়ে যান।[২৭]

নীহাররঞ্জন রায় মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক সংকটের কথা লিখেছেন।[২৮] অতি-বৃদ্ধ নীরদচন্দ্র চৌধুরী সর্বদা তা নিয়ে দুঃখ এবং বিরক্তি প্রকাশ করেন।[২৮ক] কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। নীহাররঞ্জন এই সংকটের মূল দেখেছেন বাঙ্গালি মধ্যবিত্তদের ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কের পরিশীলনে; নীরদচন্দ্র তা দেখেছেন সেই সংসর্গের নিবৃত্তিতে। ইংরেজদের হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ইংরেজদের হাত থেকে হাত তুলে নিয়ে বাঙ্গালি ভদ্রলোকরা উৎসন্নে গেল কী না, তা নিয়ে সুদীর্ঘ বিতর্ক হ'তে পারে। সম্ভাব্য এই বিতর্কের সিদ্ধান্ত অনুমান করা পণ্ডশ্রম। বিশেষভাবে ইংরেজদের হাত থেকে হাত আদৌ

তোলা হয়েছে কী না, তা নিয়েও তর্ক হতে পারে। এডওয়ার্ড শিলস্ লিখেছিলেন :[২৯]

…the intellectuals of Asian and African societies have come in varying degrees…to depend for their modern cultural sustenance on the intellectual output which emarates from metropolises located outside their own countries. Asia and Africa have in consequence been pushed…into a condition of Provinciality *vis-a-vis* the great cultural capitals of the Western World London, Oxford, Cambridge. Paris, Leiden, Utrecht, Berlin, New York, etc… Preoccupation with the cultural Products of the capital, fascination by them, resentment against them, have been the concomitants of this relationship.

বিশেষভাবে মানববিদ্যার ক্ষেত্রে উপরে উক্ত 'প্রাদেশিকতা'র জন্যই মেট্রোপলিটান্ 'মডেল' নিয়ে খেলার শেষ নেই। মার্কস ও 'মডেল'। তা কিছুটা পুরাতন। তাই আধুনিক 'মডেল' লেভিস্ট্রাস্, গ্রামসি, ফুকো, ডেরিডা। আরও 'মডেল'-এর নাম করা যায়। নীহাররঞ্জন এই 'মডেল' নিয়ে খেলা করার নিন্দা করেন।[৩০] একসময় নাগরিক ভদ্রলোকদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সুচিহ্নিত প্রেক্ষিত ছিল উদারনীতিদ্বারা উদ্বোধিত দেশাত্মবোধ। ১৯৪৭-এর পর থেকে সৃষ্টির প্রেরণাদায়ী জাতীয়তাবাদ ক্ষীয়মান হ'তে থাকে। অধুনা তা ইতিহাসের পরিশিষ্ট হয়ে পড়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণে বড় বড় বাঙ্গালি ভদ্রলোকের আবির্ভাবকাল সীমা মোটামুটিভাবে ১৮০০ থেকে ১৯১৫ অথবা ১৯২০। তারপরেও ছোটখাট বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা সার্থক কিছু করার জন্য চেষ্টা করেছেন। অধুনা 'মডেল'-এর কারবারই বেশি দেখা যায়। নীহাররঞ্জন লিখেছেন :[৩১]

এই…মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই শ্রেণীর শ্রেণীনেতৃত্বে ফাটল দেখা দিতে শুরু হয়েছিল। …একান্তভাবে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৃত্তিনির্ভর যে-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী, তাঁদের সামাজিক আধিপত্য ও নেতৃত্বের বেগ ও প্রতিপত্তি কমে আসছে… তাঁদের জায়গা নিচ্ছেন…সেই কুলাক সম্প্রদায়, জোতদার গোষ্ঠি ও সম্পন্ন বর্ধিষ্ণু

কৃষক সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষুদে নায়কেরা। অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসেবে এঁরাও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক··· দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতাপূর্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও স্বাধীনতা, বিশেষভাবে জবাহরলাল নেহেরু-পরবর্তী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ দুইয়ের চেহারা ও চরিত্রে পার্থক্য দুস্তর না হ'লেও বিস্তর।

সৃষ্টির প্রবাহ কেন আগের মতো বেগবান নয়, তা নীহাররঞ্জনের এই বিশ্লেষণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য বিচার্য। সম্ভবতঃ এই কালই এমন যে, একক কোন অসাধারণ প্রতিভা এখন আর দেশের মধ্যে কোথাও একাদশকে সৃষ্টি করতে পারছে না। সৃজন এখন সামূহিক প্রচেষ্টার উপরে নির্ভরশীল। সব বিদ্যাই এখন অবিশ্বাস্যভাবে বিশিষ্টায়িত। সকল কাজের কাজী এখন দেখা যায় না। এ বিচারে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও বিশিষ্টায়িত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কখন কখন যথেষ্ট ভাল কাজ করে থাকেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অজ্ঞানতার, এবং উদ্বৃত্তমূল্যজাত 'অপসংস্কৃতি'র অন্ধকারে নিমজ্জিত—এমন ধারণা অশ্রদ্ধেয়। ব্যক্তির উন্নয়নের কথা আগে ভাবনা না করে এখন সঙ্গতকারণেই সমষ্টির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কথা ভাবা হয়। এখনও এ ভাবনা তেমন কিছু ফলপ্রসূ না হ'লেও, ভবিষ্যতে তা হবে।

৯.

এই আলোচনার আভ্যন্তরীণ যুক্তিতে বাম রাজনীতির বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বিশেষ রাজনীতির বিস্তার নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু অভিধানে কাল্‌চারের অর্থ লেখা হয়েছে জ্ঞানালোক প্রাপ্তি, সুরুচি, বুদ্ধির উৎকর্ষ, কান্তিবিদ্যার চর্চা। এ সব অর্থে বাম রাজনীতি প্রচলিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন প্রমাণিত পরিবর্ধন ঘটাতে পেরেছে কী না, সন্দেহ।

তার কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের দেশে প্রথমাবধি ব্রাহ্মণগণ, উচ্চ শূদ্রগণ, এবং অবস্থাপন্ন শিক্ষিত মুসলমানগণ সমাজবাদের এবং সমাজবাদ-ভিত্তিক বামপন্থার প্রধান আচার্য এবং প্রচারক ছিলেন।[৩২] তার ফলে প্রচলিত ভদ্রলোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অংশরূপে বিবর্ধিত বাম সংস্কৃতির পরিভাষা শাস্ত্রীয়, এবং নিরক্ষর মানুষের পক্ষে দুরধিগম্য হয়ে রইল। যাঁদের অক্ষরের সঙ্গেই পরিচয় হয়নি, তাঁরা সঙ্গত কারণেই অনেক ক্ষেত্রে রুজি-

রোজগারে সুবিধার জন্য লাল ঝাণ্ডা বহন করেন, সাংস্কৃতিক উর্ধায়নের জন্য নয়।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে বামমার্গের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুধ্যান সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে, তবে সেই অনুধ্যানের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। বামপন্থিগণ এমন বলে থাকেন যে তাঁদের সংস্কৃতি প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের বিরোধী, প্রধানত মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রধানত জনগণের মুক্তির ও মঙ্গলের তত্ত্ব থেকে উৎসারিত। এই সংস্কৃতিদর্শনে শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ে যে নঙর্থক চৈতন্য সক্রিয় থাকে, পরিণামে তাই হয়ে ওঠে উদার মানবতাবাদ, এবং সে অর্থে স্পষ্টত ইতিবাচক। শ্রেণীসংগ্রামের তাত্ত্বিক খিটিমিটি এবং কোঁদলের পরিণতির কথা ভেবে যে সব 'শান্তিপ্রিয়' জাতীয়তাবাদী এই তত্ত্বকে বাতিল করেন, তাঁরা এর ইতিবাচক মানবতাবাদের কথা ভাবতেই চান না।

অথচ, পশ্চিমবঙ্গে এই চমৎকার সংস্কৃতিদর্শন কোন কোন আদর্শবাদী ব্যক্তির উন্নত চৈতন্যে কদাচিৎ প্রতিফলিত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, কেন্দ্রীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের দুর্মর বিরোধী হলেও বামপন্থিগণ নিজেরাই দুর্লংঘ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছেন, যার আদর্শ অধুনালুপ্ত সোভিয়েট রাশিয়াতেও দেখা গিয়েছিল। অথচ, বঙ্গীয় বামপন্থিগণ বহু চেষ্টা করেও কোন ক্ষেত্রেই কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারছেন না। তাঁদের কথার সঙ্গে কর্মের আত্মীয়তা থাকছে না।

বামফ্রন্ট-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়,—বিবিধ সমস্যাপ্রপীড়িত মানুষ কার্যোদ্ধারের জন্য দুর্নীতিকে, অসভ্যতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া এখন সাধারণ ঘটনা। ফলত মার্কসবাদীরূপে পরিচিত কর্মীদের মধ্যেও কাজ করার স্পৃহা কিম্বা রুচি নেই। তার উপরে আছে নির্বাচনের তরঙ্গসঙ্কুল বৈতরণী পার হওয়ার জন্য উদ্বেগ। কর্তব্যকর্মভিত্তিক কোন সংস্কৃতি নেই। বামপন্থীরা জানেন যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে বহু দুর্লভ সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়। এখন তার উপরেই সমস্ত জোর এসে পড়ে। গোর্বাচভের উত্থানের আগে থেকেই আমাদের দেশের ভোটপ্রার্থী সাম্যবাদীগণ শ্রেণীসংগ্রামকে, বিপ্লবকে এড়িয়ে চলতে শিখেছেন। সাম্যবাদ সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, ষ্টালিন, মাও প্রভৃতি বিখ্যাত সাম্যবাদীদের কথা তুলে তুলে দুর্বোধ্য শাস্ত্র লেখা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অষ্টরম্ভা।

সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে গুরুপূজা প্রচলিত আছে। কংগ্রেসের সংস্কৃতি কখনও গুরুপূজার বিরোধী ছিল না। একদা বামপন্থিগণ সঙ্গত কারণেই এই মধ্যকালীন ঐতিহ্যের সমালোচনা করতেন। এখন তাঁরাও গুরুপূজাকে সমর্থন করেন। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গলা দেশে বহুরকমের গুরুপূজক সম্প্রদায় ছিল। সেগুলিই কী আবার 'ধর্মনিরপেক্ষ' হয়ে ফিরে এল? এখন বামপন্থী গুরুদের সংখ্যা দুর্নির্ণেয়। হাটে, বাজারে, পাড়ায়, মহল্লায় সর্বত্র এঁরা আছেন। এঁরা মার্কসবাদের নামে বিস্তীর্ণ ভাবে একটা পরজীবিতামূলক অপসংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়ে উঠেছেন।

এ বড় দুঃখের বিষয় যে, সাম্যবাদিগণ, বামপন্থিগণ এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কোন বড় রকমের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেননি। বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদী সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী বহু সুন্দর এবং তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, তাঁরা একটি রেনেসাঁস সৃষ্টি করেছেন, এমন দাবী করা যায় কী?[৩৩] বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত কাল্‌চারে মার্কসবাদীগণ নূতন কিছু ধারা আনলেন। তাতে সেই কাল্‌চার অবশ্যই বিবর্ধিত হ'ল। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদ রেনেসাঁস নিয়ে এল, এ-তত্ত্ব সম্ভবতঃ ইদানীন্তন সাংস্কৃতিক ক্ষয়ের প্রেক্ষিতে, "কী ছিলাম! কী হ'লাম!"—গোছের আর্তি প্রকাশ করে মাত্র, কোন বিতর্কাতীত ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটিত করে না। শিষ্টবর্গের অথবা এলিট্‌দের চিন্তা মার্কসবাদের দিকে মোড় নিলেই রেনেসাঁস হয় না।

এখন তো দেখা যায়, অত্যুগ্র মাওবাদী দু'একটি গোষ্ঠী, মধ্যকালীন অতীন্দ্রিয়বাদী ভক্তি সম্প্রদায়গুলোর মতো, অংশত অথবা পূর্ণভাবে বুদ্ধির এবং জ্ঞানচর্চাবিরোধী। তাঁরা আলকাৎরা দিয়ে বিদ্যালয়ের দেয়ালে বিশ্রীভাবে লিখে রাখেন:

The more you read the more you become foolish

আমাদের সৌভাগ্যবশত এ ধরনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীলতা নিতান্তই কতগুলো বিচ্ছিন্ন গুরুবাদী বামপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যতকাল পর্যন্ত আমাদের দেশে সাম্যবাদী / বামপন্থী আন্দোলন হয়েছিল, ততকাল পর্যন্ত সাম্যবাদী / বামপন্থী সৃষ্টির ধারা শুকিয়ে যায়নি। পরে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই নানাকারণে বারং বার মতবিরোধ দেখা গেল। দলের মধ্যেই নেতিবাচক দলাদলি শুরু হয়।

কেউ কেউ চলে যান সোভিয়েট দেশে। কেউ পার্টি ছেড়ে দিলেন। কেউ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এমতাবস্থায় সাম্যবাদী সংস্কৃতি কী ভাবে বিবর্ধিত হতে পারতো? এখনও সেই সংস্কৃতির অবস্থা ভাল নয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন :[৩৪]

কিন্তু অর্থনীতিবাদ এবং নিয়মতান্ত্রিকতার বালুচরে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের তরঙ্গ শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গানের শ্রেণীচেতনা বিমূর্ত মানবিকতার চরে আটকে গেল·· বিশেষ প্রবণতা আজ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে— বুর্জোয়া সংস্কৃতির ওলাবিবি রূপে।

এই মন্তব্য করা হয়েছে প্রধানত সলিল চৌধুরীর গান-সংকলনে প্রকটিত গানের চারিত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে। চারিত্রিক পরিবর্তনই তো বাঙালি-মার্কসবাদী সংস্কৃতির বিশিষ্টতা। যিনি একসময়ে লিখেছিলেন,[৩৫]

> কিড়িং কিড়িং
> সাইকেলের ঘণ্টি;
> পিঠে বন্দুক, গলায় কণ্ঠী।
> ঝোপের মধ্যে জলদি জলদি
> গা ঢাকা দে, বোনটি।
> আমার আছে লঙ্কার গুঁড়ো
> তোর রয়েছে সড়কি।
> আমাদের ভয়ডর কী?

তিনিই পাঁচ বছর পরে ঘোষণা করেন ;[৩৬]

> হেঁকে আজ বলুক সবাই
> মানুষ আমার ভাই···
> যেন কেউ মানুষ মারে না—
> ঘরে না, বাইরে না॥

মার্কসবাদে চেতনার সঙ্গে মননের প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাস্তব আন্দোলনের একটা যোগসূত্র থাকে। তাতেও চেতনার এবং মননের এবং নিদিধ্যাসনের ঊর্ধায়ন দেখা যায়। কিছু বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাঁদের সংগ্রামভূমি থেকেই গবেষণার বিষয় বার করে এনেছেন, এবং গবেষণার পদ্ধতিও সেখানে জেনেছেন। মার্কসবাদের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।[৩৬ক] আমাদের দেশে এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত বেশি নেই। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, আমাদের দেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের মার্কসবাদের প্রতি নিষ্ঠা তাঁদের তরুণ বয়সে

যতোটা দৃঢ় থাকে, বয়স বাড়লে আর ততোটা দৃঢ় থাকে না। তারুণ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, প্রৌঢ়ত্বে, এবং বার্ধক্যে, নানাকারণে, সেই উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে না। ক্রমশ তাঁদের মানসে মার্কসিয় দর্শন অন্যান্য দর্শন দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদী সাহিত্যের প্রচারের ক্ষেত্রেও বহু সমস্যা পূর্বে ছিল, এখনও আছে। একটি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :[৩৭]

মধ্যবিত্ত সমাজের কমিউনিস্ট কর্মী ও [সাহিত্যিকগণ]...ব্যাপক শ্রমজীবী সাধারণের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের প্রায় অসম্ভব প্রচেষ্টায় যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায়...নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন. তা রাজনৈতিক স্তরে দুঃসাহসিক হলেও, সাহিত্যিক মানদণ্ডে সেগুলো অনেক সময় উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি। আসলে, ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে নানাধরণের রুচি-অভিরুচির সহাবস্থান বিদ্যমান থাকাও সম্ভবপর। একমাত্রিক বা One-dimensional সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে কেউ চায় না।

এই আলোচনা আর বড় করে লাভ নেই। দু'একটি কথা লিখে এখন 'উপসংহার'ই বাঞ্ছনীয়।

এমন নয় যে, আমাদের দেশের সাম্যবাদী / বামপন্থীদের কোন উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনা নেই। এমনও নয় যে, সাম্যবাদী পথে / বামমার্গে এখন সৎ এবং সংস্কৃতিবান, বিদ্বান এবং প্রজ্ঞাবান বাঙালি বিচরণ করেন না। এমনও নয় যে, সোভিয়েট রাশিয়া ভেঙে যাবার পরে মার্কসবাদ / সমাজবাদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রের এবং 'খোলা' বাজারের সমর্থক ফ্রান্সিস্ ফুকুয়ামা ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে বলে যতই বই লিখুন না কেন, ইতিহাসের অগ্রগতি তো রুদ্ধ হয় না। প্রচারের দ্বারাও মার্কসবাদকে মেরে ফেলা যায় না।

কিন্তু, যদি এমন হয় যে, সাম্যবাদী বামপন্থাতে লম্বাচওড়া কথাই বেশি থাকে, কাজ কম হয়; যদি এমন হয় যে, যে গভীর আদর্শবোধ, মানবতা, নিষ্ঠা, সততা, এবং কর্মক্ষমতা থাকলে, বামপন্থী সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক চেতনা দৃঢ়মূল হয়, তার অভাব ঘটে, তবে তো সাম্যবাদ / বামপন্থাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সাম্যবাদী / বামপন্থীদের এখন নূতনভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। তা না করা হলে, শুধু তত্ত্বকথার সাবান মেখে

মনের ময়লা দূর করা ছাড়া শুধু ভাষণে ও জিগিরে আর কিছু হবে বলে মনে হয় না।

তথ্যনির্দেশ

১. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় "মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ", 'অনুষ্টুপ', চতুর্থ সংখ্যা (১৯৯১), পৃ ১৯০।

২. দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'পল্লীচিত্র' (আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮১ সং), পৃ. ২৩।

৩. প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মার্কসবাদী পথ' (প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৮১), পৃ. ৭ ; এখানে প্রকাশিত, বিপ্লব দাশগুপ্ত, "গ্রামোন্নয়ন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম". পৃ. ৪০-৪৫।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ", সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত/সমাজচিন্তা/রবীন্দ্ররচনা-সংকলন' [গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১৯৮৫], পৃ. ৯৮, ১২৩।

৫, তদেব, ভূমিকা, পৃ. ৪৭।

৬. নির্মলকুমার বসু, "ভারতের গ্রামজীবন", 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা', বর্ষ ৬৮, ১৯৬১, সংখ্যা ১-৪ : পৃ ৪-সংলগ্ন মানচিত্র ; নির্মলকুমার বসু, "ভাঙ্গাগড়া", 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ৯৫-৯৮ ; বিক্রমকেশরী রায়বর্মণ, "অশান্ত বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা", 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ১১৩-১২৩।

৭. দ্রষ্টব্য : Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State* [New left Books, London, 1974] ; Lawrence Krader, *The Asiatic Mode of Production* (Assen : Van Gojecum, 1975) ; Marian Sawyer, *Marxism And the Asiatic Mode of Production* (Martinus Nijhoff, the Hague, 1977) ; Diptendra Banerjee, "Marx and 'original' Form of India's Village Community" in Diptendra Banerjee (ed) *Marxism Theory and the Third World* (Sage. New Delhi, 1985) ; Diptendra Banerjee, "Marx, Kovalevsky and Precolonial India". *Social Science Probings*, Vol. 3, Number 3, September 1986.

৮. আবুল বাশার, "গ্রাম বাংলা ও জেট বিমান", 'দেশ', ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০, পৃ. ২৬-৩১।

৯. প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, "মার্কস-এর দিকে", 'বারোমাস', শারদীয়, ১৯৮৭, পৃ. ২৩-৩৯।

১০. অশোক মিত্র সম্পাদিত, 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা' (The Manager of Publications, Government of India, Delhi, 1969-1982), পাঁচখণ্ড।

১১. তদেব, তৃতীয় খণ্ড (১৯৭১), ভূমিকা, পৃ. ১৯-২০, মূলগ্রন্থ, পৃ. ১৩৬।

১২. M N. Srinivas, *Social Change in Modern India* (Orient Longman, reprint, 1982) : "Sanskritization", pp. 1-45.

১৩. [বাংলা ভাষায় রচিত], ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন, "বাংলা দেশের মন্দির", 'কৌশিকী', বৈশাখ, ১৩৭০, পৃ. ১৭-৩২ ; এবং, David McCutction, *Late Mediaeval Temples of Bengal : Origins and Classification* (Asiatic Society, Calcutta),

১৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত' (বিশ্বভারতী, ১৯৭৬), পৃ. ৩৯।

১৫. 'গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা', (সন ১৩৯৯), দ্রষ্টব্য, "ব্রতপ্রকরণ"। McKim Marriott, "Little Communities in an Indigenous Civilization", in Charles Leslie (ed.) *Anthropology of Folk Religion* (Vintage Books, New York, 1 60), pp. 169-218.

১৬. নির্মলকুমার বসু, "ভারতের গ্রামজীবন", প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

১৭. আবুল বাশার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১৮. আবুল বাশার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১৯. প্রবোধকুমার ভৌমিক, "ভূমিকা", ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড' (সুবর্ণরেখা, ১৯৮৭), পৃ. দশ।

২০ M. N. Srinivas, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২১. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

২২. তদেব, পৃ. ৫১, ৬৫, ৮১, ৯৬, ১১৩, ১৩২, ১৫৪, ১৬৮, ২০৫।

২২. *Webster's Seventh New Collegiate Dictionary* (Calcutta, 1967), P. 202.

২৩ক. স্মরণীয়, বিষ্ণু দে, "শিখণ্ডীর গান", 'প্লেটো তো পড়েছি. তবু / বুঝিনি কো স্বরেশের / মানসজীবন ।'

২৪. গোলাম কুদ্দুস. "নৈতিক মূল্যবোধও উদ্বৃত্ত ও মূল্য", 'হুগলি মহসিন কলেজ সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ' (১৯৮৬), পৃ. ৬৩-৭৪, পৃ. ৬৩ ।

২৫. জবাহরলাল নেহেরু এরকমভাবে দোদুল্যমান ছিলেন ; তিনি লিখেছেনঃ "I have become a queer mixture of the East and West, out of place everywhere, at home nowhere." J. L. Nehru, *An Autobiography* (London, 1936), pp. 597-98.

২৬. Edward Shils, *The Intellectual Between Tradition And Modernity : The Indian Situation* (Mouton, The Hague, 1961), P. 40.

২৭. Hamdi Bey, "The Indian Intelligentsia and the Modern World", *New World Writing*, No. 3, 1953, pp. 213-217 ; Dhurjatiprasad Mukherji, "The Intellectuals in India" *Confluence*. 1956, pp. 443-455.

২৮. নীহাররঞ্জন রায়, "মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট, আর একটি দিক", 'আনন্দবাজার পত্রিকা', পূজা সংখ্যা, ১৩৮৭, পৃ. ২৩-২৮ ।

২৮ক. Nirad C. Chaudhuri, *Thy Hand Great Anarch* : India 1921-1952 (Chtto and Windus, London, 1987), Introduction, P. XV : "By the nineteen-thirties I had fully realized there was no future for the Bengal People and their Culture".

২৯. Edward Shils, প্রাগুক্ত, P. 11.

৩০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬ ।

৩১. তদেব, পৃ ২৮ ।

৩২. সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা' ২ খণ্ড (১৯৮৫, ১৯৮৬) : এই দুই খণ্ডে যে বহু নাম আছে, তার প্রায় সবই বাঙালি/অবাঙালি হিন্দু/মুসলমান ভদ্রলোকদের নাম। আরও দ্রষ্টব্য, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : অতীত প্রসঙ্গ' (নতুন চিঠি প্রকাশনা, বর্ধমান, ১৯৯১), নাম নির্দেশিকা, পৃ. ৪৫৩-৪৬৪ ।

৩৩. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, "চল্লিশের দশক : অন্য একটি রেনেসাঁস", 'অনুষ্টুপ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩-৫২৫। প্রবন্ধটি সুবিস্তৃত গবেষণার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

৩৪. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, "সলিলের গান", দীপা মুখোপাধ্যায়, সুহাস চৌধুরী সম্পাদিত. 'সলিল চৌধুরীর গান' [সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭৫), পৃ. ৪-৮, পৃ. ৬।

৩৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, "বোনটি", 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৩৮৭, পৃ. ৪৯।

৩৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, "ঘরে না বাইরে না", 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৩৯২, পৃ. ২১৯।

৩৬ক. দ্রষ্টব্য : *Visions of History ; Interviews With* E. P. *Tompson, Eric Hobsbawm and others*, by MARHO (Manchester University Press, 1983)

৩৭. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা প্রগতিশীল সাহিত্য : দুই যুগের খতিয়ান", 'অনুষ্টুপ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

আধুনিক গান

অনন্তকুমার চক্রবর্তী

আধুনিক গান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সত্যিই অতি দুরূহ কাজ। বর্তমান লেখকের পক্ষে তা অসম্ভব। এর কারণ নানাবিধ। প্রথমত, যদিও বলা হচ্ছে গানগুলি 'আধুনিক', তবু দীর্ঘ অনেকগুলি বছর ধরে এগুলি রচিত হচ্ছে, স্বরারোপিত হচ্ছে, গাওয়া হচ্ছে, রেকর্ড বা ক্যাসেটে ধৃত হচ্ছে, প্রচারিত হচ্ছে। অসংখ্য গান, বহু সংখ্যক গীতিকার ও সুরকার এবং গায়ক-গায়িকা—কে তার 'হিসেব রাখে' আর, 'সৃষ্টি' যেমন বিপুল, বিস্মৃতিও প্রায় সমপরিমাণ। আগেকার দিনে বিভিন্ন সিনেমার সচিত্র কাহিনীপুস্তিকা প্রকাশিত হতো, তাতে গানগুলি সবই ছাপানো থাকতো—সঙ্গে গীতিকার সুরকার এবং গায়ক-গায়িকাদের নামও। আজকাল সে ধরণের পুস্তিকা আর চোখে পড়ে না—থাকলেও বর্তমান লেখকের তা জানা নেই। গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডের তালিকা আজকাল খুবই দুষ্প্রাপ্য। আর ব্যক্তিগত অজুহাত যদি মার্জনা করেন তবে বলতে পারি, আধুনিক গান শুনি বটে, কেন না রেডিও—টিভি আর মাইকের কল্যাণে শুনতে আমি বাধ্য, কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করার কোনো আগ্রহই বোধ করি না। তবে বিরাগ আমার যতোই প্রবল হোক, আগ্রহী শ্রোতার সংখ্যা যে বিপুল এবং ঐ সব গানের সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক প্রভাবও যে সুদূরপ্রসারী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক একটি গান ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু গানের সামগ্রিক ধারাটি আজও অব্যাহত। এ-অবস্থায় এ-দেশেরই একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে কিন্তু সাধারণ বক্তব্য ও মতামত প্রকাশ করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আমার সাধ্যের বাইরে।

কিন্তু প্রথমেই সমস্যা, আধুনিক গান কাকে বলবো? প্রশ্নটিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 'আধুনিক' গান কাকে বলা হয়ে থাকে আর 'আধুনিক' গান কাকে বলা উচিত। যে গান টাটকা টাটকা রচিত ও প্রচারিত হচ্ছে ত-ই কি আধুনিক? অবশ্য কতকগুলি গানকে আমাদের গণনা থেকে বাদ দিতেই

হয়—যেগুলি বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত, যেমন রাগপ্রধান, ভজন, ভক্তিগীতি, কাওয়ালি, দাদরা, গজল, বিভিন্ন ধরনের পল্লীগীতি ইত্যাদি। যাকে, গণসংগীত বলে চিহ্নিত করা, হয় সেগুলি হয়তো আধুনিকেরই এক বিশিষ্ট প্রজাতি—যা সাধারণত সমবেত কণ্ঠেই গাওয়া হয়ে থাকে। অন্যবিধ আধুনিক গান প্রায়শ একক কণ্ঠের গান; কখনো-সখনো দ্বৈত কণ্ঠের ও—সমবেত কণ্ঠেও কিছু কিছু গান শোনা যায়।

কোন্ কালব্যাপ্তিকে আমরা আধুনিক কাল বলে চিহ্নিত করবো? গত দশ বছর, না বিশ-পঁচিশ বছর, না পঞ্চাশ-ষাট বছর? আমাদের শৈশবে যে "আধুনিক" গান প্রচলিত ছিল সে তো অন্তত পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগেকার বস্তু—রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত। অবশ্য এই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে আধুনিক গানের যথেষ্ট চেহারা বদল হয়েছে—প্রকরণ ও মেজাজেরও পরিবর্তন হয়েছে, শ্রোতাদের সংখ্যা এবং চেহারা অনেক বদলেছে, তবে একটা ধারাবাহিকতার ক্ষীণ সূত্রও হয়তো লক্ষ্য করা যাবে। তাই বিগত পঞ্চাশ বছরকে মোটামুটি আধাআধি ভাগ করে দেখালে প্রবণতাগুলি কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে, যদিও শেষ পঁচিশ বছরই আমাদের প্রধান বিবেচ্য। এই সময়সীমার মধ্যে যে সব গান রচিত হয়েছে এবং যেগুলি কোনো বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত নয় তাদেরই সাধারণত আধুনিক গান বলে ধরা হয়ে থাকে।

স্বীকার করতেই হবে যে এভাবে দেখলে আধুনিক গানের পরিচয় একান্তই নেতিবাচক হয়ে পড়ে। আধুনিক গানের কি কোনো বিষয়গত, প্রকরণগত বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নেই? —হয়তো আছে এবং সেটা আমরা একটু পরে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো। কিন্তু আপাতত বলতে পারি, 'আধুনিক' গানের সঙ্গে আমাদের আধুনিক অস্তিত্বের কিছু সম্পর্ক থাকাই বোধ হয় প্রত্যাশিত। আধুনিকতার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা আমাদের জানা নেই। শুধু এটুকুই বোধহয় বলা যেতে পারে, আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে উঠে আসা অনেকগুলি উপলব্ধি—অনেক দুঃখ আনন্দ সংঘাত ক্ষোভ—সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত—এদের প্রকাশ করতে গিয়েই আধুনিক শিল্প আধুনিক হয়ে ওঠে। যেহেতু উপলব্ধিগুলি তীব্র অথচ আধুনিক সেহেতু শিল্পের চিরাচরিত ফর্মে তাদের আর কুলোয় না, তখন নতুন ফর্মের সন্ধান করতে হয়—আধারের রূপান্তর প্রয়োজন হয়। হয়তো এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় উপলব্ধিরও কিছু পরিবর্তন হয়, কন্‌টেন্টেরও প্রসারলাভ ঘটে। 'আধুনিকতা' বলতে আমরা মোটামুটি এই জিনিসকেই বোঝাতে চাই—কোনো ঔচিত্যের ফতোয়া জারি

করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পীই কোনো-না-কোনো-ভাবে আধুনিক।

গানের ক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্রনাথই আজ পর্যন্ত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আধুনিক'। তাঁর অল্পবয়সের গীতিনাট্যগুলি ছিল তখনকার দিনে কন্‌টেন্ট ও ফর্মের দিক থেকে আধুনিকতার এক মস্ত পরীক্ষা। তাঁরই হাত দিয়ে প্রচলিত ধারার ব্রহ্মসংগীতগুলি ক্রমশ পূজার গানে রূপান্তরিত হলো। তাঁর প্রকৃতির গানে উঠে এলো নানা মানবিক উপলব্ধিরও সূক্ষ্ম অথচ ঐশ্বর্যময় রূপ। এদেশের বর্ষা ঋতুকে তো আমরা তাঁর গানেই নতুন করে চিনলুম। প্রেমেরই বা কী বিচিত্র প্রকাশ—কখনো সে আসে নিঃশব্দ চরণে, কখনো নিভৃত প্রতীক্ষায় বিস্ময় আকারে, কখনো বিদ্রোহের মহাসমারোহে। তাঁর গানে প্রেমের অর্থই বদলে গেলো : 'তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্যপর্বত'। এমন কি স্বদেশী গানেও স্বদেশ হয়ে গেলো এক নতুন 'আলো' যা আমাদের জীবনমরণ ব্যাপ্ত করে নতুন মহিমায় দীপ্তিমান। আসলে তাঁর গান মানুষকেই মানুষ হিসেবে বদলে দেয়, তাকে মহত্তর করে। তাঁর গানে আছে জীবন শুকিয়ে যাওয়ার সুতীব্র উপলব্ধি, ঘরভরা শূন্যতা, সুখের গ্লানির অসহনীয়তা, অন্তহীন বিরহ, সঙ্গে সঙ্গে সকল লাঞ্ছনা মুছিয়ে দেওয়া জোয়ারের জলস্রোত। তাঁর শেষ নৃত্যনাট্য দুটি তো আমাদের সভ্যতার সংকটেরই এক আশ্চর্য রূপক আর তার গানগুলি নাট্যধর্মী গতিশীলতার নতুন দিগন্ত। টেকনিকের নব নব উন্মোচনের যেন শেষ নেই অথচ দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে যুক্ত।

অবশ্যই বলতে হবে এই আধুনিকতা এদেশের মহত্তম শিল্পীর মহত্তম দান—অন্যের কাছ থেকে তা প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-নজরুল—প্রত্যেকেই তাঁদের আধুনিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক গানগুলি সম্মেলক গানের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, কিছু কিছু পাশ্চাত্য ভঙ্গি তাঁর গানের মধ্যে নতুন শক্তি ও ওজঃ গুণের সঞ্চার করেছে যা আমাদের এতোদিন অজ্ঞাত ছিল। তাঁর হাসির গানের আশ্চর্য নির্মাণকৌশল আর তাঁর টপ্‌-খেয়াল ভঙ্গিম গানের দীর্ঘায়ত চলন আজও অন্যের অনায়ত্ত। অতুলপ্রসাদ প্রচলিত রাগরাগিণী ও অন্য দেশী সুর আশ্রয় করেও স্বকীয় বিন্যাসের গুণে সৃষ্টি করলেন নতুন বেদনার আর্তি। আর নজরুলের গানে একদিকে পেলুম সংগ্রামের অগ্নিস্রাবী জৌলুস, মার্চিং-এর দৃপ্ত ভঙ্গি, অন্য-

দিকে প্রণয়ের গজলভঙ্গিম লাস্য। বিভিন্ন রাগরাগিণী নিয়ে তাঁর শেষের দিকের পরীক্ষা হয়তো খুব একটা পরিণতি লাভ করেনি এবং সৃষ্টির প্রাচুর্য সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধি যেন কিছুটা অগভীর—ফরমায়েশের দাবিও অত্যন্ত প্রবল।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ কোনোদিনই আমাদের গানের ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেন নি—হয়তো যথোপযুক্ত প্রচারের অভাবে। অবশ্য আমাদের পরিচিত 'বন্যাত্রাণ'-এর সুরকে যদি ডি. এল. রায়ের সুর বলে ধরা হয় তা হলে ভিন্ন কথা, কিন্তু তাঁর গান প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্য জিনিস। তথা কথিত আধুনিক গানের সূচনাপর্বে হয়তো রবীন্দ্রনাথের একটা অক্ষম অনুকরণের চেষ্টা ছিল তার বহিরঙ্গিক সারল্যের কারণে, কিন্তু এই সারল্য যে গভীর অনুশীলন ও সূক্ষ্ম সংবেদনের ফসল তা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করা যে কোনো গীতিকার ও সুরকারের পক্ষেই ছিল সাধ্যাতীত। তা ছাড়া একটা রাবীন্দ্রিক পরিবেশ আর সাধারণ শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবেশে ছিল দুস্তর ব্যবধান—এখানেই আমাদের গোটা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা। (দেখা যাচ্ছে, 'ফিল্টার ডাউন' তত্ত্ব কোনো দিক থেকেই কার্যকর হওয়ার নয়)। ফলত নজরুলের অপেক্ষাকৃত চটুল কাব্যগীতিই ছিল চল্লিশের দশক থেকে আমাদের বাংলা আধুনিক গানের একটা প্রধান প্রেরণাস্থল। বাইরের দিক থেকে তাগিদ আসছিল সিনেমা রেডিও এবং গ্রামোফোন কোম্পানির কাছ থেকে—নজরুলের নিজেরও ওপর এই তাগিদ বিশেষ কার্যকর ছিল। সুকণ্ঠ গায়ক গায়িকাদের তখন অভাব ছিল না—আজও হয়তো তেমন নেই। পুরুষদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, শচীনদেব বর্মন, কে. মল্লিক, চিত্তরঞ্জন রায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সত্য চৌধুরী, রবীন মজুমদার। মেয়েদের মধ্যে ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া, সুপ্রভা সরকার, কানন দেবী—কতো নাম বলবো, বহু উল্লেখযোগ্য নাম বাদ গেলো, নতমস্তকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এঁদের কণ্ঠের সম্পদে গানগুলি বেশ মনোগ্রাহী হতো। এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন যে, পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত গোটা যুগটা ছিল আধুনিক গানের স্বর্ণযুগ। কিন্তু তবু রচনার দিক থেকে সৃজনশীলতার প্রতিশ্রুতি তখনই ছিল বেশ সীমাবদ্ধ। প্রায়ই শোনা যেতো প্রচলিত রাগরাগিণী বা পল্লীসুরের রাস্তায় না গিয়ে অন্যবিধ একটা সুরের নকশা গড়ে তোলার চেষ্টা। কাজটা নিশ্চয়ই একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু কতো দূর তা যেতে পারে? কখনো

কখনো শচীন দেব বর্মণ প্রভৃতির কণ্ঠে কিছু পল্লীসুরের আমেজ আসতো, কখনো বা কিছুটা ঠুংরি চালের গান। আমাদের শৈশবে শোনা পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে একটি গান 'ও কেন গেলো চলে' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল তার সুরের অভিনবত্বে, কিন্তু তার অভ্যন্তরে ছিল কাফি রাগের আভাস—বিন্যাসে কিছু নতুনত্ব। পাশ্চাত্য সংগীতের স্বরবিন্যাসরীতি ইতিপূর্বে আমরা অল্পস্বল্প লক্ষ্য করেছিলুম রবীন্দ্রনাথের কিছু গানে এবং কিছুটা দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্ম-বোধক গানেও। কিন্তু আধুনিক গানে তার প্রয়োগ, যতোদূর মনে পড়ে, প্রথম লক্ষ্য করি পঙ্কজ মল্লিকেরই গাওয়া একটি ফিল্‌মী গানে—গানটি হলো 'চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে'। এর অংশবিশেষ এই রকম :

— সা গা পা | র্সা — — — | নি ধা পা গা | ধা — — — |
০ নি য়ে গে লো ০ ০ ০ ক তো ই আ লো ০ ০ ০

পা গা রে সা | গা — — — | — — — — — —পা — — |
ক তো ই ছা য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নি লো ০

— প্‌া ধ্‌া নি্‌ | সা — — — | — ধ্‌া নি্‌ সা | গা — — — |
০ কা নে কা নে ০ ০ ০ ০ গ কা না মে র্ ০ ৫

— নি্‌ সা রে | পা — সা রে | নি্‌ সা — — | — — — — |
০ ম নে ম নে ০ রা খা মা য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০

এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, প্রথমত এর কথায় খুব একটা নতুনত্ব না থাকলেও কিছুটা কাব্যগুণ আছে এবং তা বিশেষ মুহূর্তের মনোভাবের সঙ্গেও বেশ মেলে। দ্বিতীয়ত, সুরে সা গা পা র্সা জাতীয় স্বরবিন্যাস, গা থেকে ধা তে উল্লম্ফন এবং মধ্য সপ্তকের গা থেকে একেবারে মন্দ্র সপ্তকের পা-তে নেমে আসা—এ-ধরনের কাজ অভ্যস্ত কানে সত্যি নতুন। তৃতীয়ত, এই পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গে দেশি চলনকে একই গানে মিশ্রিত করতে পারা যথেষ্ট শিল্পকুশলতার পরিচায়ক। এ-রকম চেষ্টা পরে আর কখনো দেখা যায় নি মনে হয়—গেলেও বর্তমান লেখকের তা জানার বা স্মরণের বাইরে। পরবর্তীকালে সুগায়ক-সুগায়িকার খুব একটা অভাব হয় নি, কিন্তু আমাদের যাত্রা, বলতেই হবে, কি কথায় কি সুরে, অর্থাৎ কম্পোজিশনের সকল বিভাগে, ক্রমাগতই নিম্নাভিমুখী। বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়ার উপায় নেই, সব মনে আনাও কঠিন—এবং পীড়াদায়ক। একটা ছোট্ট তুলনা এখানে উপস্থিত করছি। বিখ্যাত কুন্দনলাল সায়গল কোনো এক সিনেমায় গেয়েছিলেন একটি গান—জীবনের ব্যর্থতার গান—যার প্রথম দুটি লাইন :

মৈত্র, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী—সকলেই ছিলেন কমবেশি শক্তিমান রচয়িতা। একদিকে নানা পল্লীসুর অবলম্বনে জনগণের আশা-আকাঙ্খার অনাড়ম্বর প্রকাশ অথবা তৎকালীন শাসককুলের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। অন্য দিকে কিছু পাশ্চাত্য রীতিতে একটু উচ্চকিত তালের ঝোঁকে ঝোঁকে কাটা-কাটা ভঙ্গিতে শৌর্যময় প্রগতির আহ্বান।' জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'এসো মুক্ত করো' আজও গণসংগীতের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে। তাঁর 'নবজীবনের গান' একদিকে ছিল কিছুটা রবীন্দ্র-প্রভাবিত, অন্যদিকে কিছু খানদানি রাগরাগিণীকেও তিনি কিছুটা সরলীকরণের মধ্য দিয়ে পথে নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, যার সাফল্য ও সম্ভাবনা ছিল বিস্ময়কর। এ-ছাড়াও 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে' জাতীয় গান অভিজ্ঞতায়, মেজাজে, স্বাদে, প্রকরণে সত্যিই ছিল নতুন। তারপর আস্তে আস্তে ভাঁটার টান প্রবল হতে থাকায় মনে হলো নতুন প্রয়াসের মধ্যে যতোটা অভিনবত্ব ছিল, উপলব্ধি সামগ্রিকভাবে হয়তো ততোটা গভীর ছিল না। বিনয় রায় হলেন মস্কোবাসী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র দীর্ঘকাল রইলেন দিল্লি-প্রবাসে, যদিও সেখানেও তিনি কিছু ভালো সুর রচনা করেছেন বলে শুনেছি, আর সলিল চৌধুরী সাড়া দিলেন বম্বের হাতছানিতে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস অবশ্য কিছু কিছু সময়ের ব্যবধানে কখনো দেশি পল্লীসুঁরের ভঙ্গিতে, কখনো কিছুটা বিদেশি ভঙ্গিতে, গণসংগীত রচনা করে গেছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। পরেশ ধর আজ বিস্মৃতপ্রায়। বাকি যাঁরা রইলেন তাঁদের ক্ষমতা প্রায়শ অতি সীমিত, গানের বিষয় বৈশিষ্ট্যহীন—প্রায় সবটাই একটা প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত—সঙ্গে বেশ কিছু ম্যানারিজম্। সুরে হয় থাকে লোক-সুরের অক্ষম অথবা যান্ত্রিক অনুকরণ, নতুবা কিছু সস্তা বিদেশী চালে কতকগুলি বহু-ব্যবহৃত শব্দের কাটাকাটা উচ্চারণ, সঙ্গে উচ্চকিত তালের ঝোঁকে ঝোঁকে প্রবল মাথা-হাত নাড়া। নতুন গণসংগীতের প্রায়শ আর কোনো নিজস্ব শিল্পমূল্য নেই, এ কেবল রাজনৈতিক সভাসমিতির প্রারম্ভিক কালহরণক্রিয়া মাত্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-লাভের পর দেখেছিলুম এ-পার বাংলার গণশিল্পীরাও 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাইছেন, কিন্তু ঐ গানের খাঁজে খাঁজে স্বয়ং রচয়িতা বাউল গানের যে সব খোঁচ খাঁচ অনায়াসে ব্যবহার করে গেছেন শিল্পীদের গলায় তা তেমন ফুটছে না যেহেতু তাঁদের কণ্ঠ একটা বিশেষ লাইনে চলতেই অভ্যস্ত। সামান্য একটু-আধটু ব্যতিক্রম ছাড়া কথা সুর কণ্ঠ সব ক্ষেত্রে দৈন্য অতি শোচনীয়। তবু তো তাঁরা স্বাভাবিক

কারণেই আধুনিক কর্মাশিয়ালিজম্-এর শিকার নন। কিন্তু কমার্শিয়ালিজম্ তো ভালো রচয়িতা বা কণ্ঠশিল্পীকে কমার্শিয়ালিজম্-এর রাস্তাতেই টেনে নিয়ে যাবে—সেটাই স্বাভাবিক। যাঁরা তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন তাঁরা নিশ্চয়ই আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, কিন্তু শিল্পী হিসেবে প্রায়ই তাঁরা অতিশয় ক্ষীণপ্রাণ।

অন্যান্য আধুনিক গানের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার অনেকেই লক্ষ্য করেছেন: গীতিকাররা আজকাল আর সুরকার নন, সুরকাররাও গীতিকার নন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্তের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা ভাবাই যেতো না। নজরুলের ক্ষেত্রে সামান্য কয়েকটি গানে ভিন্ন সুরকারের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু তেমন গানের সংখ্যা খুবই সামান্য। অজয় ভট্টাচার্য সুরকার ছিলেন না, অনিল বাগচীও সম্ভবত গীতিকার ছিলেন না। তারপর ঐ বিচ্ছেদটাই আজকাল প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গীতিকার ও সুরকার এই উভয় ক্ষেত্রে শিল্পগত অভিপ্রায়টি ভিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। অন্ততপক্ষে উভয়কে মেলানো একটা কঠিন সমস্যা।[১] অথবা কাজটা একান্ত যান্ত্রিক হয়ে পড়তে পারে। কথাকার ও সুরকারের এই বিচ্ছেদকে যদি স্পেশালাইজেশনের লক্ষণ বলেই ধরা যায় তবু এতে আমরা কোনো দিক থেকে খুব লাভবান হয়েছি মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের পর আর কোনো বড়ো কবি গান রচনায় এগিয়ে আসেন নি। আধুনিক কবিতাও ক্রমশ লিরিক্যাল ধর্ম ত্যাগ করে বরং চিত্রময়তার দিকে ঝুঁকছে। 'চিত্রকল্প'-এর ভাষা তো চিত্রধর্মী হবেই। হয়তো আধুনিক কবিদের যা বলার কথা তাকে ছোট্ট একটি গানের পরিমিত পরিসরে ঠিক কুলোয় না এবং মিল ও স্তবকবিন্যাস সংক্রান্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যে তাঁরা তেমন স্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব করেন না, ফলে তাঁরা ওদিকটায় তেমন ঘেঁসেন না। কার্যত গানের লিরিক ক্ষেত্রটা আজকাল ছেড়ে দেওয়া আছে কিছু অপ্রধান, এমন কি অক্ষম, কবিদের হাতে। অন্যদিকে সুরকাররাও এদেশিয় 'মেলডি' এবং তালাধ্যানের সুবিশাল ঐতিহ্য বিষয়ে দিন দিন ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে পড়ছেন, জনগণের সঙ্গে যেটা সত্যিকার

---

১. সত্যজিৎ রায় তাঁর গুপী-বাঘা ফিল্ম দুটিতে (এবং তাঁর পুত্রের পরিচালিত তৃতীয় ফিল্মটিতেও) যুগপৎ গীতিকার ও সুরকারের কাজ হাতে নিয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণেও যে অন্যথায় তাঁর ফিল্মিক অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করা কঠিন হতো। যোগ্যতার প্রশ্ন তো ছিলই।

সাংগীতিক যোগসূত্র তা ক্রমশ তাঁরা হারিয়ে বসছেন। ফলে সামর্থ্য অতিশয় ক্ষীণ, চেষ্টা প্রায়শ তাৎপর্যহীন, সুরের সাধনাও উপেক্ষিত।

কয়েক বছর আগে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান আলোচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেখানে বলা হয়েছে[২] :

> "…আজ যদি আধুনিক বাংলা গান শিক্ষিত রুচির পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য না হয়ে থাকে, তবে তার প্রধান কারণ ভাষার দৈন্য, সুরকার যেখানে গীতিকার নন, গীতিকার যেখানে কবি নন, নেহাতই ফরমাইশি লিরিক রচনার ভাড়াটে লেখক, সেখানে কথাপ্রধান গানের কথা অকথ্য হলে অবাক হবার কারণ নেই। আধুনিক বাংলা গানে রবীন্দ্রসংগীতের মতোই কথার গুরুত্ব বেশি, শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে উভয়ের পার্থক্য এখানে, কিন্তু আধুনিক গানে কথার গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও কথার অন্তর্নিহিত গুরুত্বের প্রয়োজন ক্রমশই কমে আসছে, এ এক সাংস্কৃতিক সংকটের লক্ষণ।"

লেখকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান লেখক মোটের ওপর একমত। কিন্তু আপত্তি একটি বিশেষ জায়গায় : 'কথাপ্রধান গান'। সে জিনিসটি কী? কথাপ্রধান গানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে পাঁচালীতে, কিছু ছড়ার গানে এবং ব্যালাড-জাতীয় গানে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতও কি সত্যিই সে অর্থে কথাপ্রধান? এ-রকম একটা ধারণা চালু আছে মানতেই হয়, কিন্তু চালু বলেই তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় কি? রবীন্দ্রসংগীতের আপাতসারল্য সত্ত্বেও তার সুরের অসামান্য পেলবতা, নবীনতা ও সৃষ্টিময় কারুকার্য কতো দিন আর আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে থাকবে? রবীন্দ্রসংগীতের বাণীমাহাত্ম্য অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকেই বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেখানো যায় যেখানে কথার এমন কিছু স্বতন্ত্র মূল্য নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের অনেক গান আছে যা 'গান' হিসেবে অসামান্য, কিন্তু কথার স্বাধীন মূল্য এমন কিছু আহামরি নয়। দ্বিজেন্দ্র-গবেষক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী বরং উল্টো কথাই বলেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি "সব দিকে বাণীর দীনতা ভরিয়েছেন…বাণীর দুর্বলতা ঢাকতে হয়েছে সুরে ও চলনে।"[৩] সবিনয়ে বলতে হচ্ছে এ-ও হয়তো আর

---

২. দীপেন্দু চক্রবর্তী : 'সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি' (১৯৭৯)। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। পৃঃ ১৩৬-৩৭।

৩ সুধীর চক্রবর্তী : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ (১৯৮৯)। পুস্তক-বিপণি। পৃ. ৯৯-১০০।

এক ধরনের ভ্রান্তদর্শী চিন্তা। কেননা একজন মনে করেন কথার দৈন্যে গান খারাপ হচ্ছে, আর একজন মনে করেন কথার দৈন্য সত্ত্বেও গান ভালো হয়েছে। আসলে 'গান' সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাই একটু গোলমেলে। 'পেংগুইন ডিক্সনারি অফ্ মিউজিক'-এ দেখছি গান (song) হচ্ছে 'an art form belonging equally to poetry and music···a short metrical composition in which the meaning is conveyed equally by words and melody." উইলিয়ম র‍্যাডিস বলছেন[৪]: Songs are "intimate combinations of words and melody". তার অর্থ দাঁড়ায় এই, গান কেবল কথা+সুর নয়, উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত তৃতীয় এক যৌগিক পদার্থ। এ এক বিশিষ্ট আর্ট ফর্ম যেখানে ঐ intimacy-টাই সবচেয়ে বড়ো কথা। এ হলো কথা ও সুরের মিলন, এবং মিলনের আর এক অর্থই হলো ত্যাগস্বীকার—ত্যাগের মধ্য দিয়ে নতুন সার্থকতা অর্জন করা। সেখানে কথা হয়তো কিছুটা পরিমাণে গানের বিশেষ 'মুড' বা মেজাজের গতিনির্দেশক, কিন্তু সুর তাল লয় তাকে তীক্ষ্ণতা, গভীরতা ও সম্পূর্ণতা দেয়। আসলে দেখতে হবে কথা সুরের বিকাশকে কতোটা সাহায্য করছে অথবা দিচ্ছে। একটা উভমুখী সংযম ও সামঞ্জস্য ছাড়া এবং উপলব্ধির তীব্র একমুখীনতা ছাড়া ভালো গান তৈরি হয় না। ভালো গানে কথা সুরবয়নেরই এক অঙ্গ—শেষ পর্যন্ত উভয়ের শিল্পগত অভিপ্রায় অভিন্ন।

বিচ্ছেদের অপর দিকটি হলো আধুনিক গানের সঙ্গে এ দেশের পুরনো সংগীত-ঐতিহ্যের প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। রবীন্দ্রনাথের মতো আধুনিকও একবার বলেছিলেন (এ-রকম কথা বার বার বলেছেন), "ভারতবর্ষের বহু-যুগের-সৃষ্টি-করা যে সংগীতের মহাদেশ তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াবো কোথায়?"[৫] দেশজ ঐতিহ্যের ভূমিতে পা শক্তভাবে প্রোথিত হলে তবেই আকাশের দিকে মাথা তোলার স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কিন্তু 'আধুনিক'রা এ-কথা প্রায়শ মানেন বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লোকসুরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রথমত, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে প্রায়ই তারা নানা 'সভ্য' পলেস্তারায় বিকৃত। দ্বিতীয়ত- অনেক সময় তারা ব্যবহৃত হয় কিছু

---

৪ Introduction to 'Selected Poems: Rabindranath Tagore', p. 28 Penguin Modern Classics (1985).

৫ রবীন্দ্রনাথের 'সংগীতচিন্তা'। বিশ্বভারতী (১৯৪২)। পৃ, ১৩০।

লঘু কৌতুক রস পরিবেশনের কাজে, যে-কৌতুক আজকাল প্রায় ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত। তৃতীয়ত, লোকগীতির নিজেরই বোধহয় কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তার স্বভাবগত সারল্য অনেক সময় আধুনিক নাগরিক অস্তিত্বের জটিলতার সঙ্গে খাপ খায় না। তাছাড়া যেহেতু তাদের রূপ অতিশয় আঞ্চলিক ও বিনির্দিষ্ট (specific) সেহেতু তাদের অন্য গানে ব্যবহার করা অথবা রূপান্তরিত করা যথেষ্ট কঠিন কাজ—কাজেই তার সুযোগও অতিশয় সীমাবদ্ধ। ক্ল্যাসিক্যাল রাগরাগিণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। কেন না, রবীন্দ্রনাথ যেমন বলছেন, "ওর আয়তন আছে, অসম্ভব রকমের স্থিতিস্থাপক প্রাণও আছে,···কিন্তু ওর মধ্যে কোনো পরিমিত আকৃতির তত্ত্ব নেই।[৬] যে আধারে তাকে ধারণ করবে সেই আধারেই তাকে ধরা যাবে। এই ক্ল্যাসিক্যাল সুরের সংস্কারটি আমাদের জনচিত্তে নানাভাবেই ছড়িয়ে আছে আমাদের অসংখ্য প্রাচীন গান, ভক্তিগীতি যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদির কল্যাণে। জনচিত্তের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগের (communication) কাজে এটাই হলো আমাদের একটা প্রধান সেতুবন্ধ—শিল্পী ও জনতার একত্র দাঁড়াবার সাধারণ ভিত্তিভূমি। আমাদের শিল্পীরাই বরং এ থেকে বিচ্ছিন্ন জনগণ ততোটা নন। কিন্তু যতো বিলম্ব হচ্ছে ক্ষতি ততোই অপরিমেয় হয়ে উঠছে। আমরা কি ক্রমশই এমন এক জায়গায় চলে যাচ্ছি যেটা পয়েন্ট অফ্ নো রিটার্ন? এ-কথা অবশ্যই ঠিক যে আমাদের আধুনিক গানে পুরনো রাগরাগিণীকে স্থান দিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নতুন নতুন স্বরসমন্বয় তৈরি হতেই পারে, পারে প্রচলিত রাগরাগিণীর নতুন বিন্যাস অথবা প্রচলিত ছকের অভ্যন্তরে নতুন আগন্তুক স্বরের প্রয়োগ। কিন্তু সর্বপ্রথম দরকার ঐতিহ্যের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ, একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেটার অভাব মারাত্মক।

স্বরক্ষেপণের কৌশলগত ক্ষেত্রে ঐ একই ব্যাপার বোধহয় আর একটু বেশি মাত্রায় প্রকট। আমাদের ধ্রুপদী-খেয়ালী রীতিতে, পল্লীগানে—রবীন্দ্র-সংগীতেও—একটা টানা-আশ-যুক্ত (legate) ভাবের খুবই প্রাধান্য, মীড়ের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক। বিপরীত কাটাকাটা ভাবটাও (staccato) এদেশে একেবারে অজ্ঞাত নয়। দ্রুত লয়ের নৃত্যবহুল গানে, অসম বা বিষমমাত্রিক তালে, বাণীর স্পষ্টীকৃত উচ্চারণে এবং উল্লাস বা বীর্যপ্রকাশক গানে এই কাটাকাটা ভাবটা সহজেই এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও দেখিয়েছেন যে

৬ ঐ পৃ. ১৩৩।

কাটাকাটা স্বরক্ষেপণের মধ্য দিয়ে হৃদয়ভাবের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা সহজ। কিন্তু স্বরের (notes) সঙ্গে স্বরের যে নাড়ির সম্বন্ধ তা টানা পদ্ধতিতেই প্রধানত ধরা পড়ে, তাকে উপেক্ষা করা যায় না, এবং এদেশের সাংগীতিক অভ্যাসটাও প্রধানত ঐ দিকে। কাজেই গান বিশেষের মেজাজ বুঝে উভয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রচনা করাই শিল্পীর দায়িত্ব, জনতার শিল্পগত সংস্কারকে বেশি দূর পীড়ন করা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা দিন দিন সেই রকমই ঘটছে।

কীভাবে সেটা ঘটছে? প্রথম কথা, বিচিত্র যন্ত্রানুষঙ্গ। এককালে তো রবীন্দ্রনাথ হার্মোনিয়ম যন্ত্রটাকেই অপছন্দ করতেন। তার কারণ সম্ভবত এই যে প্রথমত তার টেম্‌পার্ড্ গ্রাম ভারতীয় ডায়াটোনিক স্কেলের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। দ্বিতীয়ত, ঐ যন্ত্রে মীড়ের কাজগুলি দেখানো প্রায় অসম্ভব। দেশিয় গানের ক্ষেত্রে বাঁশি, বেহালা, সারেংগি, এসরাজই সবচেয়ে প্রশস্ত। কিন্তু আজকাল যন্ত্রের সংখ্যা ও প্রাধান্য ক্রমবর্ধমান, এবং প্রায় সবই বিদেশি। তালযন্ত্রের ক্ষেত্রেও পাখোয়াজের গম্ভীর নিনাদ প্রায় স্তব্ধ হ'য়ে এসেছে। তবলা, খোল এমন কি ঢোলের ক্ষেত্রেও তালের ও বোলের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ভারতীয় সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা থেকে আধুনিক গান ক্রমশ সরে যাচ্ছে। যেখানে তবলা ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানেও তবলাবাদকের আতিশয্যদুষ্ট আত্মঘোষণা সব রকম পেলব সৌন্দর্যের পরিপন্থী। অন্যত্র আসছে ড্রাম ও অন্যান্য 'পার্কাসান্'-যন্ত্রের উচ্চকিত আওয়াজ এবং 'রাম্বা' 'সাম্বা' জাতীয় সস্তা বিদেশি রিদম্-এর যথেচ্ছাচার। গানের কথাতেও তেমনি রাম্বা হো হো ইত্যাদি। শ্রীদীপেন্দু চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন আধুনিক গানে কথার গুরুত্ব স্বীকার করা হলেও কথার অন্তর্নিহিত গুরুত্বের প্রয়োজন ক্রমশই কমে আসছে। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করা হবে। কখনো শোক প্রকাশ করার জন্যে থাকছে কান্নাকাটির ন্যাকামি, কখনো উল্লাস করতে থাকছে উদ্দাম বেলাল্লাপনা ['বেশ করেছি প্রেম করেছি করবোই তো']। বাংলা গান প্রায়ই হিন্দি গানের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে, অন্যথা সে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হওয়ার মুখোমুখি। আপনার আমার ঘরের ছেলেমেয়েরাও আজকাল বলছে, হিন্দি ছাড়া আবার গান আছে না কি! মাঝে মাঝে কথার স্থান গ্রহণ করছে কিছু অর্থহীন আওয়াজ, যথা হাম্বা হাম্বা, এই—চপ্, ইয়া হু—, কুলুক্ কুলু, ওয়ে ওয়ে, ইলু ইলু ইত্যাদি। কখনো কিছু বিদেশি নাচের অঙ্গভঙ্গি—ফক্স ট্রট্, রক্ 'এন্ রোল্, ডিস্কো, কতো কী! কখনো

শুনি এক-দো-তিন-চার জাতীয় ছলনাশ্রয়ী সংখ্যাগণনা, কখনো 'সি-এ-টি ক্যাট, ক্যাট্‌ মানে বিল্লি', 'আই লাভ ইউ' জাতীয় পদসন্দর্ভের বাহাদুরি, কখনো যুবতীদেহের বিভিন্ন মাপের বর্ণনা। নোংরামির প্রতিবাদ করতে গেলেও নোংরা স্পর্শ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ শুধু ভাষার দৈন্য নয়, গোটা পরিকল্পনাই ঐ রকম। মূল অভিপ্রায়টা যেখানে তুচ্ছ, এমন কি কদর্য, সেখানে কথা সুর সবই তুচ্ছ অথবা উত্তেজনা-সর্বস্ব হওয়া ছাড়া উপায় কী। এবং অধিকাংশ সুর-প্রকরণ আহরিত হচ্ছে বিদেশ থেকে—নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য কোনো মহৎ সৃষ্টি থেকে নয়। প্রায়ই শুনি উচ্চকিত কিছু তাল-লয় আর নৃত্যভঙ্গি, সিন্‌কোপেশন্‌ ইত্যাদি, আর মাঝে মাঝে ডিসোন্যান্স্‌, ডিস্‌কর্ড-এর খেলা। এক্‌স্‌পেরিমেন্ট আধুনিক, স্বীকার করতেই হবে। আপত্তি শুধু এই নয় যে তারা বিদেশী, আপত্তির প্রধান কারণ ভারতীয় সংগীতের পটভূমিতে তাদের অসারত্ব। পুরনো 'পরিচয়' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৩৮) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি নির্দেশ এখানে মনে পড়ছে: "বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।" কাব্যের মতো সংগীতেও কি ঐ একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য?—হয়তো বিদেশী বীজ সার ইত্যাদির প্রয়োজন আছে, কিন্তু স্বদেশী মাটি জল হাওয়ার গুরুত্ব কি তার চেয়ে কিছু কম?—বিশেষ করে সংগীতের ক্ষেত্রে, যেখানে দেশজ ঐতিহ্যের একটা সুদীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাস আছে?

এ থেকে সংগত যে প্রশ্নটা উঠতে পারে তা হলো: আধুনিক গান যদি এদেশের জীবন ও ঐতিহ্য থেকে এতোটাই বিচ্ছিন্ন তা হলে এই গান এতো অধিক সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে, এমন কি বয়স্কদেরও, এভাবে আকর্ষণ করতে পারছে কী করে? সামগ্রিকভাবে একটা সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক অবক্ষয় অবশ্যই এর প্রধানতম কারণ। আমাদের এই শহরে মধ্যবিত্ত পরিবেশে, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে, একটা অদ্ভুত উদ্দেশ্যহীনতা ও শূন্যতাবোধ নেমে এসেছে। এই পরিবেশে উচ্চ গ্রামের ধ্বনি, নানা যন্ত্রের জটলা, উচ্চকিত তাল, উদ্দাম নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি, জান্তব আওয়াজ, বেপরোয়া জীবনচর্যা ও সম্ভোগলালসা, এমন কি বিরহের বা শোকের সরোদন আতিশয্য ও নাটুকেপনা—সব কিছুর একটা বিশেষ মাদকতা থাকতে পারে, মাদকদ্রব্য যেমন সময় বিশেষে আকর্ষণীয় হয় পুষ্টিকর খাদ্যের চেয়ে। বাজারে সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের আজও অভাব নেই, অর্থের বিনিময়ে তাঁদের দিয়ে অনেক কিছুই

করিয়ে নেওয়া যায়। বাংলা গানের তুলনায় হিন্দি গানের বাজার যেহেতু অনেক প্রসারিত, তাই অর্থের টানও সেখানে প্রবলতর। এর পর হিন্দি গানের প্রতিষ্ঠিত গায়ক-গায়িকাদের যদি বাংলা গানের ক্ষেত্রেও কখনো-সখনো টেনে আনা যায় তা হলে বাংলা গানের বাজারেও কথঞ্চিৎ সুরাহা হতে পারে।

লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে অধিকাংশ আধুনিক বাংলা বা হিন্দি গানই হলো ফিল্মের গান। ফিল্মের গান সিচুয়েশন-নির্ভর। কাজেই পরে যখন ক্যাসেটে এই গান বাজানো হয় তখন উক্ত সিচুয়েশনের স্মৃতিই তারা জাগিয়ে তোলে। এটাই তার আকর্ষণের একটা বাড়তি কারণ—রেডিও-টিভি মাইক-যোগে এই বাড়তি আকর্ষণটাকেই জাগিয়ে রাখার চেষ্টা চলে—'চিত্রমালা' 'চিত্রাঞ্জলি' ইত্যাদির সেটাই ভূমিকা। কিন্তু এই আকর্ষণ যেহেতু সংগীত-বহির্ভূত কারণে সেহেতু গানের সাংগীতিক মূল্য ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই সব গান অনেক সময় নায়ক বা নায়িকার বিশিষ্ট 'মুড্'-কে প্রকাশ না করে হয়ে পড়ে বর্ণনাত্মক, আচরণভিত্তিক, কাজেই শব্দবহুল—গানের স্বরবিচরণ তাতে ব্যাহত হয়। এই ভাবে 'গান' ক্রমশ তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। ফিল্মের একটা নিজস্ব প্রত্যক্ষতা আছে, কিন্তু আর্ট-ফর্ম হিসেবে গানের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক সে তুলনায় অনেকটা অপ্রত্যক্ষ। "গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী"—এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর সমৃদ্ধ সাংগীতিক অভিজ্ঞতা থেকে—তাঁর নিজের রচনাশৈলীও ছিল তদনুসারী। তাই তাঁর ব্যবহৃত নাটকের গান আর সাধারণ ফিল্মের গান চরিত্রগতভাবে আলাদা। ফিল্ম অবশ্যই তার নিজস্ব প্রয়োজনে গানকে ব্যবহার করবে—এ-রকম ব্যবহারের সার্থক উদাহরণও আমরা দেখি নি তা নয়। কিন্তু সাধারণ (বাণিজ্যিক) ফিলমের গানই যখন আধুনিক গানের প্রধানতম উৎস হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা আতঙ্কের কারণ না হয়ে যায় না। চলতি ফিলমী দুনিয়ার সমস্ত দুর্লক্ষণই আজ গানের সর্বাঙ্গে মুদ্রিত। দুঃখের বিষয়, এ-সব নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও আজকাল দুর্লভ। সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের পরীক্ষা এদিক থেকেও অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো—চারপাশ ঘিরে রয়েছে বিকারের সফেন সমুদ্র। সেই সমুদ্র-গর্জন আমরা প্রত্যহ শুনতে পাচ্ছি।

একটা সর্বাঙ্গীণ দূষণের প্রক্রিয়া আমাদের চার দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। পরিবেশ-দূষণ নিয়ে আজকাল কিছু কিছু আলোচনা শোনা যাচ্ছে; কিছুদিন

আগে একটা আইনও পাশ হয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ দূষণক্রিয়াটি নিয়ে আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম তা হলো কলরব-দূষণ। সংবাদপত্রে দেখা গেলো, পৃথিবীর সব বড়ো শহরগুলির মধ্যে কলকাতার কলরব-দূষণমাত্রা না কি সবচেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে কলরবের মাত্রা ৮৫ ডেসিবেল অতিক্রম করলেই তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। বড়ো বড়ো শহরে যানবাহন, দোকানপাট, জনসমাগম ইত্যাদি কারণে কলরব সৃষ্টি হতেই থাকবে, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণেরও কিছু ব্যবস্থা থাকতে পারে। এ-ব্যাপারে আমাদের সরকারি ও বেসরকারি নিস্পৃহতা অতি মারাত্মক। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রচার উপলক্ষে গানকে ঢালাওভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মাইকযোগে। চিৎকারের উৎস গানই হোক বা আর কিছু হোক একটা প্রচণ্ড নিরবচ্ছিন্ন কোলাহলে আমরা দিকে দিকে হয়ে উঠ্‌ছি এক-একটা স্নায়ুর পুঁটলি, অথবা আমাদের গোটা স্নায়ুতন্ত্রই ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে। কাজের মাথা খে খাচ্ছি তা আর বলে দিতে হবে না। বিশেষজ্ঞ[৭] বলছেন, কলরব-দূষণ শ্রবণ-শক্তির দুর্বলতা ঘটায়। তার মানে, যাঁরা এই দূষণের শিকার তাঁদের শব্দের অনুভূতি অপেক্ষাকৃত কম অথবা অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ সাধারণভাবে তাঁরা শুনতে পান বটে কিন্তু শব্দবিশেষকে আলাদা করে ধরতে পারেন না। একেই বলে কানের মাথা খাওয়া। কানের মাথা খেলে গান শোনার কী দশা হয়, এবং তখন গানেরই বা কী দশা হয়? গোলমাল শুনতে শুনতে লোকে ক্রমশ গোলমাল শুনতেই অভ্যস্ত হয়ে, সুরটা আর কানে যায় না। তখন গান নিজেই হয়ে উঠতে চায় গোলমাল। সূক্ষ্ম সৌকুমার্য বা সুরের কারুকার্য যে-সব গানের বিশেষত্ব সেগুলো তাঁদের কাছে মনে হয় একঘেয়ে, বিরক্তিকর। অপরপক্ষে যে গান উচ্চৈঃস্বরে গীত হয়, যাঁর মধ্যে কেবল মোটা দাগেরই কাজ, যা কেবল উচ্চারিত তালের ঝোঁকে ঝোঁকে আন্দোলিত—সেই গানেই তাঁদের আগ্রহ থাকবে, অন্য গান পরিত্যাজ্য।

ফলত, আধুনিক গান হিসেবে গোলমাল সৃষ্টির অন্যতম কারণ, অন্য হিসেবে আবার গোলমাল সৃষ্টির পরিণামও। যাঁরা এই সব গান রচনা করেছেন ও প্রচার করেছেন তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতে পারেন যে লোকে এই জিনিসই চায়। কথাটা এক দিক থেকে খুবই সত্য, কিন্তু অন্য দিক থেকে ডাহা মিথ্যে।

৭ গোরাচাঁদ কুণ্ডু: প্রবন্ধ 'কলরব দূষণ'। 'আমাদের বিজ্ঞান জগৎ' (১৯৮৩); বিশেষ সংখ্যা: পরিবেশ দূষণ সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্‌।

সংখ্যা গণনায় কথাটা যে সত্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাস্তায়, ঘাটে, জলসায় পিকনিক পার্টিতে, কলেজ সোশ্যালে এ-জিনিসেরই প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু এই রুচি তো অংশত তাঁদেরই তৈরি—অংশত অন্যের। আসলে এই জনরুচি যে দীর্ঘকালীন ব্যবসাদারির সযত্নলালিত ফসল, নানা প্রচার মাধ্যমে তথা গণমাধ্যমের সম্মিলিত দান—এ-কথা যখন স্মরণ করি তখন সেই কপট জনসেবার যুক্তিকে ধিক্কার না জানিয়ে উপায় থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে ধ্বংস হচ্ছে আমাদের দেশজ রুচি ও সুরবোধ, অন্য দিকে তৈরি হচ্ছে উত্তেজক এক বিচিত্র ধরনের শিল্প-পণ্য—substitute art, যা made for and not by the people, যা at best trivia and quite after openly corruptin .[৮] উন্নত সংস্কৃতির ধারকেরা একে যতো তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করুন না কেন, অথবা যতোই দূরে সরিয়ে রাখতে চান না কেন, তাঁদের কর্ণপটহে তা আঘাত হানবেই।

বিকারের ঝড়ো হাওয়া বইছে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সকল দিক থেকেই—আবার সাংস্কৃতিক দিক থেকেও। প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজে লোকশিল্পের যে ভিত্তি, এদেশের কিম্ভূতকিমাকার ব্যবসাতন্ত্র তাকে ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেছে। ওদিকে একটানা বিশৃঙ্খল ধ্বনি ধ্বনির শৃঙ্খলাকেই ধ্বসিয়ে দিচ্ছে, নস্যাৎ করছে আমাদের দেশগত সাংগীতিক সংস্কারকে। ফলে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে সেই অবকাশেই আসতে পারছে এক তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিন আমদানি। দেশজ ঐতিহ্যগুলো অনেক সময় এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কাজ করে। সেই প্রতিরক্ষাকে ধ্বংস করতে পারলে তবেই ঐ বিদেশী পণ্য তার বাজার পায়। কতো সহজে মার্কিন 'পপ্ সঙ' বা 'পপ্ মিউজিক' আজ বোম্বাই-এর রাস্তায় চোলাই হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই পশ্চিম বাংলার পথে ঘাটে প্রান্তরে, শহর থেকে গ্রামে—তরুণদের কণ্ঠ আর অঙ্গভঙ্গি আশ্রয় করে। মার্কিন রক্ এন্ রোল্ আর ডিস্কোর সঙ্গে দেশী 'আধুনিক'-এর আজ আর প্রায়কোনো পার্থক্য নেই—সব যেন একাকার। কাজেই সংগীতের বাজারটাও আজ আন্তর্জাতিক, আর রুচিটাও 'কস্‌মোপলিটান্,' যার মধ্যে দেশ নেই, কাল নেই, নেই আধুনিক অস্তিত্বের যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা—তবু তারা নাকি আধুনিক, 'বৃন্তহীন পুষ্পসম'। এরই নাম কাল্‌চারাল্ আমেরিকানাইজেশন্ অফ দি ওয়ার্লড্।

---

৮ The challenge of Marxism সংকলনের অন্তর্ভুক্ত A. L. Mortan-এর প্রবন্ধ The Arts and of People দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আধুনিক এই সব গানের আয়ু খুব বেশি দিনের নয়, কিন্তু তার জন্যে কোনো মহলে কোনো আক্ষেপও নেই। আজ যে ক্যাসেটটা বাজারে ছাড়া হলো বারবার তা বাজানো হতে লাগলো। কিছু দিন বেশ লম্ফঝম্ফ চললো, তারপর যখন সেটা বিরক্তির পর্যায়ে চলে গেলো তখন তা বাতিল। একবার বাতিল হওয়া মানে চিরদিনের বিস্মৃতি। তারপর তৈরি হলো নতুন গান, নতুন রেকর্ড বা ক্যাসেট—আরও জোরালো চটক। কিছুদিন পরে সেটাও বাতিল। যতো তাড়াতাড়ি বাতিল হবে ততো তাড়াতাড়ি নতুন চটক তৈরি হবে, বাজারে আসবে নতুন শিল্পপণ্য। গানটা অস্থায়ী, কিন্তু বাজারটা স্থায়ী এবং সেই বাজারের একমাত্র গতি এক চটকের শীর্ষদেশ থেকে আর এক চটকের শীর্ষদেশে। বাজারে চাহিদাটা যেমন নিরন্তর তৈরি হয়ে চলেছে তেমনি যোগানটাও থাকছে অব্যাহত—এতেই বাজার সরগরম। এইভাবে, কেউ জেনে কেউবা না জেনে, আমরা কতিপয় মুনাফা-লোভী ব্যবসাদারের মুনাফা ও মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে চলেছি, কিন্তু আমাদের হাতের কাছেই রয়ে গেছে যে স্বকীয় মূলধন তা পড়ে রইলো অবহেলিত সংকুচিত হয়ে, এমন কি কিছুটা বিকৃত হয়েও—যদিও সেটাই আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের আশা-আনন্দের চিরন্তর উৎস, আমাদের আত্মরক্ষার অন্যতম প্রধান অবলম্বন, আমাদের শৈল্পিক স্বাধীনতারও অনিবার্য পাদপীঠ। শূন্যচারিতায় বা চটকসৃষ্টির মোহে কোনো স্বাধীনতা নেই। আধুনিকরা হবেন একযোগে চলনশীল ও দায়িত্বশীল—তবেই জমবে সৃষ্টির লীলা। বিদেশী প্রকরণ বর্জনীয় নয়, কিন্তু কানের অভ্যাসের ওপর কতোটা পীড়ন সহ্য হয় সেটাও ভেবে দেখতে হবে। এই কারণেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিচয় সত্ত্বেও পাশ্চাত্য হার্মোনাইজেশন্ বা কাউন্টার পয়েন্টের পথ পরিহার করে গেছেন যদিও প্রধানত ঐ পথেই পাশ্চাত্য সংগীতের বিশাল সৌধটি সমুচ্চ হয়েছে।

বর্তমান বা আগামী দিনের গান-রচয়িতারা ঠিক কোন্ পথে অগ্রসর হবেন এ-বিষয়ে কোনো নির্দেশনামা জারি করতে যাওয়া বর্তমান লেখকের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। প্রত্যেক রচয়িতার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবেই যেটা নিঃসন্দেহে কাম্য। কিন্তু একালের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 'আধুনিক' সেই রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে যদি কিছু পথনির্দেশ পাওয়া যায় পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এ বিষয়ে অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি। তাই, প্রবন্ধটিকে কথঞ্চিৎ সম্পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে, তাঁর নিজস্ব প্রকরণগুলিকে এখানে আর

একবার সংক্ষেপে বিবৃত করতে হচ্ছে। প্রথমত, সুরপ্রয়োগের কালে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত বাংলা শব্দের উচ্চারণগত ও অর্থগত বৈশিষ্ট্যকে বিকৃত হতে দেন নি। ফলে কথার সুকুমার বৈশিষ্ট্য গানের সমগ্র অবয়বে প্রতিফলিত। দ্বিতীয়ত, গান-রচনার প্রথম পর্যায়ে তিনি শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীকেই বেশি ব্যবহার করেছেন, সঙ্গে কিছু বিদেশি সুরও। পরে লোকসংগীতের সুর আসায় গানের মেজাজ গেলো বদলে। আরও পরে লোকসুরের প্রভাব একটু পরোক্ষ হয়ে আসায় আরও নতুন নতুন 'মুড্' সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রচলিত রাগরাগিনী ব্যবহৃত হলেও তার প্রয়োগরীতি সব সময় প্রথাসিদ্ধ ছিল না। লয়-ফেরতা, তাল-ফেরতা, তাল-বর্জন, মীড়ের স্মিত প্রয়োগ, কিছু কিছু টপ্পা-অঙ্গের কাজ নতুন নতুন মেজাজ রচনায় সক্রিয় ছিল। তানের বাহুল্য বর্জনে গানের গুরুত্ব সব সময় লঘু হয় না, বরং তার মেরুদণ্ড আরও ঋজু হয়, ভারবহনের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, বাণী ও সুরের পরস্পর সহযোগিতা, এক রাগের সঙ্গে অন্য রাগের মিশ্রণ, রাগের সঙ্গে লোকসুরের মিশ্রণ, প্রচলিত পর্দা থেকে আকস্মিক বিচ্যুতি—এ-সবই নতুন নতুন সুর-রচনার উদাহরণ, সবই নতুন নতুন মেজাজ রচনার সহায়ক। পঞ্চমত, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের বিশিষ্ট ব্যবহার, যুক্ত ব্যঞ্জনের বিশিষ্ট প্রয়োগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কখনো টানা সুর কখনো বা কিছুটা কাটাকাটা ভাবের ওপর আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়ে-কমিয়ে তিনি নতুন নতুন ভারসাম্য রচনা করেছেন (যেমন, একদিকে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' তেমনি অন্য দিকে 'মুক্তধারা' নাটকের যন্ত্রের গানে 'কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া'—জাতীয় গীতিবন্ধ)। একটি কথা এখানে পরিষ্কার। সাধারণ কতকগুলি ভাবকে প্রকাশ করা নয়, রূপের বিশিষ্টতা ফোটানোই আধুনিক গানের কাজ, এবং এখানেই রচয়িতা বা কম্পোজারের সর্বাধিক গুরুত্ব। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ যখন বিভিন্ন রাগ নিয়ে কাজ করেছেন তখনও তাঁর কোনো গান এক-একটি রাগের অজস্র স্বরসমন্বয়ের প্রদর্শনী হয়ে ওঠে নি, বিশেষ বিশেষ গানের জন্যে থেকেছে কয়েকটিমাত্র বিশেষ সমন্বয়। বৈশিষ্ট্য ফুটেছে সমন্বয়-বিশেষের নির্বাচনে—সেখানেই তাঁর রূপগত স্বাধীনতা, আধুনিকতা।

আমাদের প্রচলিত সুর-প্রকরণগুলির মধ্যে ঐতিহ্যের ধারাটি বেশ স্পষ্ট, কিন্তু তার মধ্যে কোনো স্বাধীনতার বীজমন্ত্র নেই—এটাই এদেশের এক

৯. বর্তমান লেখকের 'সে অগ্নিতে দীপ্ত গীতে' দ্রষ্টব্য। প্রকাশক: ঐকতান, ভাটপাড়া (১৯৮৫)।

বিশেষ সমস্যা। এই জন্যেই পুরনো ঠাটগুলিকে মাঝে মাঝে ভাঙতে হয়, ভেঙে পুনশ্চ জোড়া দিতে হয় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে। তখন ঐ অংশগুলির মধ্যে ধরা থাকে ঐতিহ্যের ব্যঞ্জনা, আর ভাঙন ও সমন্বয়ের মধ্যে থাকে শিল্পীর স্বাধীন লীলা। রবীন্দ্রনাথই আমাদের শিখিয়েছেন, "সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণ মাত্রই একাদকে উপায় অন্য দিকে বিঘ্ন।"[১০] এইসব বিঘ্নকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপস করতে করতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য অর্জন করে—যদি অবশ্য স্বাধীনতার 'পরে আমাদের নজর থাকে।

আধুনিক শিল্পীরা অবশ্যই হবেন চলনশীল ও দায়িত্বশীল—এককথায় সৃষ্টিশীল। কিন্তু সৃষ্টির প্রেরণা আসে প্রধানত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংরাগ থেকে, কোনো চমক সৃষ্টির মোহে নয়। তারপর থাকে নিজস্ব সামর্থ্য অর্জনের প্রশ্ন এবং জনগণের সঙ্গে শিল্পগতভাবে যুক্ত হওয়ার সাধনা। সেক্ষেত্রে স্বদেশের ও বিশ্বের শিল্প-ইতিহাসটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সংগীত এতোদিন বিকাশ লাভ করেছে প্রধানত 'ইম্‌প্রুভাইজেশন্'-এর পথ ধরে। কখনো সচেতনভাবে—যেমন ক্ল্যাসিক্যাল রীতিতে, কখনো বা অচেতনভাবে—যেমন লোকগীতিতে। কীর্তনেও 'আখর' যোগ করা ছিল এক বিশেষ পদ্ধতি। সর্বত্রই 'পারফর্মার'-এর (গায়কের) বিশেষ গুরুত্ব, রচয়িতা (composer) প্রায়শ কোনো অজ্ঞাত কোণে অদৃশ্য হয়ে থাকতেন। অথবা হয়তো রচয়িতা নিজেই হতেন গায়ক, সেখানে তাঁর গায়ক ভূমিকাটাই হতো প্রধান, রচয়িতা ভূমিকাটা গৌণ। কম্পোজারের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রধানত ইউরোপীয় চিন্তাধারারই দান, এবং তাঁর বিশেষ লক্ষণ হলো বিশিষ্ট রূপদক্ষতা। সেটা হতে পারে ছোটো ছোটো গানের নিটোল স্বয়ংসম্পূর্ণতা রচনায়, অথবা হতে পারে অপেরা বা গীতিনাট্য অথবা নৃত্যনাট্যের সুরপ্রবাহে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী গঠন কৌশলে। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো গান-রচনার ক্ষেত্রেও শিল্পীর এই স্বাধীনতা মোটেই নিরাপদ নয়। সামনে পিছনে অনেক বাধা। সবচেয়ে বড়ো বাধা তার শিকড়হীনতা, তার চটক সৃষ্টির মোহ আর ব্যবসা জগতের প্রবল আকর্ষণ।

তাই একটা প্রতিষ্ঠানগত প্রতিরোধের ব্যবস্থা বোধহয় আজও অত্যন্ত জরুরি।

---

১০. 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিগত পঁচিশ বছরে লোকসংস্কৃতি চর্চার রূপরেখা

সুধীরকুমার করণ

ফোকলোর : লোকযান : লোকসংস্কৃতি

ইংরাজি কালচারের প্রতিশব্দ রূপে, বাঙলাভাষায় সংস্কৃতি শব্দটি গৃহীত হয়েছে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র কালচারের প্রতিশব্দরূপে 'অনুশীলন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'কৃষ্টি' শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী হলেও পররর্তী সময়ে কৃষ্টি শব্দটিকে বর্জন করেছিলেন এবং সংস্কৃতি শব্দটিকে 'কালচার'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করে তার সংক্ষেপিত অর্থ করেছিলেন—'চিত্তের ঐশ্বর্য্য' একদা যিনি মানবজমিনকে আবাদ করে সোনা ফলাবার কথা বলেছিলেন, তাঁর মনেও ছিল মানব মনের উৎকর্ষের কথা। এই অর্থেই কৃষ্টি শব্দের ব্যবহার করার পক্ষপাতী অনেকেই। লক্ষ্য করা যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ করেন নি। সংস্কৃত অভিধানেও সংস্কৃত, নিরুদ্দেশ। আচার্য সুনীতিকুমারই প্রথম সংস্কৃতি শব্দটি রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থাপিত করেন এবং উল্লেখ করেন যে—সংস্কৃতি শব্দটি কালচার-এর প্রতিশব্দরূপে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচলিত। শব্দটি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ আনুকূল্য পেয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্ষিতিমোহন সেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' থেকে 'শিল্পস্তুতি'-র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দেখান যে —শিল্পস্তুতি-তে 'আত্মসংস্কৃতি' শব্দটি বর্তমান,—যার অর্থ 'শিল্প সমূহ হচ্ছে,—আত্মার সংস্কৃতি।' বলা হয়েছে "ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ দেবশিল্পনায় অনুকৃতীত্ব শিল্পম্ অধিগম্যতে—হস্তী, কংসো, বাসো, হিরণ্যম, অশ্বতরীরথ; শিল্পম্। আত্মসংস্কৃতি বাঁব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মনং সংস্কৃরুতে।' অর্থাৎ—"(পার্থিব) শিল্পসমূহ দেব-শিল্প বা স্বর্গীয় শিল্পসমূহকেই প্রশংসা করে; এই সমস্তের (অর্থাৎ দেব-

শিল্পের) অনুকৃতিরূপেই এই পৃথিবীতে শিল্পকে ধরা হয়। শিল্পদ্রব্য কি রকম ? হস্তী অর্থাৎ হাতীর দাঁতের কাজ, কাংস বা ধাতবপাত্র, বিবিধ প্রকারের বস্ত্র, স্বর্ণনির্মিত অলংকারাদি, অশ্বতরীযুক্ত রথ—এই প্রকার। এই শিল্পসমূহই হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি ; এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।" শিল্পস্তুতি-তে প্রজননক্রিয়াকেও শিল্পকর্ম এবং আত্ম-সংস্কারের উপায় বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ—প্রজননক্রিয়াও প্রাকৃতিক ছন্দে এবং দেবশিল্পের নিয়মে বাঁধা। নীহাররঞ্জন রায় এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—'মানবজীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে সে-জীবনের সংস্কার সাধনোদ্দেশ্যে যে-কোন কর্ম করা হয়, তাকেই বলা যেতে পারে সংস্কৃতিকর্ম,—অবশ্যই সে-কর্মটি যদি করা হয় ছন্দের বন্ধন, নিয়ম-সংযমের শাসন, তাল-লয়-মানের রীতিনীতি মেনে। তা' না হলে কর্মটি শিল্পকর্ম হবে না এবং শিল্পকর্ম না হলে আত্মসংস্কৃতিও হবে না।' সুনীতিকুমার সংস্কৃতির অর্থ করেছেন—'সভ্যতার নির্যাস।' বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে তিনি—বাহ্যসম্পদকে বলেছেন,—সভ্যতা আর মানস-সম্পদকে বলেছেন সংস্কৃতি। বাংলাদেশের বাস্তব সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে তিনি যে সব বস্তুর উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আছে,—খড়ের চালের কুটির, পুরোনো কালের কাঠের কাজ, ঘর অথবা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটি, চালের বাতা, ইটের মন্দির, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পুঁথির পাটা, পটুয়ার পট, কালীঘাটের পট, গাজীর পট, সরায় আঁকা ছবি, মাটির ঠাকুর, কাঠের পুতুল, শোলার কাজ, ডাকের কাজ, শাঁখের চুড়ি, পিতল কাঁসার বাসন, পিতলের মূর্তি, শাকশুকতুনি-ঘন্ট, মাছ-মাংস রান্নার রীতি, ছড়া তেঁতুল, কাসুন্দী, খেজুরে গুড়, পিঠেপাটালি, সন্দেশ-পানতুয়া-রসগোল্লা, বস্ত্রশিল্প, মাদুরশিল্প এবং আরো অনেক কিছু। আছে—উৎসব,—সামাজিকতা ধর্মসাধন অনুষ্ঠান, বারব্রত, লাঠিখেলা, ঢাকীঢুলির নাচ।—মানস-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির উদাহরণ রূপে—সুনীতিকুমার প্রাচীন টোল, চতুষ্পাঠী, বৃন্দাবনের গোস্বামী, নবদ্বীপ-ভাটপাড়া-বিক্রমপুর-বিষ্ণুপুর, চর্যাপদ চণ্ডীদাস-চৈতন্যদেব-রামপ্রসাদ, মঙ্গলকাব্য-যাত্রা-পাঁচালি-কীর্তন প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত, বাঙালি সংস্কৃতির একটি প্রসারিত রূপরেখার সন্ধান, এতে পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতিকে সম্যক কৃতি রূপে গ্রহণ করে সংস্কৃতি শব্দটির যথার্থতাকে-চিহ্নিত করা যায়। সংশয় দেখা দেয়, তখনই যখন সংস্কৃতি শব্দটিকে 'লোক' শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে উপরিউক্ত পরিমণ্ডলের

বাইরে নিয়ে আসা হয়। আরো সংশয় দেখা দেয়,—যখন ফোক্‌লোরের-প্রতিশব্দ রূপে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। লোকসমাজে-লোকমানসে উদ্ভূত, পরম্পরাগত ভাবে আগত এবং লোকসমাজে গৃহীত, মৌখিক সূত্রে প্রাপ্ত শিল্প-উপাদানগুলিকে একান্তভাবে যদি লোকসংস্কৃতির বিষয়রূপে গ্রহণ করা হতো, তা হলে এ সমস্যা দেখা দিতো না। সমস্যা আছে জেনেই, সুনীতিকুমার ফোকলোরের বাঙলা প্রতিশব্দ রূপে 'লোকযান' শব্দটি নির্মাণ করেন। কারণ ফোকলোরের পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সংস্কৃতির সম্যক কৃতির গণ্ডী ছাড়িয়ে, তার প্রসার। অতএব, আমরা যখন লোকসংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করি, তখন তা' ফোক-কালচারের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তখন আমরা সাধারণ ভাবে, গ্রামীণ বা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের মানস সম্পদের উপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এদিক থেকে বিচার করলে কেবলমাত্র লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য লোকশিল্পই লোকসংস্কৃতির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ফোকলোরের বা লোকযানের বিশেষ একটি অংশ রূপে চিহ্নিত হয়ে যায়।

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের নিরিখে, ফোকলোরের পরিধি বহুবিস্তৃত। কেবলমাত্র সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলাদির উপর তা নির্ভরিত নয়। ব্যক্তির সৃষ্টি বা আচরণের উপর তা একেবারেই গুরুত্ব দান করে না। গ্রামীণ, উপজাতিক, গোষ্ঠীক প্রভৃতি বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত লোকসমাজে, ব্যষ্টিগত শিল্পকর্ম-আচার আচরণ বিশ্বাস প্রভৃতি লোকসংস্কৃতিবিদ পণ্ডিতদের কাছে কোন মূল্যই বহন করে না; কেবল সমষ্টিগত সৃষ্টি আচার-আচরণ-বিশ্বাস প্রভৃতি নিয়েই তাঁদের মূল্যায়ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করার ব্যক্তিগত আচরণ,—যেমন, বুক চাপড়ে কাঁদা, মাথাকোটা, চিৎকার করে বিলাপ করা প্রভৃতি লোকযানের বিষয় নয়। কিন্তু গোষ্ঠীগত ভাবে শোকপ্রকাশ করার জন্য কালো ফিতে ধারণ করা, লোকযানের অঙ্গীভূত। অন্যদিকে মহরমের অনুষ্ঠানে শোকপালন করার জন্য যদি বুক চাপড়ে হায় হায় শব্দ তোলা হয়, তাহলে তাকে লোকযানের বিষয় বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মৃতের মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানও লোকযানের অঙ্গ। বস্তুতঃ ট্র্যাডিশান বা ঐতিহ্যিকতাই লোকসংস্কৃতিও লোকযানের ধারক এবং বাহক। বলাবাহুল্য, ফোকলোর-র চৌহদ্দীতে একদা মুখ্য আসন ছিল 'ওর্যাল ট্রাডিশনের' বা অলিখিত মৌখিক সাহিত্য-সংগীত প্রভৃতির। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ লোকতত্ত্ববিদ্ জোন থমস্ 'জনসাধারণের জ্ঞান' অর্থে ফোকলোর শব্দটি নির্মাণ করেন এবং শব্দটি ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীতেই গৃহীত হয়। শব্দটির

সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেন নি, বাংলা ভাষাতেও ফোকলোরের প্রতিশব্দ কোনো একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। এক্ষেত্রেও বহুমত। ইংরাজি 'ফোক' শব্দটির সঙ্গে বাংলার 'লোক' শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য এবং অর্থগত নৈকট্যহেতু, বিনা বিসংবাদেই 'ফোক' 'লোক'-এ পরিণত হয়েছে। ইংরাজি কালচার-এর প্রতিশব্দ রূপে যখন সংস্কৃতি শব্দটি প্রচলিত হয়ে গেল তখন 'ফোক কালচার'কে 'লোকসংস্কৃতি' বলার পক্ষে কিছু যুক্তি অবশ্যই পাওয়া গেল। কিন্তু 'লোর' নিয়ে সমস্যা যে দেখা দিল না, তা নয়। 'লোর' অর্থে ইংরাজিতে গ্রাম্যগীতিকা, সংগীত ইত্যাদি বোঝাতো। ফোকলোরের ক্ষেত্রেও একেবারে তা নস্যাৎ হয়ে যায় নি। কিন্তু অ্যানথ্রোপলজির বা নৃতত্ত্বের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পৌঁছে সমাজতত্ত্বের বহুবিষয়কে আত্মস্থ করে ফোকলোর হয়ে উঠল এক নতুন বিস্তার বিস্তৃত পরিসর। লোকমানস থেকে উদ্ভূত এবং পুরুষানুক্রমে মৌখিক সূত্রে প্রাপ্ত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও শিক্ষানির্ভর নয়,—এমন সব গান, গল্প, ছড়া, প্রবাদ, নাট্যকলা, শিল্পকলা প্রভৃতি ফোকলোরের বিষয় হয়ে তো থাকলোই, তার সঙ্গে জুড়ে বসলো লোকসমাজের সমষ্টিগত সর্ববিধ-আচার-আচরণ, ধারণা-সংস্কার, ভূত-প্রেত মন্ত্র-তন্ত্র-দেব-দেবী-অলৌকিকতায় বিশ্বাস; মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক প্রথা-অনুষ্ঠান-ধর্মসাধনা প্রভৃতি। ফলে ফোকলোরের পরিধি অতিবিস্তারে পরিণত হলো। এছাড়াও গৃহস্থালীর আসবাবপত্র পোশাকপরিচ্ছদ, খাদ্যরীতি এবং আরো অসংখ্য সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি ফোকলোরের অঙ্গীভূত হলো। যা কিছু প্রবহমান ধারায় লোকসমাজে প্রচলিত, তার সব কিছুই প্রায় এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়লো। বাংলাভাষায় ফোকলোরের প্রতিশব্দ হিসাবে দেখা দিল,—লোকযান, লোকবৃত্ত, লোকচর্চা, লোকায়ন, লোককৃতি, লোক-সংস্কৃতি এবং অনুরূপ আরো কিছু শব্দ। এ নিয়ে যে, কোন বাদ-বিসংবাদ হয়েছে তাও নয়, কারণ লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী পণ্ডিতগণ একটি সর্বসম্মত শব্দ ব্যবহারের জন্য ঔৎসুক্য দেখান নি। এক্ষেত্রে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুনীতি কুমার প্রবর্তিত 'লোকযান' শব্দটি ফোকলোরের ব্যাপ্তিকে যথাযথ ভাবেই বোঝাতে পারে। পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতির নানা উপাদানের সংরক্ষকরূপে ফোকলোরের গুরুত্ব এখন স্বীকৃত। মনোবিজ্ঞানের নানা সূত্রও এর মধ্যে নিহিত। শিষ্ট সংস্কৃতিতে যে সব উপাদান বর্জনীয় বলে মনে করা হয়। সে সব উপাদান এবং ধারণা লোকযানে

বিশেষভাবে স্বীকৃত। এইসব কারণে লোকযান চর্চা এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। কোন সরলীকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে নয়,—বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই লোকযান চর্চার মধ্যে প্রবেশ করা চলে। তার বিস্তীর্ণ ভূমির অধিকার লাভ করা কিন্তু সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না।

ফোকলোরের চরিত্র সম্পর্কে বহু পণ্ডিতের বহু মত থাকা সত্ত্বেও কয়েকজনের অভিমত তুলে ধরা যেতে পারে। ই. বি টাইলরের মতে ফোকলোর এক জটিল সমষ্টি. যার মধ্যে আছে জ্ঞান, বিশ্বাস. শিল্প, রীতি, নীতি, প্রথা এবং যে-কোন কৃতি বা অভ্যাস যা সমাজের সব মানুষের কাছে গৃহীত। অন্যদিকে আর্চার টেলর বলেছেন যে ফোকলোর ব্যাখ্যার জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কেবলমাত্র এই কথাই মেনে নেওয়া ভালো যে ফোকলোর হচ্ছে মৌখিক ভাবে প্রাপ্ত উপাদান সম্পর্কিত চর্চা। এ বিষয়ে স্টীথ থমসনের উক্তি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁর অভিমত এই যে ফোকলোর শব্দটির বয়স এক শতাব্দী অতিক্রম করলেও শব্দটির যথাযথ অর্থ সম্পর্কে বিতর্কের অবসান ঘটেনি কিন্তু 'ট্র্যাডিশান'-ই যে ফোকলোরের একটি আবশ্যিক শর্ত. এ ব্যাপারে সবাই একমত। অর্থাৎ. যে সব বস্তু বা বিষয় পুরুষানুক্রমে প্রবহমান অবস্থায় একজনের নিকট থেকে আর একজনের কাছে সঞ্চারিত হয়, যা কেবলমাত্র মনের মধ্যে কিংবা অভ্যাসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে,—যার কোন লিখিত রেকর্ড বা চিহ্ন পাওয়া যায় না,– সেই সব বস্তু বা বিষয় ফোকলোর-এর আওতাভুক্ত। আরও বিশদভাবে বলা যায়—. ফোকলোর বা লোকযানের বিষয়গুলি মৌখিক এবং অভ্যাস সূত্রে প্রাপ্ত প্রবহমান ধারার কাহিনী, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, এবং বিশ্বাস-আচরণ, প্রবাদ-প্রবচন, কুসংস্কার অলৌকিক বিশ্বাস প্রভৃতি। এ ছাড়াও লোকযানের উপাদান হচ্ছে 'কৃষিকর্ম এবং গৃহস্থালী সম্পর্কিত বিশ্বাস.ও প্রথা', গৃহনির্মাণ পদ্ধতি এবং সমাজ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যিক বা ট্র্যাডিশনাল বিষয়। বস্তুতঃ গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ আদিম সমাজ, উপজাতিক সমাজ, শিক্ষাদীক্ষাবর্জিত অনগ্রসর গ্রামীণ সমাজ প্রভৃতির মধ্যেই লোকযানের উপাদান সন্ধান করা হয়ে থাকে, যদিও নগর সংস্কৃতির মধ্যেও তার কিছু কিছু উপাদান সংগুপ্ত থাকে। বলাবাহুল্য ফোকলোরের অনেক বিষয়ই নৃতত্ত্বের বিষয় হলেও, ঐতিহ্যিকতার খাতিরে সেগুলিকেও ফোকলোরের বিষয় রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ফোকলোর অর্থে যখন লোকসংস্কৃতি শব্দটি প্রয়োগ করি, তখন কালচার বা সংস্কৃতি অর্থ যে পুরোপুরি বদলে যায়, তা নয়, বরং লোকসমাজভুক্ত কোন

কোন বিশেষ ব্যক্তির—সৃষ্টিকলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। লোকসমাজে গৃহীত হলে, তার প্রসার ঘটে কিন্তু তার উপর থেকে ব্যষ্টির ছাপ একেবারে মুছে যায় না। আমরা যখন 'বাঙালী লোকসংস্কৃতির' কথা বলি, তখন সাধারণভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতির কথাই ভাবি। কিন্তু যখন বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলি তখন নগর এবং গ্রামীণ উভয়বিধ সংস্কৃতির কথাই বলে থাকি। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার নাগরিক এবং গ্রামীণ—সংস্কৃতির সম্মিলিত কৃতির কথা বলতে গিয়ে বাঙালিজাতির মধ্যে উদ্ভূত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মানস-উৎকর্ষের কথাও বলেছেন। কিন্তু লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে আমাদের যেতে হয় বিশেষ জনবিন্যাসযুক্ত অঞ্চলে,—যেখানে সামাজিক সংহতি এবং উপভাষাগত আঞ্চলিকতা বর্তমান এবং যার সাংস্কৃতিক কাঠামো বা প্যাটার্ন সংহত গোষ্ঠী-সীমায় আবদ্ধ। বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি স্পষ্ট রূপ অবলোকনের জন্য তাই আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় কিংবা পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার বনপাহাড় ডাহিডুংরিযুক্ত ঝাড়খণ্ডী এলাকায় ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে। লোকযানের বিরাট পরিসরে, লোকসংস্কৃতি এখানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। লোকযান অথবা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও এই অঞ্চলগুলির গুরুত্ব অনেক। তুলনামূলক ভাবে সমতল বাঙলার সংস্কৃতি অনেক বেশী শিথিল। বাঙালি লোকসমাজের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্র, অবশ্যই বিশাল। তাই সেদিকে আলোচনার গতিকে অবরুদ্ধ রেখে, বাঙলাভাষায় লোকসংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে উনবিংশ শতাব্দীর লোকসংস্কৃতি চর্চার আবরণ উন্মুক্ত করার কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনাপর্ব ও রবীন্দ্রনাথ

উনিশশো বারো খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাস মালা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বাঙলাভাষায় ইতিহাসমালা-ই প্রথম গ্রন্থ যার মধ্যে কয়েকটি রূপকথা-উপকথা সংকলিত হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের প্রবোধচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থেও কয়েকটি উপকথার সন্ধান পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য লোককথার চর্চা করা, গ্রন্থ দুটির মূল উদ্দেশ্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিশনারিদের প্রচেষ্টায় বাঙলা ছড়া ও প্রবাদ সংগ্রহের কাজ অবশ্যই শুরু হয়েছিল, কিন্তু যথাযথ ভাবে বাঙলার

গ্রাম্যসাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ। সে সময় সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দগুলির উদ্ভবই ঘটেনি এবং লোক-সাহিত্য অর্থে গ্রামীণ সাহিত্যকেই বোঝানো হয়েছে। দেশকে গভীরভাবে জানার জন্য, গ্রামকে জানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর ধারণা ছিল, গ্রামীণ সাহিত্য শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য-গুলিকে পুনরুদ্ধার করে, তার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারলে গ্রামের মানুষের মন থেকে হীনমন্যতা দূর হতে পারে এবং তার ফলে গ্রামীণ মানুষ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। বস্তুতঃ গ্রামগুলিকে পুনর্গঠিত করার জন্যই এবং গ্রামের মেলা, অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার কথা ভেবেই সেদিন লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সংগঠন সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার অনেক পূর্ব থেকেই বাঙলা লোককথা ছড়া-বাঁধা প্রভৃতির সংগ্রহ কার্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেইসব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে, কেবলমাত্র কৌতূহল নিবারণের জন্য নয়, গ্রামকে নতুনজীবনে উদ্ভাসিত করার জন্য, গ্রামসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, গ্রামের ঐতিহ্যিক পরম্পরাকে বিশেষভাবে জানা দরকার। প্রকৃতপক্ষে প্রগাঢ় দেশানুরাগের জন্যই রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংস্কৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু পল্লীর শিল্প-সাহিত্য-প্রথা-অনুষ্ঠানের সব কিছুকেই নির্বিবাদে গ্রহণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। লোকযানের বৃহৎ গণ্ডীভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে যেখানে তিনি বিকৃতি লক্ষ্য করেছেন, সেখানে তিনি সেই বিকৃতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পল্লীসংস্কৃতির বিভিন্ন সৃষ্টিধর্মী শাখার মধ্যেই পল্লীর প্রাণশক্তি বর্তমান, এ ধারণা রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই ছিল। কিন্তু বেদনার সঙ্গেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে পল্লীসংস্কৃতি বিলীয়মান; যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম, সেই রূপসৃষ্টি থেকে পল্লীবাসীরা নির্বাসিত হয়েছে; তাদের প্রাণে আর রসের আশ্রয়টুকু-ও নেই এবং এক ক্ষমাহীন গ্রাম্যতার মধ্যে গ্রামের মানুষ আকণ্ঠ ডুবে আছে। "আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখন ও ইচ্ছা করিনি যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক।" গ্রাম্যতা বলতে তিনি সেইসব সংস্কার-বিশ্বাস-কর্মকে বুঝিয়েছেন যা গ্রামজীবনের বিকৃতির প্রতিফলন মাত্র। মা ষষ্ঠী-ওলাবিবি-মনসা-শীতলা-ঘেঁটু-রাহু-শনি-ভূতপ্রেত-ব্রহ্মদৈত্য-গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা-

পাওয়া পুরুত বিধৃত জীবন-চর্যাকে তিনি গ্রামসংস্কৃতির পর্যায় ভুক্ত করতে নারাজ। বলাবাহুল্য—এসবই লোকযানের আওতা-ভুক্ত বিষয়। বিশেষ ধর্মসাধনার নামে, গ্রামে যে উচ্ছৃংখল ধর্মসমাজের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাকেও তিনি গ্রামীণ সমাজের বিকার বলেই মনে করেছিলেন। গ্রামীণ জীবনচর্যার সঙ্গে জড়িত পাঁচালি, কথকতা, যাত্রাগান, মেলা, উৎসব প্রভৃতিকেই তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতি রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। এর মধ্যেও নানা বিকৃত এবং অবক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে, তার মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে গ্রাম-জীবনকে এক সুস্থ পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দেশের এই অকৃত্রিম অংশটুকুকে ও যাঁরা অস্পৃশ্য বলে মনে করেন, তেমন শিক্ষিতজনকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, দেশ—তাঁদের কাছে একটি বিমূঢ় ভাবরূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, তেরশ বারো বঙ্গাব্দে লিখিত 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামক প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা সংগ্রহ করে একটি তুলনামূলক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ রচনার কাজে ছাত্রদের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙলাদেশের নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তাঁর বিবরণ সংগ্রহ করা, আঞ্চলিক পালপার্বনের বিবরণ সংগ্রহ করা, ব্রতকথা-ছড়া-গ্রাম্য-সঙ্গীত প্রভৃতি সংগ্রহ করা এবং পল্লীগ্রামের আভ্যন্তরীণ নানা বিবরণ সংগ্রহ করা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বাঙলার লোকসংস্কৃতি চর্চার পথিকৃৎ। প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, কাব্যেগানে ছড়ায় স্বদেশকে সন্ধান করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বাউলগান, ছেলেভুলানো ছড়া, গ্রাম্য-সঙ্গীত প্রভৃতি সংগ্রহ করে লোকসাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা—সুরু করেছিলেন। তাঁরই উৎসাহে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মেয়েলীব্রত' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। দীনেন্দ্রনাথ রায় সাধনা পত্রিকায়—বাঙলার পালপার্বণ সম্পর্কে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। 'তের'শ চৌদ্দ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত 'ঠাকুরমার ঝুলি' নামক গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা লিখে রূপকথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও, গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় মোহিতলাল মজুমদার লক্ষ্য করেছিলেন যে শিলাইদহের কুটিতে একজায়গায়

কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল রক্ষিত,—তাদের খড়ো চালের বিভিন্ন স্টাইল। পাশে কতকগুলি কাঁথা—অপূর্ব সূচীশিল্পের নিদর্শন। কয়েকটি 'শিকা'-ও ছিল। আরো কিছু গ্রামীণ শিল্পের নিদর্শন ছিল। বাউল কাগজের উপর আলতা দিয়ে অাঁকিয়ে রেখেছিলেন আলপনা।—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলী শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে, সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজো, বিবাহাদি উপলক্ষে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে, সেইগুলি কোন শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে অাঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সে-কেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিস চাই—চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফটো বা অন্য কোন রকমের প্রতিকৃতি।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোকসঙ্গীতের কোন ঘনিষ্ঠ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চা শুরু হয়নি। তবু তাঁর—সুরসৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর গানে লোকসঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই প্রথম গ্রাম সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করে,—গ্রামীণ জীবনচর্যার মধ্যে প্রবহমান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিক কোন কোন বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাতও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌছানোর পূর্বে বাঙলাভাষায় যাঁরা-লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং চর্চা করেন তাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গুরুসদয় দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শিবরতন মিত্র, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু লোকযানের বিরাট পরিমণ্ডলে, লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রটি বাঙালি গবেষকদের কাছে উন্মুক্ত হলো এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের প্রথম দশকে।

গত পঁচিশ বছরের লোকসংস্কৃতি চর্চা ঃ প্রারম্ভ ঃ পরিণতি

বিগত পঁচিশবছরের লোকসংস্কৃতি চর্চার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে আলোচনার সূত্রে পরম্পরা রক্ষার জন্য আরো দশ বছর পিছিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যেহেতু, বাঙলাভাষায় লোকসংস্কৃতি চর্চার ব্যাপারেই আমাদের

সন্ধান এবং সমীক্ষা সেই হেতু লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পূর্বসূরী হিসাবে আচার্য সুকুমার সেন ডঃ সুশীল দে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার প্রমুখ মনীষীদের নাম স্মরণ করতে হয়। লোকযানের সীমাহীন পটভূমিতে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি চর্চার যথার্থ সূত্রপাত ঘটে উনিশ শো পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী দশকে। বস্তুতঃ বাঙলাভাষায় লোকসংস্কৃতি বিশেষ করে লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রটি যে একেবারে বিশুষ্ক অবস্থায় ছিল তা' নয়—কিন্তু লোকসংস্কৃতি-সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃতি পেলো এই সময়ে। এক নতুন গতির দিকে শুরু হলো তার অভিযাত্রা। প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত ধারার গ্রামীণ সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা লোকসাহিত্য নামক—আর এক নতুন ধারণায় চিহ্নিত হয়ে ওঠে এবং লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারা রূপে লোকসাহিত্যই প্রাধান্য লাভ করে। এর একটি কারণ অবশ্যই এই যে বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকদের হাতেই এর উন্মোচন। একে একে অঙ্গনে এলেন নৃতত্ত্বের অধ্যাপক কিংবা সাধারণ গবেষক-ও কিন্তু প্রাথমিকভাবে লোকসাহিত্য চর্চার গাঁটছড়া বাঁধা থাকলো বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকদের সঙ্গে। এঁদের আগ্রহ থেকেই লোকসাহিত্য চর্চার নতুন গতিবেগের উদ্ভব।

লোকসাহিত্য-লোকসঙ্গীতের পরিচিত পরিমণ্ডলের সীমা গেল বেড়ে। উপকথা ও রূপকথার দ্বৈত প্রাধান্যকে অস্বীকার করে মাথা তুলে দাঁড়ালো আরো অনেক অভিধা। যথা—মিথক বা মিথ, লিজেণ্ড বা বীর কথা, পুরকথা, নীতিকথা, ইতিকথা, পশুকথা, গৃহকথা, রসকথা, হাস্যকথা, অলৌকিক কথা ইত্যাদি। যা ছিল কেবলমাত্র পল্লীসঙ্গীতের অভিধাভুক্ত, তারও পরিসীমা বিস্তৃত হলো। লোকসঙ্গীত রূপে পরিগণিত হলো টুসু গীত, ভাদু গীত, জাওয়া গীত—করম গীত, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, মুর্শিদি-মারফতি-বাউল এবং আরো নানা ধরনের গ্রামীণ সঙ্গীত। লোকসাহিত্যের পরিসীমায় এলো ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি; এলো লোকনাট্য আলকাপ, গম্ভীরা, লেটো, লোকভাষা, লোকনৃত্য এবং অনুরূপ আরো কিছু।

কিন্তু লোকযানের পরিমণ্ডলে-আলোচনার বিষয়রূপে গৃহীত হলো—তুক্‌ তাক-মন্ত্রতন্ত্র, লোকচিকিৎসা, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকবাদ্য, লোক-ক্রীড়া, লোকশিক্ষা, লোকব্যবহার, লোকদেবতা, ডাইনী-ভূতপ্রেত-অপদেবতা, রীতিনীতি আচার আচরণ প্রভৃতি। পূজাপার্বণ, মেলা, ঝাঁপান, গাজন-ইদ-মোরগ লড়াই, স্ত্রী আচার, বারব্রত এবং আরো বহুবিধ বিষয় লোকযানের

বিস্তৃত পরিমণ্ডলে জাঁকিয়ে বসলো। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের, বিশেষ করে সমাজের কৃষক শ্রমিক কারুজীবী-কামার কুমোর—লোহার প্রভৃতি শ্রেণীর এবং উপজাতি-জনজাতি এবং হিন্দুবর্গীয় নিম্নতলবাসী সম্প্রদায়গুলির ধ্যানধারণা-বিশ্বাস-ধর্মানুষ্ঠান-পোশাক পরিচ্ছদ-খাদ্যরীতি প্রভৃতিও লোকযানের পরিমণ্ডলকে বিস্তৃত করে তুললো। লক্ষ্য করা যায়—এই সময় থেকে পল্লি-সঙ্গীত, পল্লীশিল্প প্রভৃতির 'পল্লী' শব্দের বিলুপ্তি ঘটে যায়। তার জায়গায় 'লোক' শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যার সর্বাঙ্গে ইংরাজি ফোক-এর গন্ধ।

বস্তুত, লোকসাহিত্যের বিষয়গুলিই চর্চার ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব লাভ করেছিল। তার কারণ লোককথা এবং লোকসঙ্গীত তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীর্ঘকাল ধরেই প্রবহমান ছিল, তাই শিষ্টসাহিত্যের আলোচনার পরিমণ্ডলে এনে সাহিত্য আলোচনাকে বিস্তৃত করার অবকাশ তৈরি করলেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কোন কোন অধ্যাপক। লোকযানের যে ক্ষেত্রটি মূলতঃ সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের এবং সমাজতত্ত্বের বিষয়,—সে ক্ষেত্রটি চর্চার ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব পেলো না। তাই লোকসংস্কৃতির চতুরঙ্গ রূপে সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা নৃত্যকলা প্রভৃতির আলোচনার ক্ষেত্রগুলি অধিকাংশ সময়ে নৃতাত্ত্বিক-সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হলো না। তবু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে—চর্চার গতি যেমনই হোক না কেন—চর্চা করার নানাপথ উন্মুক্ত হলো।

বাঙ্‌লাভাষায় বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়াত আশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য আলোচনার প্রসারিত দিগন্ত তিনিই উন্মোচিত করেন। এ বিষয়ে তাঁর লিখিত বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় উনিশ'শ চুয়ান্ন খ্রীষ্টাব্দে; দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কাল উনিশ'শ সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এ কথাও বলেছেন যে জন্ম সূত্রে লোক-সাহিত্যের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ডক্টর সুনীলকুমার দে-র সান্নিধ্যে এসে এ বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ জন্মে। অধ্যাপক ডক্টর শহীদুল্লাহ-ও পরবর্তী সময়ে তাঁকে লোকসাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন। জসিমুদ্দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য সংগ্রাহকরূপে তাঁর কাজ ছেড়ে যখন তাঁর সহকর্মীরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লাভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করার জন্য চলে আসেন, তখন জসিমুদ্দিনের সাহচর্যেও তাঁর লোকসাহিত্যপ্রীতি গভীরতা লাভ

করে। কিন্তু লোকযান বা ফোকলোর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গভীরতর হয়—কলকাতায় এসে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকতত্ত্ববিৎ ভেরিয়ার এলুইনের সান্নিধ্য লাভ করে। এলুইনের গবেষণা-সহযোগীরূপে তিনি এলুইনের সঙ্গে ওড়িশার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতির সংস্পর্শে আসেন এবং ঐ সব জনজাতিদের মধ্য থেকে লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করেন। এই ভাবে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ, মুন্ডা এবং সাঁওতাল প্রভৃতি জনজাতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। বস্তুতঃ এই বিস্তারিত ক্ষেত্র সমীক্ষাই তাঁকে বাঙ্‌লা লোকসাহিত্যের গভীরে নিয়ে যায়।

এই ভাবেই তাঁর 'লোকসাহিত্য সংগ্রহের সৌখীন বিলাস' অবশেষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাঁকে তথ্যনিষ্ঠ এবং তত্ত্বানুসন্ধী গবেষক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি তাঁর লোকসাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন "বাঙালী নানা কারণে আজ কৃষিমুখী পল্লীজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রাণান্তকর প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু বাঙালী যে সংস্কৃতির সাধনা করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে, পল্লী-জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ এত অবিচ্ছেদ্য যে, তাহা হইতে তাহার মুক্তি লাভ কোন দিনই সম্ভব নহে।" বস্তুতঃ সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরেও যে লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা থেকে যায়,—সেই ধারাকে আবিস্কার করা ও বর্তমান সমাজে তার উপযোগিতার স্বরূপ চিহ্নিত করাই লোকসংস্কৃতি-বিদ্‌দের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

'বাঙলার লোকসাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রথমেই লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা বর্তমান। এর পর বিভিন্ন অধ্যায়ে, ছড়া, প্রবাদ—গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী, ইতিকথা সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রে লোকসাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'বাঙ্‌লা লোকগীতির সুর বিচার' প্রবন্ধটি, লোকসঙ্গীতের কথা ও সুরের বিচারমূলক একটি নিবন্ধ সংযোজিত করে তিনি এ কথারও প্রমাণ দেন যে নিছক গানের কথা বিশ্লেষণ করে লোক-সঙ্গীতের মর্মমূলে উপস্থিত হওয়া যায় না। মূলতঃ পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুরবৈশিষ্ট্যের উপরই তাঁর আলোচনা। পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার ঝুমুরের উপর সাঁওতালী গানের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট নয়। মূলত, অধ্যাপক

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের অভিমতের গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই, ভ্রান্তি। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের উপর কোন আলোচনাই তিনি করেন নি।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য—আজীবন লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় একনিষ্ঠ ছিলেন। বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আশুতোষ ভট্টাচার্য ছাড়া বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে এত বেশী গ্রন্থ আর কেউ রচনা করেন নি। 'বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য' গ্রন্থটির বিভাজন ঘটিয়ে, পরবর্তী সময়ে ছ'টি বৃহৎ খণ্ডে তাঁর আলোচনাকে আরো বিশদ করেন তিনি। তাঁর অন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। খণ্ডগুলি নিশ্চিতভাবে লোকসঙ্গীতের বৃহৎ কোষগ্রন্থ। বিভিন্ন খণ্ডে প্রায় চার হাজারের মত গানের সংকলন। এ ছাড়াও লোকনৃত্য সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা,—ছৌ নাচকে বহির্ভারতে পরিচিত করা, লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রভৃতি ব্যাপারে অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিশ্চিতভাবে বাঙ্‌লার লোক-সাহিত্য-লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ান। তাঁর বক্তব্য এবং আলোচনা সম্পর্কে দ্বিমত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা এবং অগ্রগামিতাকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি শুধু তাঁর নিজের চর্চাকেই অব্যাহত রাখেন নি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র গবেষকও তিনি তৈরি করেছিলেন—তাঁরই উত্তরসূরী রূপে।

লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাথমিক জোয়ার বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়েছিল—উনিশ শ' ষাটের মধ্যে। এই সময় বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়,—; প্রকাশকাল উনিশ শ সাতান্ন খৃষ্টাব্দ। পশ্চিমবাঙ্‌লার বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করে বহু বিশিষ্ট শহর ও গ্রামের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে লোকযান-লোকসংস্কৃতি চর্চার পথ আরও প্রসারিত করেন তিনি। তার সব কিছুই লোকসংস্কৃতির আওতাভুক্ত নয়, কিন্তু অনেক কিছুই গ্রামীণ সংস্কৃতির বিশ্লেষক। গ্রন্থটি মূলত কোন গবেষণা গ্রন্থ নয়,—তবু যথেষ্ট পরিমাণে তথ্যবহুল। বিনয় ঘোষের দৃষ্টিভংগী ছিল,—একজন সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিভংগী। গ্রন্থটিতে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল-ইতিহাস এবং গ্রামসমীক্ষাগত সাংস্কৃতিক রূপরেখা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষভাগে সাতজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাতটি রচনা সন্নিবেশিত। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), পশ্চিমবঙ্গের প্রাগিতিহাস (ধরণী সেন), পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যকলা (সরসীকুমার

সরস্বতী), ধর্মঠাকুর ও মনসা (সুকুমার সেন), পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাসমাজ (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য), পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভূগোল (রাধাগোবিন্দ বসাক) এবং ইতিহাস রচনার একটি সাম্প্রতিক পদ্ধতি (নীহাররঞ্জন রায়)—এ সমস্ত রচনার মধ্যে সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনার সর্বাঙ্গীন পরিচয় মেলে। মূলত, লোকসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও, গ্রন্থটির মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি-লোকযানের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যায়। গ্রন্থটির মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপের নানা পরিচয়ও বিধৃত। তবু লোকসংস্কৃতি বা লোকযানের বিষয়রূপে পশ্চিমবাঙলার পালাপার্বণ সম্পর্কিত একটি রূপরেখার নির্মাতারূপে প্রয়াত বিনয় ঘোষের নাম অবশ্যই স্মরণীয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' নামক গ্রন্থটির কথা। লোকসংস্কৃতি, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নয়, কিন্তু সংস্কৃতি যে স্থাবর নয়, গতিশীল এবং বিবর্তনশীল, বিভিন্ন সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিজের রূপান্তর ঘটাতে ঘটাতে সংস্কৃতির অভিযাত্রা,—এই স্পষ্টীকৃত ধারণা থেকে লোকসংস্কৃতি চর্চার অনেক সূত্রই আবিষ্কার করা যায়। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে লোকসাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারকে পথিকৃৎ বলা চলে। তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ—মার্কসবাদ ও লোকসাহিত্য। বস্তুতঃ লোকসংস্কৃতিচর্চার বহুমুখী প্রচেষ্টার বিশদ বিবরণ লাভের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু একথা ঠিক যে এই সময় থেকেই লোকসংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্র প্রশস্ত হতে থাকে।

লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি-লোকযানের চর্চায় আজীবন নিরত ছিলেন প্রয়াত শঙ্কর সেনগুপ্ত। যে-কোন কারণে হোক্ বাঙালি লোকতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে শঙ্কর সেনগুপ্ত কিছু পরিমাণে অবহেলিত কিংবা তেমন ভাবে উচ্চারিত নন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে,—'কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতি চর্চা' যদি কেউ করে থাকেন, তা'হলে শঙ্কর সেনগুপ্ত সেক্ষেত্রে অন্যতম নাম। এক্ষেত্রে তিনি নবাগতও ছিলেন না। উনিশ'শ পঞ্চাশ ও ষাট খৃষ্টাব্দের মধ্যে লোকসংস্কৃতি চর্চার যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, তার অন্যতম পথচারী ছিলেন তিনি। কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না; নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন তিনি। ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত—'ফোকলোর' পত্রিকাটি বহির্ভারতেও স্বীকৃতি-লাভ করেছিল। বস্তুতঃ লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতি চর্চার নিষ্ঠাবান এবং মননশীল গবেষকরূপে তাঁর কৃতি এবং কৃতিত্ব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েকটি ইংরাজি

গ্রন্থ ও কয়েকটি বাঙলা গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্কর সেনগুপ্ত, আমৃত্যু তাঁর লোক-সংস্কৃতি চর্চাকে গতিশীল রেখেছিলেন। বাঙালী লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি' নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্কর সেনগুপ্ত খ্যাতি ও সম্মান লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। ফোকলোরের বাঙলা প্রতিশব্দ রূপে তিনি 'লোকবৃত্ত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাঙলা ভাষায় তিনি অন্য যে সব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম—'লোকবৃত্ত : ক্ষেত্র সমীক্ষার মূলসূত্র', 'বাঙালী জীবনে বিবাহ', 'বাঙালীর খেলাধূলা', 'লোকবৃত ও সাহিত্য', 'দেশবিদেশের লোককথা' প্রভৃতি। লক্ষ্য করা যায়, শঙ্কর সেনগুপ্ত বাঙলা ভাষায় (এবং ইংরাজী ভাষাতেও) লোকসংস্কৃতি চর্চার তাত্ত্বিক সীমানার দিকে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেন। তাঁর অনেক অভিমতই বিতর্কিত এবং যথার্থ চর্চার ক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ থাকা অবাঞ্ছিত নাও হতে পারে। কিন্তু এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ ঘটানো হবে যে—শঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর অকাল প্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত নিরঙ্কুশ গবেষকরূপে নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। লোকসংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার অভিপ্রায় নিয়েই তাঁর চর্চা ছিল অব্যাহত। এই প্রসঙ্গে তাঁর লোকবৃত্ত ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। নাগরিক সমাজে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের প্রভাব ও ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর আলোচনায় তিনি জার্মান নাট্যকার ব্রেশ্‌ট্, রুশ ঔপন্যাসিক বোরিস পাস্টারনাক ও কবি অডেনের রচনার উপর ফোকলোরের প্রভাব সম্পর্কে বিশদ এবং মননশীল আলোচনা করেছেন। তাঁদের সৃষ্টিকর্মে লৌকিক উপাদান ও লৌকিক ঐতিহ্য কিভাবে তাঁদের প্রভাবিত করেছে তাঁর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বহু তথ্য ও তত্ত্বের প্রয়োগ করে শঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর মনন-শীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য একটি গ্রন্থে মে-ডে-র উৎসসন্ধান থেকে সুরু ক'রে সংগ্রামী শ্রামকদের উপর লোকসংস্কৃতি-লোকযানের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর আলোচনা নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তেভাগা আন্দোলনে লোকসংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ক আলোচনায় কিছু পরিমানে অতিকথন এবং বহুবিধ বিতর্কের উপাদান থাকলেও শ্রমিক মধ্যবিত্ত এবং কৃষক শ্রেণীর পৃথক পৃথক তিনটি আন্দোলন যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন রূপে চিহ্নিত করা যায়,—তেমন বক্তব্য সেগুলির মধ্যে বর্তমান। বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যে স্বভাবতঃই লোকসংস্কৃতির নানা প্রভাবে প্রভাবিত হয়,—মে-ডে এবং

তেভাগা আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শঙ্কর সেনগুপ্ত তেমন অনেক তথ্যের উপস্থাপনা করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে লোকসঙ্গীতের ব্যবহার লোকসঙ্গীতের সুর-অবলম্বনে নতুন গানের সৃষ্টি, রাখীবন্ধন, অরন্ধন, এতানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলনকে গতিশীল করার চেষ্টা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা উল্লেখযোগ্য। তেভাগা আন্দোলনের সমর্থনে কৃষকরা নিজেই গান ও ছড়া বেঁধে লড়াইতে সামিল হয়েছিল। শঙ্কর সেনগুপ্ত-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থেকে—অন্ততপক্ষে এ কথা মেনে নিতে হয় যে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ ভাবেই ছিলেন নিরলস, নিষ্ঠাবান গবেষক।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার উপর এ-পর্যন্ত অনেক লেখকের লেখাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ প্রবন্ধই মুখ্যতঃ সংগ্রহ-কার্যের নিদর্শণ। তবু বিগত পঁচিশবছরের লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য চর্চার পরিমণ্ডলে যাঁরা এ বিষয়ে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের ছাত্র ছিলেন এবং পেশাগত ভাবে তাঁদের অনেকেই বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় ব্রতী। এঁদের মধ্যে আছেন তুষার চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পল্লব সেনগুপ্ত, দুলাল চৌধুরী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বরুণ চক্রবর্তী, শিশির মজুমদার, সুধীর চক্রবর্তী, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ মিত্র, মলয় বসু প্রমুখ। এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকজনের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—, যাঁরা নিভৃত একনিষ্ঠতায় লোকসংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে জড়িত। এঁদের মধ্যে আছেন মানিকলাল সিংহ, অমলেন্দু মিত্র, মানিক সরকার, পুলকেন্দু সিংহ, শৈলেন দাস, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম মাইতি এবং আরো অনেকে। গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নামও এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে 'বাঙলার সং প্রসঙ্গ' এবং পথনাটিকার সংগ্রহ।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত লোকসাহিত্য-সম্পর্কিত পাঠক্রমের বাইরে লোকযানের বিরাট পরিমণ্ডলে লোকসংস্কৃতি চর্চার দিকে কেউ কেউ অবশ্যই সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু লোকসংস্কৃতি চর্চার জোয়ার অনেকাংশেই স্তিমিত। বর্তমান সময়ে, যাঁরা লোকসাহিত্য-লোক-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শ্রম নিষ্ঠা এবং মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন—তাঁদের সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু এর মধ্যেই যাঁদের নিষ্ঠা ও শ্রমের ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রের পরিচয় দেওয়া যেতে

পারে। প্রসঙ্গতঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপসন্ধান' নামক তাত্ত্বিক গ্রন্থটির উল্লেখ করা যেতে পারে। তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চাকে কেবলমাত্র চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য সম্পর্কিত একটি বিভাগও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ লোকসংস্কৃতি-লোক-সাহিত্যের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রটিকে শিক্ষাগত ভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠক্রমে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব তাঁরই। তার পরিণাম এবং ফলাফল অবশ্য এখনও অলভ্য।

মুখ্যতঃ ছাত্র ও গবেষকদের কথা মনে রেখেই তুষার চট্টোপাধ্যায়ের বৃহৎ শিরোনামের গ্রন্থটি লিখিত। বিদেশের তাত্ত্বিক আলোচনার বহু বক্তব্য গ্রন্থটিকে গুরুভার করেছে। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তুর অঙ্গনে উপস্থাপিত হয়েছে— 'ফোক্‌লোর—পরিভাষার সমস্যা ও সংজ্ঞা নির্ণয়' লোকসংস্কৃতি : প্রসঙ্গ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার ভূমিকা ; লোকসংস্কৃতি : শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও বিষয়ানুসন্ধান, মতবাদ ও অনুশীলন পদ্ধতি ; লোকসংস্কৃতি চর্চা : প্রয়োজন-পরিবর্তন-ভবিষ্যৎ' এবং 'ক্ষেত্রানুসন্ধান'। বাঙ্‌লা ভাষায়—এই ধরণের অ্যাকাডেমিক গ্রন্থের সংখ্যা নেই বললেও চলে ; সে দিক থেকে গ্রন্থটি লোকসংস্কৃতি-অনুসন্ধিৎসুদের অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দেবে। সাধারণভাবে যাঁরা লোকসংস্কৃতিকে জানার পক্ষপাতী তাঁদের কাছে বিদেশী পণ্ডিতদের ধারণাগুলি এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি করতেই পারে। বলাবাহুল্য এই জাতীয় গ্রন্থ সর্বদা সুখপাঠ্যও হয় না। গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বর্তমান,—তা হচ্ছে গোপাল হালদার-লিখিত ভূমিকা। এমন একটি জটিল গ্রন্থের এমন একটি সাবলীল, স্বচ্ছ এবং সচ্ছন্দ তাত্ত্বিক ভূমিকা গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপসন্ধান' তুষার চট্টোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ গবেষণাকে চিহ্নিত করেছে।

লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী অবশ্যই এক পরিচিত নাম। চর্চার ক্ষেত্রে তিনি একদিকে যেমন তাঁর গতিশীলতাকে অব্যাহত রেখেছেন, তেমনি তাঁর দৃষ্টিকেও বিভিন্ন ধারায় প্রসারিত করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়,—যার মধ্যে আছে "লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ', 'বাঙ্‌লা প্রবাদে স্থান কালপাত্র', 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' 'লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ' ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই 'বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস।' গবেষণা, ইতিহাস ও

শিল্পবোধের সঙ্গে তাঁর শ্রম ও নিষ্ঠার এক অসাধারণ পরিচয় আছে গ্রন্থটিতে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-সম্পর্কিত চর্চার প্রারম্ভ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিবরনী গ্রন্থটি লোকসাহিত্যচর্চার আলোচনা-বিষয়ক একটি সমৃদ্ধ আকর গ্রন্থ। বরুণ চক্রবর্তীর সন্ধানী দৃষ্টি কলকাতা ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়, গ্রামাঞ্চলেও। গ্রামাঞ্চলেও যে অনেক অনুসন্ধিৎসু সংগ্রাহক এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু গবেষক আছেন—তাঁদের কথাও তিনি বিস্মৃত হন নি। এদিক থেকে তাঁর দৃষ্টি যথার্থভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টি।

অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁর নিরলস চর্চার পরিচয় দিয়েছেন এবং এখনও তা অব্যাহত। তাঁর লেখা 'পূজাপার্বনের উৎস কথা' এদিক দিয়ে একটি বিতর্কিত কিন্তু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রয়াত লোকসংস্কৃতি গবেষক অরুণ রায়ের উৎসাহ-উদ্দীপনায় এবং মুখ্যত দুলাল চৌধুরীর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত 'আকাদেমী অব ফোক্‌লোর' লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছে। দুলাল চৌধুরী, 'চাকমা প্রবাদ' এবং 'বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থ ছাড়াও বহু প্রবন্ধের লেখক। এই প্রসঙ্গে দিব্যজ্যোতি মজুমদারের নামও উল্লেখযোগ্য। দেশবিদেশের লোককথা সম্পর্কিত আলোচনা এবং লোকসাহিত্য-সঙ্গীত সম্পর্কিত বহু প্রসারিত প্রবন্ধ রচনা করে দিব্যজ্যোতি এখনও তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে চলেছেন। অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক 'বাঙ্‌লা ছড়ার ভূমিকা' 'প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের গান' এবং আরো বেশ কয়েকটি মননশীল গ্রন্থ রচনা করে বাঙ্‌লা ভাষায় লোকসংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শিশির মজুমদার দু'দিক থেকে কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর রচিত 'উত্তর গ্রামচরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের প্রসারক এবং 'উত্তরবঙ্গ লোকযান' নামক প্রতিষ্ঠানের স্থাপক হিসাবে তিনি গ্রামীন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চাকে নিছক সন্ধান চর্চার সীমায় আবদ্ধ রাখেন নি।

এ-প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি'তে। লেখক অধ্যাপক বঙ্কিম মাহাত। পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বিহারের অন্তর্গত সিংভূম জেলার ধলভূম অঞ্চলের লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে লেখকের গবেষণার নিষ্ঠা ও শ্রমের পরিচায়ক। বিস্তৃত ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকেই গ্রন্থের উপাদান সংগৃহীত।

বলাবাহুল্য, এভাবে বাঙলাভাষায় লোকসংস্কৃতি চর্চার বিগত পঁচিশ বছরের রূপরেখা দেওয়া স্বল্প পরিসরের বিষয় নয়। শুধু কলকাতা-কেন্দ্রিক চর্চার কথা নয়, ইদানীং পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন জেলাতে ও লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমী।' এই আকাদেমীর পরিচালনায় লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি-সম্পর্কিত অনেক প্রবন্ধ এবং কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত ছত্রাক পত্রিকাও তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সনৎ মিত্র সম্পাদিত লোকসংস্কৃতি পত্রিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালনাধীন লোকশ্রুতি পত্রিকা ও উল্লেখযোগ্য।

বস্তুতঃ লোকসংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রের যাঁরা প্রসার ঘটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রবোধ ভৌমিক, তারাপদ সাঁতরা, আশিস রায়, অমল দাস এবং আরো অনেকের নামই উল্লেখযোগ্য। বিগত পঁচিশবছরের লোকসংস্কৃতি চর্চার বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে লোকযানের পরিমণ্ডলে, লোকসংস্কৃতির যে বিভিন্ন শাখার বিস্তার—তার সম্যক পরিচয় এখনও আমাদের করায়ত্ত নয়। তা' ছাড়া বাঙলা ভাষাতে তার প্রসার নানাকারণেই অবরুদ্ধ।

সমীক্ষা

একথা ঠিকই যে বাঙলাভাষায় লোকযান-লোকসংস্কৃতি চর্চার আধুনিককাল এখনও অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেনি। লোকসংস্কৃতিচর্চার ঝোঁক অবশ্যই বেড়েছে, কিন্তু লোকযানের বিভিন্নমুখী বিষয়ের সম্যক অনুশীলনের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত এবং গতিশীল নয়। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে লোকসংস্কৃতির বিচারের ক্ষেত্র এখনও সংকুচিত। এ কথা বলতে পারি না যে এ ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি চর্চার মান বিদেশী গবেষকদের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী গবেষকদের দোহাই কেউ কেউ অবশ্যই দিয়েছেন। কিন্তু চর্চা বললে যে গতিশীলতা এবং চিন্তাভাবনার গভীরতা বোঝায়, তার পরিচয় সহসা মেলে না। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বোঝা যায় যে লোকযান চর্চার ক্ষেত্রটি বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলনের একটি সমন্বয় ক্ষেত্র বলে, সেই বিদ্যাকে আত্মস্থ করা শ্রম ও সময়সাপেক্ষ অবশ্যই। পাশ্চাত্যজগতের লোকসংস্কৃতিচর্চা যে-ভাবে বিজ্ঞানত্বলাভ করেছে, যে-ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং উপলব্ধির মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-

বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে তার গুরুত্ব অবশ্যই অসাধারণ। বস্তুতঃ কালে ক্রোন্ টাইলর, ফ্রেজার, ম্যাক্সমুলার, লেভিস্ট্রাউস, ভল্‌াডিমির প্রপ, ব্যসকম, ডরসন অ্যালান ড্যাণ্ডিস, রুথবেনিডিক্ট, ম্যালিনাউস্কী প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতগণ নিজস্ব অভিমতের পক্ষে যুক্তিবিন্যাস করে লোকযান চর্চার ক্ষেত্রটিকে বহুবিস্তৃত এবং জীবন্ত করে তুলেছেন। বাঙলাভাষায় লোকসংস্কৃতিচর্চার গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে এঁদের নাম অপরিজ্ঞাত নয়, এমন কি এঁদের নামও বহুবার উল্লেখিত হতে দেখা যায়, কিন্তু ওঁদের মতবাদ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা বাঙলাভাষায় অলভ্য। এঁদের বক্তব্য ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য এবং কিভাবে প্রযোজ্য, তা এখনও তেমন করে ভাবা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, বিগত পঁচিশবছরের লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রটি এখনও সংগ্রহ-পর্যায় থেকে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বেগবান আলোচনার হদিশ অবশ্যই মেলে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতি-চর্চা এখনও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে করা চলে না। পরীক্ষা পাশের জন্য কিংবা ডিগ্রীলাভের জন্য লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা মূলতঃ একটি সহজলভ্য প্রক্রিয়ায় পরিণত হওয়ার ফলে, পঠন পাঠনের অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্র ছাড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ও তেমন প্রবল হতে পারেনি। এর ফলে চর্চার মধ্যে গভীরতা এবং মননশীলতার পরিচয়ও গৌণ হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, লোকযান অনুশীলন-পরিধির ব্যাপকতার জন্য একক ভাবে এই বিদ্যার চর্চা করা দুরূহ কর্ম। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লোকসঙ্গীত লোকসাহিত্যের তথা লোকযানের একটি অংশ-বিশেষ। কিছু গান সংগ্রহ করা এবং গানের অর্থ বিশ্লেষণ করা-কে লোকসঙ্গীতের চর্চা বলার কোন যুক্তি নেই। বস্তুতঃ লোকসঙ্গীতের চর্চা একদিকে যেমন তার সুরের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে, তেমনি অন্যদিকে, গানের বিষয়বস্তু, তার ভাবনার উপাদান কি ভাবে ইতিহাস-ভূগোল জনবিন্যাস-অর্থনীতি এবং ট্রাডিশানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সব বিষয়ে ও গবেষণাকে অব্যাহত রাখে। লোকসংস্কৃতি চর্চাকে উন্নতমানযুক্ত করতে হলে যে ভাবে আঞ্চলিক ভাষা ও সমাজের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হওয়া দরকার এবং অধ্যয়নশীল হওয়া দরকার, তা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে না। তাই যে-কোন ইউরোপীয়-মার্কিন পদ্ধতি, তা আঙ্গিকসংস্থানবাদী হোক্, ফ্রয়েডীয় হোক, বস্তুবাদী হোক, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি হোক,—এই সব তত্ত্ব ভারতীয় লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণের

ক্ষেত্রে কিভাবে কতখানি প্রযোজ্য তাও বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে লোকসংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক অঙ্গের প্রসার ঘটেছে। সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্যোগে নাগরিক মঞ্চেও উপস্থাপিত হচ্ছে একান্তভাবে গ্রামীন উৎসবের আনুষ্ঠানিক গান। লোকনৃত্যের পদভারে প্রকম্পিত হচ্ছে নাগরিক মঞ্চ। টুসু ভাদু-র মত নারীকণ্ঠে ব্রত সঙ্গীতও উপস্থাপিত হচ্ছে দূরদর্শন আকাশবাণীর মাধ্যমে। ফলে লোকসঙ্গীত-লোকনৃত্যের যে নাগরিক রূপায়ন ঘটছে, তাতে লোকসংস্কৃতির প্রসার ঘটছে কিনা তাও বিচার্য, বস্তুতঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকসঙ্গীত-লোকনৃত্য-লোকনাট্য পরিবেশিত হলেও তাকে 'চর্চা' নামে অভিহিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাঙলাভাষায় লোকসংস্কৃতি চর্চা সুধীজনের কাছে এখনও তেমন কোন প্রত্যাশা নিয়ে হাজির হতে পারেনি। সমাজবিবর্তনে লোকসংস্কৃতির প্রভাব এবং প্রয়োগ সম্পর্কিত সূত্রগুলি এখনও অনাবিষ্কৃত। গণ আন্দোলনে লোকসংস্কৃতির প্রভাব, লোকসংস্কৃতির মূল সূত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে গণ আন্দোলনের যৌক্তিকতা, লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব না দিয়ে গণআন্দোলন পরিচালনায় ব্যর্থতা আসে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান, নগরসংস্কৃতি গঠনে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা, আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতির বিচার শ্রেণীবিভক্ত সমাজে লোকসংস্কৃতির স্বরূপ,—জাতীয়তাবাদ ও লোকসংস্কৃতি ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজব্যবস্থায় লোকসংস্কৃতির ভূমিকা, লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক—এই ধরণের নানাবিষয় সম্পর্কে গভীর ভাবনাচিন্তার অবকাশ অবশ্যই আছে। বস্তুতঃ সার্মগ্রিক ভাবে সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে বাঙলাভাষায় লোকসংস্কৃতি চর্চা, বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যেও সাবালক হয়ে ওঠেনি।

সম্পাদকের সংযোজন :

এই প্রবন্ধের লেখক, নিজেও দীর্ঘদিন ধরে লোকসংস্কৃতিচর্চা করে আসছেন। উনিশশ পঞ্চাশ থেকে ষাট খৃষ্টাব্দের মধ্যে যাঁরা লোকসংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, লেখক-ও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পশ্চিমসীমান্ত বাঙলার লোকযান'। এ ছাড়াও 'লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ' 'লোকসাহিত্যে ঈশপ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁরই রচনা। লেখক নিজেকে এই প্রবন্ধের আলোচনার বাইরে রেখেছেন বলেই এ সব কথা বলতে হল।

গ্রুপ থিয়েটার স্মরণে

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

সম্পাদকমশাই বলেছেন, গত ২৫ বছরের গ্রুপ থিয়েটার বিষয়ে কিছু লিখতে। সম্পাদকমশাই কর্মব্যস্ত মানুষ, তিনি হয়তো জানেন না যে গ্রুপ থিয়েটারের বিধাতারা গত ২৩ জানুয়ারি, ১৯৯২, রবীন্দ্রসদনে এক সভায় বেশ ধুমধাম করেই গ্রুপ থিয়েটারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। তাঁরা রায় দিয়ে জানিয়েছেন যে, গ্রুপ থিয়েটার বলে কিছু নেই আর। সবই বাণিজ্যিক থিয়েটার। আর তাঁরা দুই জাত মানবেন না, দুই জাতের থিয়েটারকে তাঁরা মিলিয়ে দিয়েছেন। মিলিয়েছেন, তাঁরা মিলিয়েছেন। গত পঁচিশ বছর গ্রুপগুলি কী কাজ করেছে, সে-দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে, কোথায় এর বিস্তার, কোথায় এর বিনাশ। ১৯৬৮-৬৭ থেকে কয়েকটি দলের কাজের তালিকা পেশ করছি। কৃতিত্বের সঙ্গে দীর্ঘকাল যারা কাজ করছে, তাদের কয়েকটি নাম উল্লেখ করছি। স্মৃতিকে একটু ঝালাই করে নেওয়ার জন্য এই তালিকা পেশ।

বহুরূপী ॥ ১৯৬৪ : রাজা, রাজা, অয়দিপাউস। ১৯৬৭ : বাকি ইতিহাস। ১৯৬৯ : বর্বর বাঁশী, ত্রিংশ শতাব্দী। ১৯৭০ : কিংবদন্তী। ১৯৭১ : পাগলা ঘোড়া, অপরাজিতা, চোপ আদালত চলছে। ১৯৭২ : গণ্ডার। ১৯৭৪ : ঘরে বাইরে। ১৯৭৫ : সুতরাং। ১৯৭৬ : যদি আর একবার। এর পরে কুমার রায়ের পরিচালনায় মৃচ্ছকটিক, মালিনী, কিনু কাহারের থেটার, রাজদর্শন, নিন্দাপঙ্কে, গালিলেও, মিঃ কাকাতুয়া, শ্যামা প্রভৃতি নাটক প্রদর্শিত হয়েছে।

এল্. টি. জি.—পি. এল্. টি. ॥ ১৯৬৩ : তিতাস। ১৯৬৫ : কল্লোল। ১৯৬৭ : তীর। ১৯৬৮ : মানুষের অধিকারে। ১৯৭০ : বর্গী এলো দেশে। ১৯৭১ : টিনের তলোয়ার, সূর্যশিখর। ১৯৭২ : ব্যারিকেড। ১৯৭৩ : টোটা [পরে ১৯৮৫তে এই নাটকই মহাবিদ্রোহ]। ১৯৭৪ : দুঃস্বপ্নের নগরী। ১৯৭৭ : এবার রাজার পালা। ১৯৭৮ : তিতুমীর। ১৯৭৯ :

স্টালিন ৩৪। ১৯৮০ : দাঁড়াও পথিকবর। ১৯৮২ : পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। ১৯৮৩ : শৃঙ্খল ছাড়া। ১৯৮৪ : আজকের শাজাহান। ১৯৮৫ : মহাবিদ্রোহ। ১৯৮৮ : অগ্নিশয্যা। ১৯৮৯ : একলা চলো রে। ১৯৯০ : লালদুর্গ।

নান্দীকার॥ ১৯৬৪ : মঞ্জরী আমের মঞ্জরী। ১৯৬৫ : ৭টি একাঙ্ক। ১৯৬৬ : যখন একা, শের আফগান। ১৯৩৮ : তিনটি একাঙ্ক। ১৯৬৯ : তিন পয়সার পালা। ১৯৭০ : দুটি একাঙ্ক। ১৯৭১ : হে সময় উত্তাল সময়, বীতংস। ১৯৭২ : নটী বিনোদিনী। ১৯৭৪ : ভালোমানুষ। ১৯৭৫ : আন্তিগোনে। ১৯৭৬ : সদাগরের নৌকা। ১৯৭৮ : ফুটবল। এর পরে রুদ্রপ্রসাদের পরিচালনায় খড়ির গণ্ডী, শঙ্খপুরের সুকন্যা, শেষ সাক্ষাৎকার, ব্যতিক্রম, হননমেরু, নীলা, মাননীয় বিচারকমণ্ডলী প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়েছে।

শতাব্দী [বাদল সরকার] ॥ এবং ইন্দ্রজিৎ (১৯৬২-তে লিখিত, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত)। ১৯৬৭ : বাকি ইতিহাস (বহুরূপী অভিনীত)। ১৯৬৯ : ত্রিংশ শতাব্দী (বহুরূপী অভিনীত। বহু পরে বাদল সরকার এটি 'তৃতীয় থিয়েটার'-এর রীতিতে অভিনয় করেন)। ১৯৭২ : স্পার্টাকুস। ১৯৭৪ : মিছিল। ১৯৭৫ : ভোমা। ১৯৭৬ : সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস। ১৯৯০। পদ্মানদীর মাঝি। ১৯৯১ : আণ্ড্রোক্লিস ও সিংহ।

পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য পরিচালকের নাম : অসিত মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখার্জি, মনোজ মিত্র, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, দীপেন সেনগুপ্ত, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শাঁওলী মিত্র, ঊষা গাঙ্গুলি, রমাপ্রসাদ বণিক, দেবাশিস মজুমদার, নভেন্দু সেন।

মনোভাব ও প্রযোজনার দিক থেকে এঁদের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে। কিন্তু এঁদের মিল একটা জায়গায়। এঁরা সমাজমনস্ক গভীর নাটক করায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকার সর্বদা, সর্বত্র রক্ষা করতে পেরেছেন কিনা, কতটা পেরেছেন, তা আজকের আলোচ্য নয়। কিন্তু এই অঙ্গীকার তাঁদের ছিল এবং তা রক্ষার জন্যে তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, এটাই এঁদের ঐক্যসূত্র। এই ঐক্য নিরেট ঐক্য নয়। সকলের স্বাধীন বিচিত্র আত্মপ্রকাশের সূত্রে সেই ঐক্য গ্রথিত।

বাণিজ্যিক থিয়েটারেও ঐক্য আছে। যে-কোনোভাবে মুনাফা করাই এই লক্ষ্যের ঐক্যসূত্র। সমাজের অগ্রগতি নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। পশ্চাৎগতিসম্পন্ন, নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর নাটকও যদি মুনাফা দেয়, তা

তাঁরা অবলীলায় গ্রহণ করেন। এর ফলে কখনো আসে আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, কখনো বুদ্ধি-যুক্তি-বর্জনের প্রচেষ্টা, এসে যায় নাট্য-বহির্ভূত চটকদার ঘটনা ও চরিত্র, আসে ভাঁড়ামি, আসে অশালীন নৃত্য। মুনাফার লোভে নাট্যের মঞ্চেও চলে ক্যাবারে। কোনো জীবনজিজ্ঞাসা নেই, নাট্যনিরীক্ষাও নেই। একঘেয়ে প্রমোদের মাল বয়ে বয়ে ক্লান্ত, মাঝে মাঝে তাই উত্তেজনার ইন্জেকশনে কৃত্রিম বা বিকারগ্রস্ত প্রাণ সঞ্চার-প্রয়াস, এর মধ্যেও হয়তো দু-একজন ব্যতিক্রম আছেন। কিন্তু তাঁরা দাঁড়াবার মতো ঠাঁই পান না। অবশেষে গড্ডলিকা-স্রোতে গা ঢালেন।

এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবেই গ্রুপ থিয়েটারের পত্তন। এরও পটভূমি হিসেবে ছিল গণনাট্য সঙ্ঘ, ছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘ। সমাজ-সম্পর্কে নানা প্রশ্ন এঁদের। সমাজের ন্যায়-সঙ্গত বিন্যাসে এঁদের আগ্রহ। এই সমাজ-বিন্যাস ব্যক্তির বিনাশে নয়, ব্যক্তির বিকাশে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন এই প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের একজন বড় নেতা। তিনি এই সূত্রে লেনিনের একটি উক্তি উদ্ধার করেছিলেন, '......but in this matter it is absolutely necessary to secure great scope for personal initiative and individual tendencies, scope for thought and fantasy, scope for form and content." সমাজ-মনস্কতার সঙ্গে ব্যক্তি-উদ্যোগের সমন্বয়—এটাই ছিল লক্ষ্য, মুনাফা লক্ষ্য ছিল না। এই সমন্বয় কতটা সম্ভব হয়েছে, সমাজ-চিন্তার চাপে ব্যক্তি কোথায় কতটা পিষ্ট হয়েছে, ব্যক্তিদ্রোহ সমাজচিন্তাকে কতটা ধ্বংস করেছে, এই বিতর্কের মধ্যে এই মুহূর্তে আমরা যাচ্ছি না। শুধু মনে রাখছি, এঁদের লক্ষ্য, এঁদের আদর্শ। এই আদর্শই গ্রুপ থিয়েটারের ভিত্তি। হয়তো স্বাধীনতা একটু বেশী নিয়েছে কেউ, কেউ-বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তেমন মানতে চায় নি। এই সব নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। এইগুলির মধ্যে আমরা আপাতত প্রবেশ করব না। আমরা শুধু মনে রাখব যে, এই সব বিতর্ক সত্ত্বেও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক থিয়েটার থেকে পৃথক। পরস্পর-বিরোধী কথাটাও বলা যায়। বিরোধী যে তার একটা বড় প্রমাণ, বাণিজ্যিক থিয়েটারের মালিকরা বা কোন কোন লেসী অনেক সময় গণনাট্য সঙ্ঘ বা গ্রুপ থিয়েটারকে তাঁদের হল্ ভাড়া দিতে চান নি, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারকে বাড়তে দিতে চান নি। তা সত্ত্বেও এই থিয়েটার বেড়েছে।

আর বাণিজ্যিক থিয়েটার? সংখ্যায় দু-একটি বেড়েছে। আবার

কয়েকটি অবলুপ্তও হয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েকটি হল ধনকুবেরদের কাছে বন্ধক পড়ে আছে, শিল্পগুণ বা সমাজচেতনা কোনো দিক দিয়েই অগ্রসর হয় নি। দু-একটি হল অবশ্য আর্থিক সাফল্য পেয়েছে। যেমন, স্টার, বাণিজ্যিক থিয়েটারের মুকুটমণি স্টার। ১৯৭১-এর পয়লা এপ্রিল থেকে স্টারের লেসী ছিলেন রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া; স্টারের এই রঞ্জিৎ-যুগের অনেক নাটকের নির্দেশকও রঞ্জিৎমল। গ্রুপ থিয়েটারের কেউ কেউ যদি তাঁর নির্দেশনাধীনে আর্ট, বিপ্লব এবং বিক্রয়যোগ্য মাল তৈরির কন্ট্র্যাক্ট নেন, তবে তাঁকে আমরা বিদায় জানাবো এবং সেটা খুব একটা হাপুস-নয়নের বিদায় হবে না।

রঞ্জিৎমলের আগে সলিলকুমার মিত্র ছিলেন স্টারের লেসী। ১৯৩৮ থেকে ১৯৭৩। পঁয়ত্রিশ বছর। দীর্ঘ সফল পঁয়ত্রিশটা বছর। দক্ষ ও সহৃদয় প্রশাসক ছিলেন সলিল মিত্র। শিল্পী ও কর্মীদের বঞ্চিত তো করেন নি বটেই, বরং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, বোনাস ইত্যাদি দিয়েছেন। বাংলা মঞ্চের শ্রেষ্ঠ প্রশাসক বা 'মালিক' বলা যেতে পারে তাঁকে। এত দীর্ঘকাল এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার কৃতিত্ব তাঁর। থিয়েটার মালিকের বাড়ি তাঁদের। পারিবারিক পরিবেশ থেকেই যেন অভিজ্ঞ হয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর আমলে দু'জন নির্দেশক কাজ করেছেন স্টারে। প্রথম পনেরো বছর (এও ৩৮-৫৩) মহেন্দ্র গুপ্ত, শেষের কুড়ি বছর (১৯৫৩-৭৩) দেবনারায়ণ গুপ্ত।

প্রাচীন লোকদের মনে পড়তে পারে অপরেশচন্দ্র-প্রবোধ গুহ জুটির কথা। তাঁরাও আর্ট থিয়েটারের হয়ে স্টারে কাজ করেছিলেন (১৯২৩-২৯)। কিন্তু ১৯২৯-এ প্রবোধ গুহ আর্ট থিয়েটার ত্যাগ করেন, অর্থাৎ জুটি ভাঙেন। অপরেশচন্দ্র ১৯৩৩ অবধি প্রবোধবাবুকে ছাড়াই থিয়েটার চালান। তাছাড়া আর্ট থিয়েটার শেষ পর্যন্ত আর্থিক দিক দিয়ে অসফল হয় এবং দেনার দায়ে আর্ট থিয়েটার উঠে যায়। স্টারে সলিলবাবু-দেবনারায়ণবাবু অসফল হন নি আর্থিক দিকে থেকে। রাজনৈতিক হামলা এবং আরো হামলার হুমকিতে ভীত হয়ে সলিলবাবু স্টার ছেড়ে দেন।

১৯৩৩-এ আর্ট থিয়েটার উঠে যাওয়া এবং ১৯৩৮-এর ২৯ মার্চ সলিলবাবু লেসী হওয়া—এর মধ্যে বছর চারেকের (১৯৩৪-৩৭) একটা ফাঁক। এই ফাঁকে স্টারে অভিনয় করলেন একজন ভদ্রলোক। তাঁর নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ইনিও বাণিজ্যিক থিয়েটারের লোক। তখন গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্বই ছিল না। বলা যায়, ইনি থিয়েটারের লোক, আর্টমনস্ক। এঁর এই চার বছরের কার্যতালিকার দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১৯৩৪ঃ অভিমানিনী (যতনাথ খাস্তগীর)। ফুলের আয়না (নরেন্দ্র দেব রচিত সাধারণ মঞ্চে অভিনীত প্রথম শিশুনাট্য)। বিরাজ বৌ (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের শিশিরকুমার প্রদত্ত নাট্যরূপ)। সরমা (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি)। দশের দাবী (শচীন সেনগুপ্ত)। বিজয়া (শরৎচন্দ্র)।

১৯৩৫ঃ শ্যামা (রবীন্দ্রনাথ/ সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত)। রীতিমত নাটক (জলধর চট্টোপাধ্যায়)।

১৯৩৬ঃ অচলা (শরৎচন্দ্র / শিশিরকুমার)। যোগাযোগ (রবীন্দ্রনাথ)।

১৯৩৭ঃ স্টারে শিশিরকুমারের নব্যনাট্যমন্দির উঠে গেল।

১৯৩৮, ২৯ মার্চ ঃ সলিলবাবু স্টারের লেসী হলেন।

নাটকগুলির দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায়, শিশিরকুমার সে-যুগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো নাটকই বেছেছেন। তখন কিন্তু শিশিরকুমারের অবস্থা মোটেই ভালো নয়।

কুড়ির দশক ছিল তাঁর স্বর্ণযুগ। সেই যুগের অবসান হয়েছে, কিন্তু তাঁর তহবিলে স্বর্ণ-ভাণ্ডার রেখে যায় নি। আমেরিকা থেকে ফিরলেন শূন্য হাতে। তিরিশের দশকের গোড়ার দিক, অভিনয়ের জন্যে স্থায়ী ভাবে মঞ্চ পাচ্ছেন না, এখানে-ওখানে অভিনয় করছেন। এই ভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। তারপরে আইনজীবী-বন্ধু কান্তি মুখার্জির মাধ্যমে পেলেন স্টার। গঠন করলেন, পুরাতন 'নাট্যমন্দির' নয়, 'নবনাট্যমন্দির' বুঝলেন, এখন আর 'নাট্যমন্দির' নবযুগের প্রবর্তক নন তিনি, এখন তিনি 'নবনাট্যমন্দিরে' টিঁকে থাকবার সংগ্রামে রত। এ-অবস্থায় লোকে আপোস করে ফেলে। আপোস করে চলে। কিন্তু শিল্পীমনের অহংকারও তো মরবার নয়। তাই 'যুগের আয়না'র মতো শিশুনাট্য নিয়ে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করেন। 'বিজয়া' হয়তো কিছু পয়সা দেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের কাহিনী হলেও 'শ্যামা' ও 'অচলা'-র বিষয় কঠিন ও জটিল। এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ। এই রকম কাজ করেই তো সুখ। কিন্তু সে-সুখে আর্থিক স্বস্তি ছিল না। এই অবস্থায় এই পর্বের শেষ বই বাছলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'। কঠিন জটিল ও চ্যালেঞ্জিং বই। এ চ্যালেঞ্জ ঐ অবস্থায় একমাত্র শিশিরকুমারই নিতে পারতেন। নিলেনও আবার আপোসও করলেন। কিন্তু উপন্যাসের উপসংহার রবীন্দ্রনাথকে বদলে দিতে বললেন। কুমু গ্রন্থ-শেষে একেবারে ভক্তিনম্র 'সতী-লক্ষ্মী' হয়ে যাবে—এটা চাইলেন শিশিরকুমার। রবীন্দ্রনাথ

ক্ষুব্ধ হলেন, শিশিরকে প্রশ্ন করলেন—এই পরিবর্তনের দরকার কী? শিশিরকুমার কোনো নাট্যসঙ্গত কারণ দেখাতে পারলেন না। বললেন, একে দর্শকের মনোরঞ্জন হবে এবং তিনি 'দক্ষিণা' ভালো পাবেন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে বললেন—'দুষ্ট' লোক। কিন্তু স্নেহপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ শিশির-অভীষ্ট পরিসমাপ্তি করেও দিলেন। কিন্তু 'যোগাযোগ'-এর তাও চলোন। মোটা দাগের কথায় বলা চলে, জাতও গেল, পেটও ভরলো না। ঘটনাটা দুঃখের, শিশিরকুমারের পক্ষে করুণ। 'যোগাযোগ'-এর ব্যর্থতার উপর উঠলো সলিল মিত্রের সাফল্যের সৌধ। তবে এই যুগটি ঐ অসফল লোকটির নামেই চিহ্নিত, সফল লোকেদের নামে নয়।

এই সফল ও অসফল ব্যক্তিদের যদি একদিন দেখা হয়ে যেত কোনো দৈবের ফলে, তাহলে তাঁরা কে কী কথা বলতেন? আমরা কি জানি এই কাল্পনিক সংলাপ? অনেকেই বললেন, জানি না। কিন্তু সত্যি একবার উভয়পক্ষে দেখা হয়েছিল। এ খবর পাই আমরা দেবনারায়ণ গুপ্তের একটি সাক্ষাৎকারে। (দেশ, ২৫ এপ্রিল, ১৯৯২)। সলিলবাবুরা তাঁদের নাটকের শততম দ্বিশততম উৎসব-অনুষ্ঠানে শিশিরবাবুকে একাধিকবার আমন্ত্রণ করেছেন। শিশিরবাবু একবারও আসেন নি। শেষ যেবার আমন্ত্রণ জানাতে গেলেন তাঁরা, সেবার শিশিরবাবু বললেন, "এখন তো টাকাকড়ি ভালই আসছে। ও সব নাটক না করে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কর, এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কর।"

পরে সলিলবাবু বলেছিলেন, "পাবলিক স্টেজে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে গিয়েই ওঁর তো এই দশা হয়েছে।"

এই সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি, ব্যর্থ শিশিরকুমার সফল প্রযোজকদের প্রযোজনা দেখতে যেতেন না। কেন যেতেন না? দম্ভ? অহংকার? হীনতাবোধ? না। শিশিরকুমার জানতেন, ঐ সকল ভাণ্ডার থেকে তাঁর পাওয়ার মতো কিছু নেই। একজন বলে, এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে। অন্যজন বলে, এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করলে 'এই দশা।' অর্থাৎ, নতুন কিছু করতে চেষ্টাও করবে না ওরা। গতানুগতিক পথে চর্বিত চর্বণ করবে। তাকেই বলবে শিল্প। কিন্তু শিল্প প্রতিটি সৃষ্টিতে নবীন। এই নিত্য-নবীনতা শিল্পের প্রাণ। গতানুগতিকতা শিল্পের মৃত্যু। অনেকে অর্থের কারণে এই মৃত্যুর সাধনা করে। শিশিরকুমার তা করতে চাইতেন না। কিন্তু তিনি বাণিজ্যিক থিয়েটারেরই লোক। ঐ কাঠামোর মধ্যে কাজ করলে ওখানকার শর্ত শেষ পর্যন্ত কমবেশি মানতেই হয়। শিশিরকুমারকেও মানতে হয়েছে।, আপোস করতে হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার বাণিজ্যিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে না।

তাই আপোস করে না। আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই 'ঐ দশা' হ'ত এমন কোনো কথা নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুমাত্র না করেও ঐ দশা-প্রাপ্ত হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা থিয়েটার জগতে অগণ্য।

এসব কথা নতুন নয় গ্রুপ থিয়েটারের লোকদের কাছে। তবে হঠাৎ কেন 'বিক্রয়যোগ্য মাল' হয়ে ওঠবার এই তীব্র কামনা? এখন হাওয়ায় অর্থলাভের পরিমান হয়তো কিছুটা বেড়েছে, আদর্শের কিছু ঘাটতি চলছে। অনেক গ্রুপ সস্তায় মন তোলাতে সচেষ্ট। তাও গ্রুপ থিয়েটার ও বাণিজ্যিক থিয়েটার এক—একথা কেউ বলতো না, বরং দুয়েরপার্থক্যই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হোতো। এখন যদি কেউ উলটো সুর গাইতে চান, তাহলে আমরা তাঁকে বিদায় জানাবো, বলব—আপনার অসীম সৌভাগ্য হোক। শুধু একটা দয়া করলেন, নিজেকে গ্রুপ থিয়েটারের লোক বলে আর পরিচয় দেবেন না। গ্রুপ থিয়েটার বাণিজ্যিক থিয়েটারের মধ্যে অবলুপ্ত হচ্ছে না। গ্রুপ থিয়েটারের কেউ কেউ বাণিজ্যেতে যাবেন ঠিক করেছেন। অমন ক্ষয়-লয় যাত্রা-পথে দু-চারটে হয়েই থাকে। দু-চার জন বা দু-চারটে গ্রুপ বাণিজ্যে যাচ্ছে বলে গোটা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বাণিজ্যিক হয়ে যাচ্ছে এটা মনে করবার কোনো কারণ নেই। এখন থেকে বিক্রয়যোগ্য মালের মালিকরা বণিকের মানদণ্ডে বিচার্য হবেন, শিল্প-মানদণ্ডে হবেন না। প্রাপ্য যা, তা নগদ পেয়ে যাবেন। গ্রুপ থিয়েটারের প্রাপ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাঁদের অধিকার রইল না। ন্যায়, সমাজবিন্যাসের প্রতি তাঁদের কোনো দায়বদ্ধতা রইল না, আর্টের প্রতিও। তাঁরা দায়বদ্ধ অর্থের প্রতি। দায় রইল ঠিক মাল সাপ্লাই করতে পারছে কি না তার প্রতি।

গ্রুপ থিয়েটার সরকারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা পায়। এই সুবিধাগুলি এখন থেকে বিক্রয়যোগ্য মালের মালিকরা পাবেন না। সরকারী অনুদান, পুরস্কার, সরকারী হল-ও ভাড়ায় কিছু সুবিধা—এইগুলি সরকার এঁদের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নেবেন আশা করা যায়। যাঁদের নীতিবোধ আছে, তাঁরা তামাক ও দুধ দুটো অবশ্যই খাবেন না।

গ্রুপ থিয়েটারের উত্তাল সময়টা কি আজ একটু স্তিমিত? তাই কি কারো কারো এই বাণিজ্য যাত্রা? নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিক, অনেক নাট্য-রথী এখন মঞ্চে নেই। শম্ভু মিত্র অবসর নিয়েছেন। তৃপ্তি মিত্র প্রয়াত। উৎপল দত্ত ক্লান্ত। কেয়া চক্রবর্তী প্রয়াত। বাদল সরকার এই বয়সেও সক্রিয়। কিন্তু তিনি কি ঈষৎ একঘেয়েমির

শিকার হচ্ছেন? ঠিকই গ্রুপ থিয়েটারের একটা গৌরবময় যুগের হয়তো অবসান হয়েছে। কিন্তু এমন আর এক ঝাঁক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব কি উইংস থেকে উঁকি দিচ্ছে? হয়তো না।

তাতেও হতাশ হবার কিছু নেই। সব যুগ ঠিক এক ভাবে আসে না। আজকের যুগে ভাঙচুর অনেক বেশি। রাজনীতিতে ও সমাজে তার প্রতিফলন ঘটছে। শিল্পক্ষেত্রেও ঘটছে। এই চারিদিকের ভাঙনের মধ্যে কাজ করছে নাট্যকর্মীরা, সেই ভাঙনের তারাও শিকার। শিল্পক্ষেত্রে কোনো কথাই নিশ্চিত দৈববাণী নয়, তবু মনে হয়, এ যুগে বুঝি সূর্য-চন্দ্রের আবির্ভাব দুরূহ। আমাদের নাট্য-আকাশে এক ঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। এদের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসকে ছোট করে দেখবার কোনো কারণ নেই;

গত ২৩ জানুয়ারি রবীন্দ্রসদনে নাট্যগুরুদের একাংশ গ্রুপ থিয়েটারে চিতায় তুলে দিয়ে এসেছেন। সেই চিতাভস্মই সত্য হয়ে থাকবে, অথবা পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো ঐ ভস্মের মধ্য থেকে আবার নতুন প্রাণের জন্ম দেবে, এ কথা ইতিহাসই একদিন বলবে। আজ আমরা শুধু প্রত্যাশা-জাগর।

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনবিন্যাস-মানচিত্রে পরিবর্তন

অমলেন্দু দে

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী এবং ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চর্চা কেন্দ্রে এবং ইতিহাস বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে আমি বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনবিন্যাসে-মানচিত্রের পরিবর্তন বিষয়ে দুটো বক্তৃতায় এই সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করি।[১] আমার তৈরি সেই নোট অবলম্বন করেই এই নিবন্ধটি রচনা করেছি। এই সমস্যার প্রতি কারো কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও, অনুপ্রবেশ-সংক্রান্ত সমস্যায় ভারত ও বাংলাদেশ-উভয় রাষ্ট্রের সেকিউলার-গণতান্ত্রিক আন্দোলন কতটা বিপর্যস্ত হতে পারে, সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণার অভাবও লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে হলে দুটো রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু জনবিন্যাস সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা প্রয়োজন। একই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সমস্যাগুলোও উপলব্ধি করা দরকার। ভারতে ও বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিসমূহ যেভাবে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে তাতে উভয় রাষ্ট্রের বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রীক চরিত্র বিপর্যস্ত হয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে লঘু করে দেখার কোনো কারণ নেই। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা ভাবলে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সরকারী ও অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনবিন্যাসের রূপ এবং উভয় রাষ্ট্রে তার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছি।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনবিন্যাসে পরিবর্তনের বিষয়টিকে প্রধান দুটো পর্বে বিভক্ত করা যায়: (১) প্রাক ১৯৭১ পর্ব এবং (২) ১৯৭১ পরবর্তী পর্ব। প্রথম পর্বের আবার পাঁচটি স্তর রয়েছে: প্রথম ভাগ: ১৯৪৬-১৯৪৯; দ্বিতীয়

ভাগ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০—সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ ; তৃতীয় ভাগ : ১৫ অক্টোবর, ১৯৫২-১৯৬০ ; চতুর্থ ভাগ : ১৯৬০-৬১-১৯৭০ ; পঞ্চম ভাগ : ১৯৭১। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বের তিনটি স্তর রয়েছে : প্রথম ভাগ : ১৯৭২-১৯৭৪ ; দ্বিতীয় ভাগ : ১৯৭৫-১৯৮৭ ; তৃতীয় ভাগ : ১৯৮৮-১৯৯০। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে হিন্দুরাই হল বৃহত্তর অংশ। তাই ঐ দেশ থেকে যারা ভারতে চলে আসে তাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি।[২]

(১) প্রাক্-১৯৭১ পর্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের ভারতে প্রবেশ :

এই পর্বে কি পরিমাণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

(ক) প্রথম ভাগ : ১৯৪৬—১৯৪৯ : প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নোয়াখালি ও ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের সূত্রপাত হয়। তখন উচ্চবর্গের হিন্দুদের একটি অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অসম ও ত্রিপুরায় চলে যায়।[৩] ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার পর এই রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রবর্তন করতে সক্ষম না হওয়ায় সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে সংখ্যালঘুদের আগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান গঠনের সময়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন রূপ ধারণ করে যার ফলে সংখ্যালঘুরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়।[৪] নিজেদের বাসভূমি পরিত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধির অন্য একটি কারণও ছিল। হায়দরাবাদের নিজাম ভারত রাষ্ট্রের বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার সেখানে সেনাবাহিনী পাঠায়, রাজাকারদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং হায়দরাবাদ রাজ্যকে সামরিক প্রশাসনের অধীনে রেখে হায়দরাবাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।[৫] এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এক অংশের মনোভাব সংখ্যালঘুদের উপর বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলে তা লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে সংখ্যালঘুরা বিপন্ন বোধ করে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে তাদের আগমন বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান

ত্যাগ করে ভারতে ১.১ মিলিয়ন হিন্দু চলে আসে। তারা ভারতে 'উদ্বাস্তু' নামেই পরিচিতি লাভ করে। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছিল ৩৫০,০০০ শহরের মধ্যবিত্ত, ৫৫০,০০০ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, ১০০,০০০ কিছু বেশি কৃষক এবং ১০০,০০০ কিছু কম কারিগর।[৬]

(খ) দ্বিতীয় ভাগঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০-সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ঃ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ায় অসংখ্য হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসম রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কারো কারো মতে, 'বন্যায় জলস্রোতের' মতোই উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও দাঙ্গা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভীত-সন্ত্রস্ত বহু সংখ্যক মুসলমানও অসম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৩.৫ মিলয়ন।[৭] এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এবং তাদের জীবন বিপদমুক্ত করতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' নামে পরিচিত। তাতে উভয় সরকারই ঘোষণা করে, উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা ধর্ম-নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করবে। তাদের জীবন, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করা হয়, আর মত প্রকাশের ও ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়।[৮] 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের উদ্বাস্তুদের নিজেদের বাসভূমিতে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকারসহ ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন খানিকটা রোধ করা গেলেও, তার প্রবাহ বন্ধ করা যায়নি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন-ব্যবস্থা হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করতে না পারায় এই চুক্তির সুবিধা হিন্দুরা গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে দাঙ্গার সময়ে যে সমস্ত মুসলমান অসম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেকেই 'নেহরু লিয়াকত চুক্তি'র ব্যবস্থা অনুযায়ী অসম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ফিরে আসে। ভারতে আইনের শাসন থাকায় এখানে সহজেই এই চুক্তির শর্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়। তারপর পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপত্তার কারণে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ আর ঘটেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের চিত্র ছিল

সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই চুক্তিকে কার্যকর করার কোনই প্রয়াস হয়নি।[৯] উপরন্তু ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের আইনসভায় এমন সব আইন পাশ করা হলো, যার ফলে সংখ্যালঘুরা নিজেদের স্থাবর ও অস্থায়ী সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এখানে দুটো আইনের প্রয়োগে সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা প্রকট হয় এবং তারা কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। সেই দুটি আইন হলোঃ (East Bengal Evacuee Property (Restoration Possession) Act of 1951 এবং East Bengal Evacuees (Administration of Immovable Property) Act of 1951.[১০] সংখ্যালঘুরা কিভাবে প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হয় তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো এই দুটো আইন।

(গ) **তৃতীয় ভাগঃ ১৫ অক্টোবর, ১৯৫২-১৯৬০ঃ** ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর পাকিস্তান সরকার পাশপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করে। তার ফলে সংখ্যালঘুরা আরো শংকিত হয়। পরে ভারতও এই প্রথা চালু করে। তখন থেকে আবার নতুন করে ভারতে হিন্দু উদ্বাস্তদের প্রবেশ ঘটে। ১৯৫৫-১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। তাছাড়া ১৯৫২ ও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান আইনসভায় এমন দুটো আইন পাশ করা হয় যার ফলে সংখ্যালঘুদের মনোবল ভেঙে যায়। এই দুটো আইনের নাম ছিলঃ East Bengal Prevention of Transfer of Property and Removable of Documents and Records Act of 1952 এবং East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance of 1954.[১১] ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরকারের অনুমতি ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজেদের সম্পত্তি বিক্রী করতে পারবে না। উল্লেখ্য এই, ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হওয়ায় সংখ্যালঘুদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। এই নির্বাচনে আইনসভায় ৭২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচিত এই সরকারের আয়ু ছিল খুবই স্বল্পকালীন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান বাতিল করে আইউব খান ক্ষমতা দখল করেন এবং দশ বছর পাকিস্তানে সেনা শাসকের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থবিরোধী Pakistan (Administration of Evacuees Property) Act XII of 1957 আইন জারি করে। তারপর Elective Body Disqualification

Order of 1959 প্রয়োগ করে ছয়জন বিশিষ্ট সংখ্যালঘু নেতাকে সরকারি অফিসের পক্ষে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।[১২] সুতরাং আগের বৈষম্যমূলক আইনের সঙ্গে আরো দুটো আইন যুক্ত করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দুর্বল করার ব্যবস্থা হয়। এই অবস্থায় দেশত্যাগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) **চতুর্থ ভাগ: ১৯৬১-১৯৭০:** ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দেও দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। ১৯৬২ ও ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যালঘুরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক মানুষ দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান উদ্যোগী হয়ে দাঙ্গা বিরোধী প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।[১৩] এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও কয়েকটি স্থানে দাঙ্গায় মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাঙ্গাকারীদের দমন করতে সক্ষম হওয়ায় সংখ্যালঘুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগের পথ অনুসরণ করেনি। কিন্তু দাঙ্গার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করতে থাকে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর Defence of Pakistan Ordinance চালু হওয়ায় সেখানে সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। তারপরে আর একটি নির্দেশ জারি করা হয়। তাকে East Pakistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order of 1966 বলা হয়।[১৪] ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দশ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে।[১৫] ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ আইউব খান পদত্যাগ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতাসীন হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জারি করেন সামরিক শাসন। পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির সংঘাতে অসংখ্য গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ বলিষ্ঠতা প্রদর্শন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জীবনদান করলেও, তাঁরা গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হননি। পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠমোয় পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসকদের আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য ও সামরিক বাহিনীর একনায়কতন্ত্র পূর্ববাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বারে বারে বিপর্যস্ত করে। উল্লেখ্য এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আইনসভার সংখ্যালঘু সদস্যরা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশে বহু প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এমন কি তাঁরা আইন সভায় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন

সংরক্ষণের বিরোধিতা করে 'যুক্ত নির্বাচন প্রথা' প্রবর্তনেরও দাবি করেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের প্রস্তাবের ফলেই যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সামরিক আইনবলে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিপর্যস্ত হলেও সেখানকার জীবনধারায় বিকশিত গণতান্ত্রিক চেতনা কিন্তু বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। তাই সেখানে বারংবার গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। আর তাতে ছিল ছাত্র ও যুবকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।[১৬] অন্যদিকে ভারতের 'সেকিউল্যার' গড়নে নানা ত্রুটি থাকলেও এখানে আইনের শাসন ভেঙে পড়েনি। তাছাড়া ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। এইসব কারণে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা অসহায় বোধ করেনি। বস্তুত, দেশত্যাগের স্রোতধারাটি পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখীই ছিল। এখানে উল্লিখিত প্রথম পর্বের (প্রাক-১৯৭১ পর্ব) পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু জনবিন্যাসের মানচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কোনো জেলাতেই মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলো বা মহল্লাগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যায়নি। বরং দেখা যায় এখানকার জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মুসলমানরা ভারত গঠনে তাদের ভূমিকা পালন করছে। অনেক ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারাটি যেমন অটুট আছে, তেমনি বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যও রয়েছে অক্ষুন্ন। ভারতে আইনের চোখে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সমান অধিকার স্বীকৃত। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইনের শাসন-নির্ভর গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু জনসমষ্টি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বসবাস করতে সক্ষম হচ্ছে না। বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতেও সক্ষম হচ্ছে না। ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রভাবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মনির্ভর উদারনৈতিক মনন যাতে উজ্জীবিত হতে না পারে তার জন্য প্রশাসক, ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও রাজনীতিবিদ্‌দের এক অংশের মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠতা এবং পারস্পরিক নির্ভরতা নানা জটিলতারও সৃষ্টি করছে। যার ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, একই সঙ্গে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের উপর নেমে আসছে তীব্র আঘাত। এই প্রতিকূল পরিবেশে সংখ্যালঘুরা দিশেহারা হয়ে ভারতেই প্রবেশ করছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে

এইসব কারণে ভারতে, ৫২,৮৩,৩২৪ জন সংখ্যালঘুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে।[১৭]

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব দিকে বিরাজিত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল হলো বারোটি পার্বত্য উপজাতির আবাসস্থল। তাদের মোট সংখ্যা ছয় লক্ষ। সমতলের মুসলমান সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির সঙ্গে তাদের পার্থক্য রয়েছে। এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ হলো চাকমা ও মারমা—এঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া রয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা উপজাতি এবং খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী বত্তম, পাংখুয়া ও ম্রু উপজাতি। বৌদ্ধদের তুলনায় হিন্দু ও খ্রীস্টানদের সংখ্যা কম। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ, আর ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী হিন্দু ও খ্রীস্টান। তাদের মধ্যে অবশ্য উপজাতি জীবনধারার প্রথাগত আচার-আচরণ অব্যাহত রয়েছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল দখল করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি রেগুলেশন প্রবর্তন করে এই অঞ্চলের প্রশাসনকে সমতল থেকে আলাদা করা হয় এবং এই অঞ্চলে অবাধ অনুপ্রবেশের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল হয় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ।[১৮] ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাইতে মস্ত বড় একটি হাইড্রো-ইলেকট্রিক বাঁধ নির্মাণ করে। তার ফলে ৫৪,০০০ একর চাষের জমি জলমগ্ন হয়। এর মধ্যে চল্লিশ শতাংশ ছিল উপজাতি কৃষকদের জমি। তাতে একলক্ষ পার্বত্য উপজাতি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের জমিজমাও হয় হাতছাড়া। খুবই অল্প সংখ্যক কৃষক ক্ষতিপূরণ পায়। সমতলভূমি থেকে উপজাতি অঞ্চলে অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। সহস্র সহস্র উপজাতি ভারতের ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশে আশ্রয় নেয়। এইভাবে পাকিস্তান সরকারে নীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠী এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তাদের চিরাচরিত জীবনধারায় নেমে আসে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়।[১৯]

(২) ১৯৭১-পরবর্তী পর্বে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ:

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মুক্তি সংগ্রামের সময়ে পাক বাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশের নাগরিক আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে বেশির

ভাগই ছিল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলোতে। এই আশ্রয় গ্রহণকারী নাগরিকদের মধ্যে ৮৫% ছিল হিন্দু। তাছাড়া আগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে ছিল বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও আদিবাসী জনসমষ্টি। তুলনায় মুসলমান আশ্রয়-গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কেন হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল? কারণ তারাই ছিল পাক বাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য। পাকিস্তানের মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি যে নির্দেশ দেন তাতে স্পষ্ট করেই বলেন, হিন্দুরা হলো 'কাফের'। তিনি হিন্দুদের হত্যা করতে এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ৯০% হিন্দুর বাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়।[২০] তা সত্ত্বেও এক নতুন দেশ গঠনের আশায় এই মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যাগুরু মুসলিম নাগরিকদের সঙ্গে সংখ্যালঘু নাগরিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে। এইভাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানে যে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয় তা হলো : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী জনগণের মিলিত আন্দোলনের ফসল ছিল এই নতুন রাষ্ট্র ও তার সংবিধান।[২১]

(ক) **প্রথম ভাগ : ১৯৭২—৭৪ :** মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পরে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এক কোটি উদ্বাস্তুর বেশির ভাগই নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ফিরে যায়। কিন্তু অচিরেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরোধীরা সংগঠিত হতে থাকে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। তারা এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে থাকে। এই কারণে দ্বিতীয় পর্বেও বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিপন্ন বোধ না করে পারে না। পরিবর্তিত অবস্থাতেও তারা বৈষম্যের শিকার হয়। যেসব সংখ্যালঘু নাগরিক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়, তারা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকেই ফিরে গিয়ে দেখে তাদের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের আবার নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করতে হয়। যাদের কোন অবলম্বন ছিল না তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুনর্বার ভারতে চলে আসে। দুঃখের হলেও এটা সত্য, 'গণতান্ত্রিক সেকিউল্যার' আদর্শের প্রবক্তা আওয়ামি লিগ পরিচালিত সরকার সংখ্যালঘুদের অবস্থার কোনো গুণগত

পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে যে 'রাষ্ট্রীয় অত্যাচার' চলে তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শত্রু-সম্পত্তি' আইন পরিবর্তন করে করা হলো 'অর্পিত সম্পত্তি' (Vested Property) আইন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের হয়রানি করার সমস্ত ধারাই এই আইনে যথারীতি বজায় রাখা হয়েছিল। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুরা হয় আশাহত। 'অর্পিত সম্পত্তি' আইনের নামে হিন্দুদের জমিজমা অন্যায়ভাবে দখল করা হতে থাকে। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।[২২] ভারত-বিরোধী প্রচারও ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। সুতরাং নিরাপত্তার আশায় সংখ্যালঘুদের ভারতে অনুপ্রবেশও অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি'তে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত সংখ্যালঘুদের আগমন-সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লিখিত হয়।[২৩] অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিস্থিতির কোনোই উন্নতি হয় না। মুক্তি-যুদ্ধের পরে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠী আশা করেছিল, বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে তারা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাবে এবং এক প্রকার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারবে। কিন্তু নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার তা দিতে অস্বীকৃত হয়।[২৪] ইতিমধ্যে সমতলভূমি থেকে আগত বাঙালী মুসলিম বসবাসকারীদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার সমতলভূমি থেকে অবসর প্রাপ্ত মুসলিম সৈনিক ও সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের এই অঞ্চলে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনবিন্যাস-মানচিত্রের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। বাঙালী মুসলমান বনাম পার্বত্য উপজাতি সংঘাতের ক্ষেত্রও তৈরি হয়। এই অবস্থায় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'চিটাগং হিল ট্রাকটস্ পিপলস ইউনাইটেড পার্টি' গঠিত হয়। উপজাতি জনগোষ্ঠী তাদের আবাসস্থলে নিজেদের অধিকার অটুট রাখার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করে।[২৫] এই সংঘাতকে কেবলমাত্র জাতিগত (ethnic) বিরোধ বলে সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করা যায় না। কারণ, এই অঞ্চলে সরকারী নীতির ফলেই ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং দীর্ঘকাল প্রচলিত আঞ্চলিক ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যটিও বিপর্যস্ত হয়। এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আলোচনায় সংঘাতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপাদান সমূহের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।[২৬]

(খ) দ্বিতীয় ভাগ: ১৯৭৫-৮৭: বাংলাদেশে গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তির

প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সংবিধানের মূলনীতিগুলো অবহেলিত হয়। এগুলো কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনো বলিষ্ঠ প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নিহত হন।[২৭] ফলে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাও ধ্বসে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির প্রভাব বিস্তারের পথ আরো প্রশস্ত হয়। দ্রুতগতিতে সংবিধানের গণতান্ত্রিক-সেকিউল্যার চরিত্র পরিবর্তন করা হয়। নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উপর নির্ভরশীল হন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শাসনকালেই "রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী উপাদানসমূহের প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী ধারার প্রসার" ঘটে। তিনি "প্রথমে সামরিক আইনের বিধান বলে এবং পরে ১৯৭৭ সালে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দেন।"[২৮] তখন থেকে 'ইসলামীকরণ'-এর যে-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তা রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর শাসনকালে পূর্ণতর রূপ ধারণ করে। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা দখল করার পরই রাষ্ট্রপতি এরশাদ বাংলাদেশে একটি 'ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন' আরম্ভ করার বাসনা ব্যক্ত করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন. "ইসলাম ও কোরানের নীতিই হবে দেশের নতুন সংবিধানের ভিত্তি।"[২৯] তারপর থেকে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার' কথা বলতে থাকেন। তাঁর কাজে তিনি পীরের আশীর্বাদও লাভ করেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ জাগ্রত করে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেন। নাগরিকদের ধর্মীয় পার্থক্যকে প্রকট করে তোলায় সংখ্যালঘুরা আবার বিপন্নবোধ করতে থাকে। কারণ, তারাই ছিল ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণের প্রধানতম লক্ষ্য। 'শত্রুসম্পত্তি' আইন এই ক্ষেত্রে অন্যতম বৈধ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি জবরদস্তিমূলক দখল করা শুরু হয়ে যায়। এটাও উল্লেখ্য. ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুন রাষ্ট্রপতি এরশাদ 'অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি' আইন সম্বন্ধে একটি আদেশ প্রচার করেন। তাতে বলা হয়, সংখ্যালঘুদের আর কোনো সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হবে না। কিন্তু এই আইনের সাহায্যে যেসব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা হলো না। এমন কি আইনটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করাও

হলো না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি এরশাদ-এর এই আদেশটিও কার্যকর করা হয়নি। তাই তাঁর ঘোষণার পরেও বহু সম্পত্তি সংখ্যালঘুদের হাতছাড়া হয়। বলা বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনে ও আদালতে সুবিচার লাভের কোনই আশা ছিল না। বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও সংখ্যালঘুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আবার দেশত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।[৩০]

একই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠীর দুরবস্থাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার চার লক্ষ মুসলমানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এনে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির অভাব দেখা দেয়। ভিন্ন ধর্ম ও জনগোষ্ঠীর মানুষের বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সামরিকীকরণও শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক শিবির।[৩১] উপজাতিদের অধিকার-রক্ষার্থে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শান্তি বাহিনী গেরিলা কায়দায় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী এবং বাঙালী মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের খবর চাপা থাকে না, এছাড়া উপজাতিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এমন সংবাদও প্রচারিত হয়। নির্যাতিত উপজাতির মানুষ আত্মরক্ষার্থে অবশেষে ভারতে প্রবেশ করে।[৩২]

(গ) তৃতীয় ভাগ ঃ ১৯৮৮—৯০ ঃ ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে' পরিণত হয়। তাদের দুরবস্থা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে হতাশা আর ক্ষোভও বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতি এরশাদ মৌলবাদী গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের উপর নির্ভরশীল হন। ফলে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার প্রতিকার করে গণতান্ত্রিক দলগুলো সংখ্যালঘুদের জাতীয় রাজনীতির মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে সক্ষম হয়নি। ভীত-সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু নাগরিকরা শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ করতেই বাধ্য হয়।[৩৩]

১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতের বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু হয়

যায়। সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ-পরিচালিত সরকার গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে সমাজদ্রোহী দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের মন্দির ধ্বংস করে, ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং সমগ্র দেশে কায়েম করে এক ভয়াবহ ত্রাসের রাজত্ব। এই তাণ্ডবলীলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করতে সক্ষম না হলেও, পরে তাঁরা ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু অক্টোবরের দাঙ্গা সংখ্যালঘুদের মনোবল ভেঙে দেয়। এর ফলেও সংখ্যালঘুদের ভারতে আগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।[৩৪]

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হয় না। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার 'ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আইন' পাশ করে পার্বত্য অঞ্চলে 'স্বায়ত্তশাসন' প্রবর্তন করে। উপজাতি জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত কাউন্সিল কর্তৃক এই অঞ্চল শাসনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জমিতে তাদের অধিকার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার কোনো ক্ষমতা এই কাউন্সিলের হাতে না থাকায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর কোনো সমস্যারই সমাধান হয়নি। নিজেদের বাসস্থান থেকে বিচ্যুত ত্রিপুরার আশ্রয় শিবিরে বসবাসকারী প্রায় ৬০ হাজার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের ভবিষ্যৎ এইজন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।[৩৫]

(২) সংখ্যালঘু জনবিন্যাস-মানচিত্রে পরিবর্তন :

সেন্সাস রিপোর্ট সব সময়ে নির্ভরযোগ্য না হলেও, তাকে অবলম্বন করেই চলতে হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে যেভাবে বাংলার মুসলিম ও হিন্দু জনসংখ্যা দেখানো হয়, তা নিয়ে এক সময়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ অভিযোগ করেন, মুসলিম জনসংখ্যা বেশী করে এবং হিন্দু জনসংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু জনসমষ্টির প্রকৃত সংখ্যা নিয়েও কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই সব সেন্সাস রিপোর্টে জনসংখ্যার যথার্থ প্রতিফলন হয়নি বলে তাঁদের মনে হয়েছে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে কত সংখ্যক সংখ্যালঘু মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করে তার একটি হিসেব

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলো ও সরকারী পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়। আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে এক কোটি মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ফিরে যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টির একটি অংশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলোতে থেকে যায় অথবা বিভ্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসে। এখানে উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। এই পর্বের আর একটি লক্ষণীয় দিক হলো, বাংলাদেশ থেকে সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসমষ্টিও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ও ভারতের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ বিশ্লেষণ করে উভর রাষ্ট্রের জনবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। প্রথমে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়ে আলোচনা করা হলো। ১৯৬১-১৯৭৪ এবং ১৯৭৪-১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে সেখানকার সংখ্যালঘু জনসংখ্যার একটি হিসেব পাওয়া যায়। ধর্ম অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার শতকরা হার এখানে উল্লেখ করা হলো : [৩৬]

সেন্সাস বছর	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান	অন্যান্য
১৯০১	৬৬.১	৩৩.০	—	—	০.৯
১৯১১	৬৭.২	৩১.৫	—	—	১.৩
১৯২১	৬৮.১	৩০.৬	—	—	১.৩
১৯৩১	৬৯.৫	২৯.৪	—	০.২	১.০
১৯৪১	৭০.৩	২৮.০	—	০.১	১.৬
১৯৫১	৭১.৯	২২.০	০.৭	০.৩	০.১
১৯৬১	৮০.৪	১৮.৫	০.৭	০.৩	০.১
১৯৭৪	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.২
১৯৮১	৮৬.৬	১২.১	০.৬	০.৩	০.৩

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে একই সময়কালে হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। বৌদ্ধ জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। খ্রীষ্টান জনসংখ্যা একই রকম থাকে। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসেবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারত বিভাগ, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-পাক যুদ্ধ এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্টে অন্য কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি।[৩৭]

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্ট থেকে শহরের ও গ্রামের এবং চারটি পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত মহানগরীর (Four Statistical Metropolitan Areas) জনসংখ্যার বিষয়ে জানা যায়। শহরের ও গ্রামের হিন্দু জনসংখ্যার যথাক্রমে হার হল ১১·৬% এবং ১২·২%। চারটি মহানগরীতে, যথা—চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহীতে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। চট্টগ্রাম মহানগরীতে তুলনামূলকভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসংখ্যার উচ্চ হার পাওয়া যায়। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসংখ্যার মিলিত হার হল ১১·৪%। খুলনা মহানগরীতে খ্রীস্টান জনসংখ্যার উচ্চ হার লক্ষ্য করা যায়। এখানে হিন্দু ও খ্রীস্টান জনসংখ্যার মিলিত হার হল ১৩·২%। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে শহরে ও গ্রামে সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যার হার সম্বন্ধে এই তথ্য পাওয়া যায় :[৩৮]

	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৮৬·৬	১২·১	০·৬	০·৩	০·৩
শহর	৮৬·৯	১১·৬	০·৫	০·৮	০·২
গ্রাম	৮৬·৬	১২·২	০·৬	০·৩	০·৩
সকল মহানগরী	৯১·৪	৭·৪	০·২	০·৮	০·২
চট্টগ্রাম মহানগরী	৮৮·২	১০·৭	০·৭	০·৩	০·২
ঢাকা মহানগরী	৯৩·৫	৫·৮	০·১	০·৫	০·২
খুলনা মহানগরী	৮৬·৭	৯·৫	০·০	৩·৭	০·১
রাজশাহী মহানগরী	৯১·৯	৭·২	০·০	০·৬	০·৩

এবার ১৯৭৪ ও ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ধর্মসম্প্রদায়গত চিত্রটি শতাংশ হিসেবে তুলে ধরা হলো :[৩৯]

১৯৭৪

জেলা / ডিভিসন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৮৫·৪	১৩·৫	০·৬	০·৩	০·২
চট্টগ্রাম ডিভিসন	৮৫·৩	১২·১	২·৩	০·২	০·১
বন্দরবন	—	—	—	—	—
চিটাগং হিল ট্রাকটস্	১৮·৯	১০·৪	৬৬·৫	২·৬	১·৬
চট্টগ্রাম	৮৩·৮	১৪·১	১·৯	০·১	০·১

	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	অন্যান্য
কুমিল্লা	৯০.২	৯.৭	০.০	০.০	০.১
নোয়াখালি	৯২.৮	৭.২	০.০	০.০	০.০
শ্রীহট্ট	৮২.৬	১৬.৯	০.১	০.২	০.২
ঢাকা ডিভিসন	৮৭.৬	১১.৮	০.০	০.৫	০.১
ঢাকা	৮৭.৮	১১.৪	০.০	০.৭	০.১
ফরিদপুর	৭৬.৪	২৩.৩	—	০.৩	০.০
জামালপুর	—	—	—	—	—

১৯৭৪

জেলা / ডিভিসন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	অন্যান্য
ময়মনসিং	৯৩.৪	৬.০	০.০	০.৫	০.১
টাঙ্গাইল	৮৭.৬	১২.০	—	০.২	০.২
খুলনা ডিভিসন	৮১.০	১৮.৭	০.০	০.২	০.১
বরিশাল	৮২.৮	১৭.০	—	০.১	০.১
যশোহর	৭৮.০	২১.৯	—	০.১	—
খুলনা	৭১.২	২৮.৩	০.০	০.৪	০.১
কুষ্টিয়া	৯৫.২	৪.৭	—	—	০.১
পটুয়াখালি	৮৮.৮	১০.৯	০.৩	—	—
রাজশাহী ডিভিসন	৮৬.৪	১২.৯	০.০	০.৩	০.৪
বগুড়া	৯২.১	৭.২	—	০.৪	০.২
দিনাজপুর	৭৫.১	২৩.৭	—	০.৫	০.৭
পাবনা	৯০.৪	৯.২	—	০.৩	০.১
রাজশাহী	৮৬.০	১৩.০	০.১	০.২	০.৭
রংপুর	৮৭.৬	১২.০	—	০.২	০.২

১৯৮১

	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৮৬.৬	১২.১	০.৬	০.৩	০.৩
চট্টগ্রাম ডিভিসন	৮৫.৬	১১.৭	২.৩	০.২	০.২
বন্দরবন	৪১.৫	২.৯	৪৩.৯	৮.২	৩.৫
চিটাগং হিলট্রাকটস	৩২.৪	১১.৪	৫৫.০	০.৯	০.৩

	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	অন্যান্য
চট্টগ্রাম	৮৪·৫	১৩·০	২·২	০·১	০·২
কুমিল্লা	৯১·৬	৮·২	০·১	০·০	০·১
নোয়াখালি	৯৩·০	৬·৯	০·০	০·১	০·০
শ্রীহট্ট	৮১·৩	১৮·০	০·০	০·৩	০·৪
ঢাকা ডিভিসন	৮৯·৭	৯·৭	০·০	০·৫	০·১
ঢাকা	৯০·৫	৮·৯	০·১	০·৪	০·১
ফরিদপুর	৮০·৯	১৮·৮	০·০	০·৩	০·০
জামালপুর	৯৬·৮	২·৭	—	০·৪	০·১

১৯৮১

	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	অন্যান্য
ময়মনসিং	৯১·৮	৭·৪	—	০·৬	০·২
টাঙ্গাইল	৯০·৬	৯·২	—	০·২	০·১
খুলনা ডিভিসন	৮২·৪	১৭·১	০·০	০·৪	০·১
বরিশাল	৮৪·৫	১৫·১	০·০	০·৩	০·১
যশোহর	৮০·৩	১৯·৬	—	০·১	০·০
খুলনা	৭১·৯	২৭·২	০·০	০·৮	০·১
কুষ্টিয়া	৯৫·১	৪·৫	—	০·৩	০·১
পটুয়াখালি	৯০·৩	৯·৪	০·২	০·০	০·১
রাজশাহী ডিভিসন	৮৭·৪	১১·৬	০·০	০·২	০·৮
বগুড়া	৯১·১	৮·৪	—	০·১	০·৪
দিনাজপুর	৭৫·৯	২১·৯	০·০	০·৬	১·৬
পাবনা	৯২·৫	৭·৩	—	০·১	০·১
রাজশাহী	৮৮·৬	৯·৫	০·০	০·৪	১·৫
রংপুর	৮৮·০	১১·৬	০·০	০·১	০·৩

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টির বার্ষিক বৃদ্ধির গড় হার ভয়ানকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪০] অন্যদিকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের ৩৯ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসংখ্যা হ্রাস পায়। তারা কোথায় গেল? এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর বাংলাদেশ সরকারের সূত্র থেকে পাওয়া যায় না।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তাদের বহির্গমন ঘটেছে বলে অনেকে অনুমান করেন।[৪১] উপরন্তু, ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে আরো ৩৬ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভারতে প্রবেশ করে।[৪২] ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে এককোটি আঠাশ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভারতে প্রবেশ করে।[৪৩] এইভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনবিন্যাস মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটে।

(৩) বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশত্যাগের আরো কয়েকটি কারণঃ

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের নাগরিকরা দেশত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করছে। তাদের মধ্যে শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাই নেই, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও রয়েছে। তাদের প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) **ধর্মীয় সংখ্যালঘুঃ** (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ; (খ) হিন্দু ও খ্রীস্টান; (গ) বিভিন্ন উপজাতি। (২) **ধর্মীয় সংখ্যাগুরুঃ** বাঙালী ও বিহারী মুসলিম। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর বহু অবাঙালী মুসলিম পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস শুরু করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পর এইসব বিহারী মুসলিম ভারতে প্রবেশ করাই নিরাপদ মনে করে। তাদের পক্ষে এখানকার উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে সহজেই মিশে যাওয়া সম্ভব হয়। প্রধানত যে সব কারণে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জনসাধারণের বহির্গমন ঘটে তা এখানে উল্লেখ করা হলোঃ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মুসলিম জনবিন্যাসের ঊর্ধ্বগতি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করে। আর ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা ভারতে প্রবেশ করে অর্থনৈতিক কারণে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণের ও সামরিকীকরণের নীতি কার্যকর করায় বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রীস্টান উপজাতির অধিবাসী তাদের নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্যে আশ্রয় নেয়।[৪৪] পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিস বাহিনী তিনটি পার্বত্য জেলাতেই জমি অধিগ্রহণ করে তাদের শিবির স্থাপন করেছে। এইসব বাহিনীর মোট সংখ্যা হলো ৬০ হাজার। তাছাড়া রয়েছে আনসার ও গ্রামরক্ষা বাহিনীর সদস্যেরা। নাগরিকদের নিয়ে গঠিত এই আধা-সামরিক বাহিনীও বিশাল। সুতরাং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামেই সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। কোনো স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা না থাকায় উপজাতি জনগোষ্ঠী এক অস্বাভাবিক পরিবেশের

সম্মুখীন হয়েছে।[৪৫] সম্প্রতি মায়ানমার থেকে বিতাড়িত ছিন্নমূল রোহিঙ্গা মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ পারিপার্শ্বিককে আরো জটিল করে তুলেছে। তাদের সঙ্গে উপজাতিদের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। উদ্বাস্তু উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভারতে প্রবেশ ঘটছে। সহজেই অনুমান করা যায়, রোহিঙ্গা মুসলমানদের একটি বড় অংশ মায়ানমার ফিরে যাবে না। এই অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমস্যায় আর একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।[৪৬]

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কিভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তার আরো কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের প্রতি প্রশাসনের বৈমাত্রেয় সুলভ ব্যবহার আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া 'অর্পিত সম্পত্তি' আইনের প্রয়োগে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার কথাও আলোচনা করা হয়েছে। সংখ্যালঘুরা কিভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে তা এখানে উল্লেখিত তথ্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমেই বাংলাদেশ পার্লামেন্টে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কিভাবে হ্রাস পেয়েছে তা উল্লেখ করা যাক:[৪৭]

বছর	মোট সদস্য	ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যের সংখ্যা
১৯৫৪	৩০৯	৭২
১৯৭০	৩০০	১১
১৯৭৩	৩১৫	১২
১৯৭৯	৩১৫	৮
১৯৮৬	৩১৫	৭
১৯৮৮	৩০০	৪
১৯৯১	৩১৫	১১

সংখ্যালঘু জনসংখ্যার হিসেব অনুযায়ী তাদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা হওয়া উচিত ৬০, কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে তা হয়েছে ১০।[৪৮]

প্রতিরক্ষা বিভাগে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাও উল্লেখ করার মতো নয়। সেনাবাহিনীতে ৮০ হাজার 'জওয়ান' (সৈনিক), তার মধ্যে ৫০০ 'জওয়ান' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত।[৪৯] সেনাবাহিনীর উচ্চপদে তাদের সংখ্যা আরো নগণ্য। এখানে তা উল্লেখ করা হলো:[৫০]

পদ	মোট সংখ্যা	সংখ্যালঘুদের সংখ্যা
সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট / লেফটেনাণ্ট	৯০০	৩
ক্যাপটেন	১,৩০০	৮
মেজর	১,০০০	৪০
লেফটেনাণ্ট কর্ণেল	৪৫০	৮
কর্ণেল	৭০	১
ব্রিগেডিয়ার	৬৫	০
মেজর জেনারেল	২২	০
মোট	৩,৮০৭	৬০

বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে (Border Defence Force) ৪০,০০০ জওয়ান, তার মধ্যে ৩০০ জওয়ান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণ স্তরের পুলিসের সংখ্যা ৮০,০০০, তার মধ্যে ২০০০ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।[৫১] উচ্চপদস্থ পুলিসের মধ্যে সংখ্যালঘুদের অবস্থান নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে :[৫২]

পদ	মোট সংখ্যা	সংখ্যালঘুদের সংখ্যা
অ্যাসিসটাণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিস / অ্যাসিসটাণ্ট কমিশনার	৬৩৫	৪০
ডেপুটি এস পি / অ্যাডিশন্যাল এস পি	৮৭	২
এস পি / অ্যাসিসটাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনারেল	১২৩	১০
ডি আই জি	১৮	১
অ্যাডিশন্যাল আই জি	৬	০
আই জি	১	০
মোট	৮৭০	৫৩

বিদেশ, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোনো সংখ্যালঘু পদস্থ ব্যক্তি নেই বল্লে অত্যুক্তি হবে না। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগের অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েটের অবস্থা এখানে উল্লেখিত তথ্য থেকে বোঝা যাবে :[৫৩]

পদ	মোট সদস্য	সংখ্যালঘু সদস্যের সংখ্যা
(ক) অফিসার ও কর্মচারী	৬,৫০০	৩৫০
(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার	৫৮,৪০৫	(খ) থেকে (ছ) পর্যন্ত পদে ৩% থেকে ৫%
(গ) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অফিসার	৬৯৬,০০০	
(ঘ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর অফিসার	৪৬,৮৯৪	
(ঙ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার	৩১,০০১	
(চ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় শ্রেণীর অফিসার	১৫১,৩০৫	
(ছ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর অফিসার	১৩৯,২০৮	
(জ) সেক্রেটারী	৪৯	০
(ঝ) অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী	২৬	০
(ঞ) জয়েন্ট সেক্রেটারী	১৩৪	৩
(ট) ডেপুটি সেক্রেটারী	৪৬৩	২৫
(ঠ) শুল্ক দপ্তর	১৫২	১
(ড) আয়কর বিভাগের অফিসার	৪৫০	৮

সোনালী ব্যাঙ্ক, জনতা ব্যাঙ্ক, অগ্রণী ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক ও শিল্প ব্যাঙ্কের ৩৭ জন জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে একজন মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের সাতজন ডাইরেক্টরের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নন।[৫৪] বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের ৩৭ গবর্নরের পদমর্যাদার অফিসার ও জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে মাত্র তিনজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। সোনালী ব্যাঙ্কের পাঁচজন ডাইরেক্টর, অগ্রণী ব্যাঙ্কের চারজন ডাইরেক্টর, শিল্প ব্যাঙ্কের সাত জন ডাইরেক্টর এবং কৃষি ব্যাঙ্কের পাঁচজন ডাইরেক্টর। তাঁদের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নন।[৫৫] 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনও রাষ্ট্রদূত অথবা হাই কমিশনার নেই। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের নিম্নপদে মাত্র দুজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অফিসার আছেন।[৫৬] রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মিল ও ফ্যাক্টরীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১% অফিসার, ৩% থেকে ৪%

কর্মচারী এবং ১% কম শ্রমিক আছেন।[৫৭] ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে বৈষম্য-মূলক নীতির ফলে সংখ্যালঘুদের পক্ষে লাইসেন্স সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়। এমনকি তাঁরা নতুন শিল্প স্থাপনের বিষয়ে এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। তার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা পঙ্গু হয়ে পড়েন।[৫৮] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও তাঁরা প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে দেয়। জমি-জমা বিক্রী করার অধিকার থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হন। এইভাবে বাংলাদেশের মারোয়াড়িরাও বৈষম্যের শিকার হন।[৫৯]

বাংলাদেশে ঐশ্লামিক প্রতিষ্ঠান ও পবিত্র স্থান-সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও খ্রীস্টান গির্জার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনই প্রয়াস হয়নি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মস্থান পুনর্নিমাণ করারও কোনো উদ্যোগ সরকারী কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি। সরকারী ও বে-সরকারী অফিসের সংলগ্ন স্থানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রার্থনার জন্য মসজিদও নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের কোনো সুযোগ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টানদের জন্য প্রদান করা হচ্ছে না। প্রতিটি সরকারী অনুষ্ঠানে শুধু পবিত্র কোরান গ্রন্থই পাঠ করা হয়, অন্য কোনো পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা হয় না। এমন কি রাষ্ট্র পরিচালিত রেডিও ও টেলিভিশন তাদের কর্মসূচী শুরু ও সমাপ্ত করার সময়ে কেবলমাত্র পবিত্র কোরান গ্রন্থ থেকেই পাঠ করে। অন্য কোনো ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হলেও তা ততটা গুরুত্ব সহকারে করা হয় না।[৬০] ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইসলাম ধর্মতত্ত্বের ঔদার্যবোধ ও আধ্যাত্মিক নৈতিকতার উপাদানগুলো এমনভাবে বিকশিত করার কোনো সরকারী প্রয়াস নেই, যাতে বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষ নিজ ধর্মের প্রতি অনুগত থেকে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। স্বভাবতই তার ফলে সাধারণ মুসলমান নাগরিকরাও ইসলামের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন না। হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত বিখ্যাত 'মদিনা-সনদ' সম্বন্ধেও তাদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে না।[৬১] সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়েই ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে মাদ্রাসার (ঐশ্লামিক বিদ্যালয়) জন্য। এমন কি সরকারী উদ্যোগে

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্রদের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ধর্ম শেখানোর এমন কোনো ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়নি। নামে মাত্রই কিছু সংস্কৃত টোল ও পালি প্রতিষ্ঠান বিরাজ করছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু সংখ্যক ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও তাঁরা মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষকদের তুলনায় বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কম পেয়ে থাকেন।[৬২] এমন কোনো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করা হয়নি যাতে সংখ্যাগুরু মুসলিম ও সংখ্যালঘু ছাত্ররা ইসলাম ও অন্য ধর্মের আধ্যাত্মিক নৈতিকতার সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারে। তাতে ধর্মান্ধতার পরিবর্তে ঔদার্যবোধের পথটি প্রশস্ত হতে পারত। তাছাড়া সরকার পক্ষ থেকে যেসব স্কুলপাঠ্য বই চালু করা হয়েছে তাতে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মেরই গৌরবগাথা ব্যক্ত করা হয়। অন্য ধর্ম সম্বন্ধে এমন ধরনের মনোভাব কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না।[৬৩]

বাংলাদেশে যেভাবে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে তার ফলে সম্প্রদায়গত মনোভাবই ব্যাপ্ত হচ্ছে। সরকারী ও অনুমোদিত মাদ্রাসা ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই মাদ্রাসাগুলোর নাম হলো খারিজী বা কওমী মাদ্রাসা, ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা। সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার যে সংস্কার সাধন করা হয়েছে তাতে মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করা যায়। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাসের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পাঠ্যসূচীতে 'সেকিউলার' উপাদান সাধারণ বিদ্যালয় বা কলেজের মতো ততটা নেই।[৬৪] সুতরাং বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় এই দুটো ধারা থেকে যেসব ছাত্ররা আসছে, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস কোর্সে পাশ করা ছাত্র-সম্প্রদায়। মাদ্রাসার ইব্‌তিদাঈ, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, এখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের আধ্যাত্মিক নৈতিকতার উপাদান সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করার কোনই প্রয়াস নেই। সমস্ত পাঠ্যসূচীই ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক। স্বভাবতই অন্য ধর্মের আধ্যাত্মিক-নৈতিকতার আদর্শের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষায় পরিচিত হওয়ার কোনই সুযোগ নেই।[৬৫] তার ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা

সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। তাই সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে তাদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সেকিউল্যার উপাদানের প্রভাব থাকলেও তাদের মধ্যেও সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবিত করা হচ্ছে। এই ডিগ্রীলাভ করে এই ছাত্ররাই আবার বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ অব্যাহত থাকছে। এই কারণেই বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সর্বক্ষেত্রে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে সামাজিক জীবনে এক গভীর আলোড়ন দেখা দিয়েছে।[৬৬] বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় মৌলবাদী ছাত্রদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও ধর্মীয় মৌলবাদী গ্রুপগুলো শক্তিশালী হয়েছে। বাংলাদেশে রাজনীতিতে ও প্রশাসন-ব্যবস্থায় তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টি এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। রাজধানী ঢাকা শহরে গণতান্ত্রিক শক্তির উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, বাংলাদেশের মফস্বল অঞ্চলে তার প্রভাব এমন নয় যে সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। আইনের শাসন অবলম্বন করে প্রশাসন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের পূর্বে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য।[৬৭]

উল্লেখ্য এই, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পশ্চাদপদ হলো শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের তপসিলী ও হরিজন জনগোষ্ঠী। তাছাড়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর অবস্থাও শোচনীয়। দু'লক্ষ গারো, দু'লক্ষ মণিপুরী, এক লক্ষ রাখাইনি ও অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলায় এক লক্ষ সংখ্যালঘু চা শ্রমিক এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছে। তাছাড়া রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কামার, কুমোর, তাঁতী, জেলে ইত্যাদি, যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিপর্যস্ত।[৬৮] তাদের উন্নতির জন্য বাংলাদেশ সরকার কোনো বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন অথবা কোনো গবেষক মহল তাদের অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন, এমন তথ্য আমি পাইনি।

এবার বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির বাঙালী ও বিহারী মুসলমানদের ভারতে আগমনের বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পরে বিহারী মুসলমানরা ঢাকায় ও অন্যত্র কয়েকটি শিবিরে বসবাস করতে থাকে। তাদের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়। শিবিরের অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় তারা ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই নানাভাবে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদের বৈরিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠায় এবং তাদের সবাইকে পাকিস্তান সরকার নিতে সম্মত না হওয়ায়, 'সেকিউল্যার' ভারতকে তারা নিরাপদ আশ্রয় স্থল মনে করে। বাঙালী মুসলমানরাও জীবিকার সন্ধানে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যের অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ও ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। তারা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই দেশত্যাগ করেছে। বাংলাদেশের প্রকট দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসমষ্টির মধ্যে বহির্গমন শুরু হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তার মাত্রা খুবই বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলা দেশের ১১% পরিবারের মাথার উপরে কোনো আচ্ছাদন নেই। রাস্তার ধারে, গাছের নীচে ও রেলওয়ে স্টেশনে তারা বাস করে।[৬৯] তাদের মধ্যে মুসলিম জনসমষ্টির সংখ্যাই বেশি। তাদেরই একটি অংশ বাংলাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।

(৪) **পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সমস্যার সাম্প্রতিক চিত্র :**

ভারতের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ থেকে মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সম্বন্ধে এই চিত্র পাওয়া যায় :[৭০]

বছর	জনসংখ্যা (দশলক্ষে)	ধর্ম অনুযায়ী জনসংখ্যার শতকরা হার		
		হিন্দু	মুসলিম	শিখ
১৯৫১	৩৬১.১	৮৫.০	৯.৯	১.৭
১৯৬১	৪৩৯.২	৮৩.৫	১০.৭	১.৮
১৯৭১	৫৪৮.২	৮২.৭	১১.২	১.৯

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার হার ছিল ২০.৪৬% এবং ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৫১% হয়।[৭১] ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৪, ৫৮০, ৬৪৭।[৭২] এই সময়ে বিভিন্ন জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা বীরভূম জেলার ৩১% থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ৫৮.৬৬% সীমা রেখার মধ্যেই ছিল।[৭৩] পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ

চব্বিশ পরগনা জেলার মুসলিম জনসংখ্যা এই সীমারেখার মধ্যেই রয়েছে। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে এখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার উল্লেখ করা হলো :[৭৪]

জেলা	জনসংখ্যার শতকরা হার
পশ্চিম দিনাজপুর	৩৫·৭৯%
বীরভূম	৩০·৯৭%
মালদহ	৪৫·২৭%
মুর্শিদাবাদ	৫৮·৬৬%

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার এক দশকের বৃদ্ধির হার (decadal growth rate) হলো ২৯·৬%, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হলো ২৩·২% ।[৭৫] সুতরাং এই তথ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার চিত্র সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো : গত এক দশকে (১৯৮০–১৯৯০) কত সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশ করেছে? বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ নতুন রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে, তা থেকে কেউ কেউ বলেন, গত এক দশকে ১০ মিলিয়ন অথবা ১০ থেকে ১৪ মিলিয়ন বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশ করে।[৭৬] তাদের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা বেশি হলেও সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সংখ্যাও কম নয়। বলাবাহুল্য, এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলোতে, কলকাতা ও আরো কয়েকটি শহরের মুসলিম জনসংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোনো নির্ভরযোগ্য সংখ্যা না পাওয়া গেলেও, এই অনুপ্রবেশ যে ঘটছে তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করেন।[৭৭] ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী এম. এম. জেকব বলেন, এক লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক দিল্লীতে এবং ৫·৮৭ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে।[৭৮] এই বিবৃতিতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখিত হয়নি।[৭৯] উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার শিবিরে ৭·৫ লক্ষ বিহারী মুসলিম আশ্রয় নেয়। এখন সেখানে মাত্র ২ লক্ষ বিহারী মুসলিম রয়েছে বলে কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়। সৌদী আরব সরকারের মধ্যস্থতায় শিবিরবাসী বিহারীদের মধ্যে মাত্র ৩৩,০০০ পাকিস্তানে আশ্রয় পেয়েছে। তাহলে বাদ বাকী বিহারী মুসলিম, যাদের সংখ্যা হবে ৫ লক্ষ, কোথায় গেল? তারা

যে ভারতে প্রবেশ করেছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং দিল্লীতে নতুন গড়ে ওঠা বাংলাদেশী মুসলমানদের কলোনীগুলো থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষি খামারগুলোতেও তারা মজুর হিসেবে নিযুক্ত রয়েছে।[৮০] আগেই বলা হয়েছে, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করার পর 'হিন্দু অনুপ্রবেশকারী'-র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মতে, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২৮ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে ৫ লক্ষেরও বেশি থেকে যায়।[৮১] ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কত সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তার শেষ সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সরকারী সূত্রে পাওয়া যায় না। অবশ্য সরকারী তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে মাত্র ২০% নর-নারীকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিস গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।[৮২]

সম্প্রতি এই অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যাটি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি ডি এন চক্রবর্তীর মতে, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করেছে।[৮৩] ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মতে, ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রায় ৬ মিলিয়ন মানুষ প্রবেশ করে এবং একমাত্র কলকাতা শহরেই বাস করছে ১.২ মিলিয়ন অনুপ্রবেশকারী।[৮৪] এই রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে দাবি করেছে, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু ও চাকমা উদ্বাস্তুদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক, মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নয়।[৮৫]

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলাদেশী মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গে 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থা গঠনে সহায়তা করেছে 'বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ'। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ মোহাজির সঙ্ঘের' মুখপাত্র আবদুল জলিল সানা কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি প্রেস কনফারেন্সে বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ বাংলাদেশী রয়েছে এবং আরো অনেক অবৈধভাবে আসা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দিল্লী, বোম্বে ও আহমদাবাদে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মোট সংখ্যা হবে ৫ লক্ষ। লক্ষণীয় যে, এই প্রেস কনফারেন্সে যে মুদ্রিত ইস্তাহারটি

সাংবাদিকদের দেওয়া হয় তাতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মুসলিম ও কয়েকজন হিন্দুও রয়েছে।[৮৬] সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা যায়, ৭ লক্ষ বাংলাদেশী কেবলমাত্র নদীয়া জেলার ঝুপড়িগুলোতে বাস করছে।[৮৭] ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে যারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে তাদের বলা হয় 'নতুন বসবাসকারী', আর তার পূর্বে যারা এসেছিল তাদের বলা হয় 'পুরাতন বসবাসকারী'।[৮৮] এদের মধ্যেই মজুরির পরিমাণ নিয়ে হয় তিক্ততার সৃষ্টি। নতুন বসবাসকারীরা দৈনিক অল্প মজুরি নিয়েও কাজ করতে সম্মত হওয়ায় পুরাতন বসবাসকারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছে, এমন দৃশ্য সীমান্ত-অঞ্চলে প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। রাস্তার পাশে ও রেলওয়ে লাইনের ধারে অজস্র ঝুপড়িতে অনুপ্রবেশকারী হিন্দু ও মুসলিমকে বাস করতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো কৃষিজীবী ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ।[৮৯]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমান্তের ঠিক ওপারেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টির হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। স্বভাবতই বাংলাদেশের সীমান্ত-সংলগ্ন জেলাগুলোতেও সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসমষ্টির সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত জেলাগুলোতে মুসলিম জনসমষ্টির যে-বলয় সৃষ্টি হয়েছে তাতে জনবিন্যাস ধারণ করেছে এক নতুন রূপ। এখানে একদিকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে যেমন ধর্মীয় মৌলবাদীরা এবং জামাত-ই-ইসলামি দল প্রভাব বিস্তার করতে সক্রিয় হয়েছে, তেমনি অনুপ্রবেশকারী হিন্দুদের মধ্যেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি ও অন্যান্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের তৎপরতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু সীমান্ত অঞ্চলে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ও কলকাতা শহরে মৌলবাদী হিন্দু ও মুসলিম বৃত্ত দুটির ক্রমবর্ধমান প্রভাব জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছে, ঘটছে ধর্মমিশ্রিত রাজনীতির ব্যাপ্তি।[৯০]

(৫) ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সেকিউল্যার গণতান্ত্রিক আদর্শ সংরক্ষণের সমস্যা :

সাম্প্রতিককালের অনুপ্রবেশ-সমস্যা এই অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনধারায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। অনুপ্রবেশ-সমস্যাটি নিঃসন্দেহে সৃষ্টি করেছে এক ভয়ঙ্কর জটিলতা। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সেকিউল্যার-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভাবে প্রশাসনিক যন্ত্র ও মৌলবাদীদের আঘাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে এবং তারা তাদের দীর্ঘকালের স্মৃতিবিজড়িত আবাসস্থল ত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ

করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবক্তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অগ্রসর অংশ এটা উপলব্ধিও করতে পারেন। প্রশ্ন হলো : ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশ থেকে এইভাবে চলে গেলে বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় : (ক) বাংলাদেশে এই অবস্থা চলতে থাকলে রাষ্ট্র তার বহুধর্মীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলবে; (খ) ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া ব্যাপ্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই অসহিষ্ণুতার পরিবেশ প্রকট হয়ে উঠবে; (গ) গণতান্ত্রিক আন্দোলন নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং মৌলবাদীদের আঘাতে তা হবে বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবাহটি বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটেই সতেজ হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত এবং তার পরবর্তীকালের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মের নামে যারা ধর্মান্ধতা প্রচার করতে প্রয়াসী হয় তাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি বারে বারে তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে ধরেছে। বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ ও সহকর্মীদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরে এক প্রতিকূল পরিবেশেও এই ধারাটি অব্যাহত রয়েছে।[৯১] ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপগুলো তাদের শক্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামীকরণের ঢেউ সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলকে এখন গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় ইসলামের আধ্যাত্মিক নৈতিকতার পরিবর্তে ধর্মান্ধ মৌলবাদী ধ্যান-ধারণাই গুরুত্ব পাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর জনসাধারণের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সহজ-স্বাভাবিক সহাবস্থান কেন সম্ভব হচ্ছে না, এই বিষয় নিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে আলোচনা না হওয়ায় ইসলাম-নির্ভর ঔদার্যবোধ ও মানবিকতাবোধের সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।[৯২] বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলামের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রকৃত অর্থে ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনসমষ্টি যদি নিজ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থেকে অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে পারে তাহলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়ে উঠবে আরো শক্তিশালী; এর ফলে বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক কাঠামোটিও অটুট থাকবে, অগ্রগতি ঘটবে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের আলোচনার প্রতি গুরুত্ব না দিলে যারা ধর্মান্ধতাকে অবলম্বন করে ক্ষমতা বজায় রাখার অথবা দখলের চেষ্টা করছে তাদের বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করা

সম্ভব হবে না। সুতরাং বর্তমানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগঠক ও সমর্থকদের যে প্রশ্নটির জবাব দিতে হবে তা হচ্ছে : ধর্মীয় মৌল-বাদীদের পর্যুদস্ত না করে কি বাংলাদেশে বাহাত্তরের সংবিধানের মৌল আদর্শ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ?[৯৩]

বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির অনুপ্রবেশ অব্যাহত গতিতে ঘটতে থাকলে তার কি পরিণতি পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে এবার তা দেখা যাক। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার শাসন-ক্ষমতায় থাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানকার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম না হলেও, গত দশ বছরে অনুপ্রবেশের ফলে এই রাজ্যের সামাজিক—রাজনৈতিক জীবন যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে সংখ্যাগুরু হিন্দু মৌলবাদী শক্তি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে অনেকটা অনুকূল পরিবেশই পেয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু মুসলিম মৌলবাদী শক্তিও আরো সংহত হতে প্রয়াস চালাচ্ছে। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধও প্রবল হয়ে উঠছে। কোনো কোনো জায়গায় তা বিক্ষিপ্তভাবে সম্প্রদায়গত সংঘাতের রূপও ধারণ করছে।[৯৪] বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসমষ্টি যাতে অবাধে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে তার জন্য বাংলাদেশের কোনো একটি মহল থেকে 'লেবেনস্রাউম' (Lebensraum) তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে।[৯৫] অন্য আর একটি মহল থেকে বলা হচ্ছে—ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে নিয়ে 'কনফেডারেশন' (Confederation) বা 'মিত্র সঙ্ঘ' গঠনের কথাও। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরেই পাকিস্তানের 'কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল মহল' পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের 'কনফেডারেশন' গঠনের কথা বলতে শুরু করে।[৯৬] বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে ঠিক তখনই আবার প্রচার করা হচ্ছে এই সব তত্ত্ব। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের সেকিউলার মডেলটি আইনের শাসনের মাধ্যমে ভারতের বহুধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্রকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক দলসমূহ এই মডেলটিকে আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতেও তৎপর। অন্যদিকে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও সেকিউলার গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলো সংগ্রামে লিপ্ত। তারা সেখানকার ধর্মীয় মৌলবাদী দলগুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হলে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উন্নতির পথে এগুতে

পারবে। তাই 'মিত্র সঙ্ঘের প্রস্তাব' এবং 'লেবেনস্রাউম তত্ত্বের প্রচার' শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে না, বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও ক্ষতি করছে। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও বাহাত্তরের সংবিধানের মৌল আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা বদ্ধপরিকর।[৯৭] অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলোতে যেভাবে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেখানে যদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংগঠিত হবার সুযোগ পায় তাহলে ভারতের সেকিউলার মডেলটি বিপর্যস্ত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করার সত্যিই কোনো কারণ নেই। ভারত ও বাংলাদেশ—এই দুটো পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যই ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা আজ একান্ত প্রয়োজন। এই কাজ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শুরু না করলে দু দেশেরই বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি অদূর ভবিষ্যতে ধর্মীয় মৌলবাদীদের আঘাতের সামনে হয়তো দাঁড়াতে সক্ষম হবে না।

সূত্র-নির্দেশ

১. Amalendu De, *Migration From Bangladesh to West Bengal*, Lecture deliverd at the *South and South-East Asian Studies*, Calcutta University, on February, 20, 1991; Amalendu De, *Sloping Marks in the Demographic Graph of Religious Minorities in Bangladesh (1974-1990) and its Impact On both Bangladesh and West Bengal*, Paper presented at a Seminar on *Communalism and Casteism in South Asia*, Organised jointly by the Department of *Islamic History & Culture and South and South East Asian Studies*, at the *History Department of Calcutta University*, on April 12, 1992. ২০ ফেব্রুয়ারীর সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাইরেক্টর ডঃ জয়ন্তকুমার রায় এবং ১২ এপ্রিলের সেমিনার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক হিসট্রি এণ্ড কালচার ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুশীল চৌধুরী।

২. যেসব গ্রন্থের সাহায্যে প্রাক-১৯৭১ পর্বগুলো সাজিয়েছি তা এখানে

উল্লেখ করা হলো : *A Hand book of Government Policy and plans for the resettlement of Refugee Population, July, 1948* (Government of West Bengal); *Recurrent Exodus of Minorities from East Pakistan and Disturbances in India—A Report to the Indian Commission of Jurists by its Committee of Enquiry, Part I*, 1947-1963, New Delhi, Indian Commission of Jurists, 1965; Ranjit Roy, *Agony of West Bengal.*

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭০; Kanti B. Pakrashi, **The uprooted. A Sociological study of the Refugees of West Bengal,** Calcutta, 1971; অমিতাভ গুপ্ত, **পূর্ব পাকিস্তান,** কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬; Saroj Chakraborty, **My years with Dr. B. C, Roy.** Calcutta, June 1982; Prafulla K. Chakraborti, **The Marginal Men,** Kalyani, 1990; বাণী দে, **পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের কারণ বিশ্লেষণ এবং উদ্ভূত সমস্যা পর্যালোচনা** (১৯৪৭-১৯৫২), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম. ফিল্ গবেষণা পত্র (অপ্রকাশিত), ক্রমিক সংখ্যা—১০, ১৯৮৬-৮৭। ভারতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদ্বাস্তুদের বিষয়ে আলোচনায় এই গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে এক আকর গ্রন্থ।

৩. Stanley Wolpert, **Jinnah of Pakistan,** New Delhi, 1935, p. 339. ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট করাচীতে পাকিস্তান কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সভায় সর্বসম্মতভাবে সভাপতি নির্বাচিত হবার পরে মহম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তানের সংবিধান কি ধরনের হবে সেই বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন: "You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan···you may belong to any religion or caste or creed—that has nothing to do with the business of the state···We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed

and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. The people of England in course of time had to face the realities of the situation and had to discharge the responsibilities and burdens placed upon them by the government...Today, you might say with justice that Roman Catholics and Protestants, do not exist; what exists now is that every man is a citizen, an equal citizen of Great Britain...all members of the Nation" (Ibid). অর্থাৎ, জিন্নাহ পাকিস্তান রাষ্ট্রে একটি 'Civil Society' স্থাপন করার কথা ভাবেন। তিনি অতি দ্রুত সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিবর্তে একটি 'সেকিউলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' গঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ভাষণে এই মনোভাব ব্যক্ত করলেও তিনি কার্যকর কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পশ্চাতে যে দ্বিজাতি তত্ত্বটি ছিল তার প্রভাবই বজায় থাকে, 'Civil Society'-র আদর্শের পরিবর্তে ইসলাম ধর্মীয় মনোভাবই প্রকট হয়ে ওঠে। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্র একটি 'সেকিউলার গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হলো না।

৫. বাপী দে, পূর্বল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৭-৩৩।

৬. Prafulla K, Chakraborti, op. cit, p. 1.

৭. Ibid, pp. 2-3.

৮. Ibid, pp. 3, 106-107; বাপী দে, ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩-৪৫—'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: **Recurrent Exodus of Minorities From East Pakistan and Disturbances in India—A Report to the Indian Commission of Jurists by its Committee of Enquiry,** New Delhi, **Indian Commission of Jurists,** (Part I, 1947-1963) New Delhi, 1965. pp 1-11. 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হলো: "Shall ensure to the minorities throughout its territories, complete equality of citizenship, irrespective of religion, full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of

movement within each country and freedom of occupation, speech and worship." (Ibid, p. 11), এই চুক্তি Delhi Pact of 1950 নামেও পরিচিত।

৯. Ibid; Durga Das Basu, **Introduction to the Constitution of India**, New Delhi, 1987.

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী ভারতে যে নতুন সংবিধান প্রচলিত হয় তাতে ভারতকে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং এই সংবিধান প্রতিটি ব্যক্তি ও গ্রুপের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে এবং ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নাগরিকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: অমলেন্দু দে, **ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতা**, কলিকাতা, ১৯৯২, প্রথম অধ্যায়।

১০. Nim C, Bhowmik, **Legal Lynching & Exodus of Minorities from Bangladesh, in South Asia Forum Quarterly**, vol. 4, No, 4: Fall, 1991 (Published from U. S. A.) উল্লেখ্য এই, ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১১. Ibid.

১২. Ibid.

১৩. Ibid.

১৪ Ibid; মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, **বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়**, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪-৫, ৩৪-৪২, ৫৩-৬৪। হিন্দুদের দুরবস্থার চিত্র এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Debesh Chandra Bhattacharya, **Enemy (Vested) Property Law in Bangladesh Nature** and Implications, Dhaka, 1992.

১৫. Prafulla K. Chakraborti, op. cit. p, 4.

১৬. ডঃ হাসান উজ্জামান, **রাজনৈতিক উন্নয়নে ঐকমত্য এবং বাহাত্তরের সংবিধানে পরিলক্ষিত সম্ভাবনা**, দ্র. খবরের কাগজ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা '৯২, ঢাকা, ২৬ মার্চ, ১৯৯২, সম্পাদক: কাজী শাহেদ আহমেদ। এই সংখ্যায় আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বাংলাদেশের চিন্তাবিদ লিখেছেন। তাদের প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত একটি তথ্যের প্রতি বাংলাদেশের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পাকিস্তানের কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ও আইন সভার বিবরণসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কিভাবে সংখ্যালঘু সদস্যরা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যুক্তনির্বাচন-প্রথা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন। এইসব তথ্য অবলম্বন করে কেউ গবেষণা করেছেন কিনা আমার জানা নেই।

১৭. মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ; Prafulla K. Chakrabarti, op. cit., pp. 2-5.

১৮. 'Life is not Ours', Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, An up date, of the May 1991 Report, Published by the Chittagong Hill Tracts Commission, March 1992, Copenhagen K, Denmark. Chairperson of this Commission is Professer Douglas Sanders (Henceforth abbreviated as 'Life is not Ours'), p. 19.

১৯. Ibid.

২০. মেজর রফিকুল ইসলাম, **লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে**, ঢাকা, ১৯৮১; Muhammad Ghulam Kabir, **Minority Politics in Bangladesh**. Dacca, 1980.

মেজর রফিকুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে জেনারেল রাও ফরমান আলীর নির্দেশের কথা উল্লেখ করেন। মহম্মদ গোলাম কবিরও তাঁর গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হিন্দুদের দুরবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন: "In order to crush the nationalist movement, the Pakistan army started a campaign of genocide in Bangladesh on 25 March 1971. The Hindus in particular were targets of the army. In the first few days of Pakistan army's operations, their targets were the student dormitories, Bengali police and E. P. R. head quarters, and the Hindu populated areas of Dacca. In other cities, too, Hindus became prime targets of the army crackdown. Prominent Hindu politicians, lawyers, doctors, businessmen and teachers, whenever found, were killed by the army. During the entire period of the civil war, they were

discriminated against by the Pakistan army. Their houses were burnt, property looted, women raped, and temples destroyed." (Muhammad Ghulam Kabir, op. cit., P. 83).

হিন্দুদের প্রতি পাক সৈন্যদের মনোভাব সম্বন্ধে তথ্যাদি Anthony Mascarenhas-এর রিপোর্টেও পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য ঃ Fazlul Quader Quaderi (Compiled and Edited), **Bangladesh Genocide And World Press,** Dacca, October, 1972, p. 117. অবশ্য পাক সৈন্যরা আওয়ামি লিগ কর্মী ও ছাত্রদের বিদ্রোহী মনে করে তাঁদেরও নির্বিচারে হত্যা করেছে। এই গ্রন্থে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার ও বহু তথ্য পাওয়া যায়।

২১. ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত বাংলাদেশের সংবিধান, ৯, ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদ; মযহারুল ইসলাম, **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব**, ঢাকা, মার্চ ১৯৭৪, নবম অধ্যায়। এই বিশাল গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে লেখক 'মুজিববাদ' শব্দ চয়ন করে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চারটি আদর্শ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। সংবিধানের মৌল আদর্শ সহজ ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করেন। সংবিধান আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, **বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্ম,** দ্র. বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি প্রকাশিত, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৫-৩২।

২২. মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭। Nim C. Bhowmik, op. cit. ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে **Vested and Non-resident Property Act** ঘোষণা করা হয়।

২৩. T. V. Rajeswar, **Across the Border—II, Census to Avert Communal Friction,** in **The Statesman,** 7 April, 1990.

এই প্রবন্ধের লেখক টি. ভি. রাজেশ্বর ১৯৮০-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন ডাইরেক্টর এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন গভর্নর। তিনি স্টেটসম্যান কাগজে **Across the Border** শিরোনামায় দুটো প্রবন্ধ লেখেন।

২৪. 'Life is not ours', P. 19.

২৫. Ibid.

২৬. মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০,

বাংলাদেশের এই দুজন বিশিষ্ট লেখক তাঁদের গ্রন্থে লেখেন: "পার্বত্য চট্টগ্রামের দশকব্যাপী রক্তাক্ত ঘটনাবলীতে বহু উপজাতীয় দেশত্যাগ করেছেন; এটা ধর্মীয় নয়, তবে এথনিক নিপীড়নের দৃষ্টান্ত"।

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৫০

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা: ৩৪; ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, **ধর্মের নামে নির্বাচন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা**, ঢাকা, ১১ই এপ্রিল, ১৯৯১। বাংলাদেশে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

৩১. 'Life is not ours', p. 19.

৩২. Ibid.

৩৩. **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**; মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০-৫১

৩৪. **সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য**, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়, **বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ** কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০মে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়। মনজুরুল আহসান বুলবুল, **হটলাইন বাংলাদেশ: কমিশন ফর জাস্টিস অ্যাণ্ড পীস; সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের ওপর একটি রিপোর্ট**, দ্র. **সংবাদ**, ঢাকা, ৭. ১১. ৯০; গ্লানি (**Disgrace**), ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তথ্য। উল্লেখ্য এই, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ পরিচালিত সরকার কর্তৃক প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি রচনা উল্লেখ করছি:

মুনতাসীর মামুন, **সব সম্ভবের দেশে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা**, দ্র. একতা, ঢাকা, ৯. ১১. ৯০; মতিউর রহমান, **'নিজদেশে পরবাসীদের কথা'**, দ্র. সংবাদ, ঢাকা, ১২. ১১. ৯০; সৈয়দ বোরহান কবীর, **'সরকারি লোকেরাই হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে,'** দ্র. খবরের কাগজ, ঢাকা, ৮ নভেম্বর, ১৯৯০; মালেকা বেগম, **ক্ষমাহীন দাঙ্গা সৃষ্টিকারীরা ক্ষমা পায় কিভাবে?** দ্র. **খবরের কাগজ**, ঢাকা ৮ নভেম্বর, ১৯৯০। এই দাঙ্গা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ৫ নভেম্বর, ১৯৯০ একটি সভায় মিলিত হন। বিচারপতি কামালউদ্দিন

হোসেন, বিচারপতি কে. এম. সোবহান, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, ডক্টর কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম (সদস্য সচিব), এডভোকেট আলতাফ হোসেন (সভাপতি, ঢাকা আইনজীবী সমিতি), এডভোকেট এস. এম. শামসুল ইসলাম (সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি) এবং এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী (যুগ্ম-সচিব) হলেন এই গণ-তদন্ত কমিশনের সদস্য। ৪ নভেম্বর, ১৯৯০ এই কমিশনের প্রথম সভা সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ৫৮ পৃষ্ঠার রিপোর্টে কমিশন বাংলাদেশের দাঙ্গার বিষয়ে যেসব তথ্য পরিবেশন করেন তাতে হিন্দুদের দুরবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে ধারণা করা যায়। এই অপ্রকাশিত রিপোর্টকে ৩০-৩১ অক্টোবর, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গার এক মূল্যবান দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

৩৫. 'Life is not ours', p. 19.

৩৬. **Bangladesh population Census, 1981, p. 74.**

৩৭. Ibid.

৩৮. Ibid, pp. 74-75

৩৯. Ibid, pp. 75-76

৪০. Ibid. p. 75

৪১. Bimal Pramanik, **Inter face of Migration and Inter-Religious Community Relations in Bangladesh and Eastern India,** Paper presented by him at a Workshop in Calcutta on May 12, 1990 (Workshop organized by the **Bharat-Bangladesh Maitri Samiti**). বিমল প্রামাণিক বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এই নিবন্ধটি বাংলায় রচিত। কিন্তু তিনি ইংরেজি শিরোনামাও দেন। আমি এখানে সেভাবেই উল্লেখ করলাম।

৪২. Ibid.

৪৩. আমার রচনার প্রথম পর্বে ভারতে সংখ্যালঘু আগমনের যে সংখ্যা উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে '৩৯ লক্ষ ও ৩৫ লক্ষ যোগ করে এই সংখ্যা পাওয়া যায়।

৪৪. মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত; **'Life is not ours'**

৪৫. 'Life is not ours', p. 4.

৪৬. Ibid ; ইত্তেফাক পত্রিকার ফাইল, ১৯৯১ (ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা) ; নতুন বাঙলা, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯২ ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মে, ১৯৯২। ১০ এপ্রিল, ১৯৯২ বি. ডি. আর ও সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে লোগাংয়ের চাকমা 'শান্তিগ্রামে' নারকীয় হত্যাকাণ্ড হওয়ায় বহুসংখ্যক চাকমা ভারতে প্রবেশ করে। আনন্দবাজার পত্রিকার ২০ মে-র সংখ্যায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সদ্য ভারতে পালিয়ে আসা চাকমা শরণার্থীদের বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরায় টাকুমবাড়ি শরণার্থী শিবিরের ছবিও বের করা হয়েছে। এই খবরে বলা হয়েছে, "বর্তমানে ভারতে চাকমা শরণার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।"

৪৭. Chitta R. Dutta, Different Aspects of Discriminaton Against Religious Minorities in Bangladesh, in South Asia Forum Quarterly, Vol 4, No 4 : Fall 1991. ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮-২০ অক্টোবর লণ্ডনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে চিত্তরঞ্জন দত্ত ও নিমচন্দ্র ভৌমিক দুটো প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিমচন্দ্র ভৌমিকের কথা আগেই বলা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দত্ত হলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীর উত্তম' (Bir Uttam) উপাধি প্রদান করে। তাঁর রচিত প্রবন্ধ থেকে অনেক তথ্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

৪৮. Ibid.

৪৯. Ibid.

৫০. Ibid.

৫১. Ibid.

৫২. Ibid.

৫৩. Ibid.

৫৪. Ibid.

৫৫. Ibid.

৫৬. Ibid.

৫৭. Ibid.

৫৮. Ibid,

৫৯. Ibid.

৬০. Ibid.

৬১. The Holy Quran, Text, Translation and Commentary, by Abdulla Yusuf Ali, New Revised Edition, U. S. A., 1989 ; Al-Hadis, an English translation and Commentary with vowel-pointed Arabic text or Mishkat-ul-Massabih (being a collection of the most authentic sayings and doings of Prophet Muhammad) ; ed. by Fazlul Karim, Calcutta, 1938-1940, 4 vols (Henceforth abbreviated as Al-Hadis) ; Ameer Ali, Syed, The Spirit of Islam, London, 1952, pp. 58-59. ইসলামের মৌল আদর্শের জন্য দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। উল্লেখ্য এই, হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত 'মদিনা সনদের' মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিকতার উপাদান পাওয়া যায়। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মদিনায় আসার পরেই হজরত মহম্মদ এই সনদ প্রদান করেন। এই দলিল ইবনে হিশাম তাঁর গ্রন্থের পাতায় সংরক্ষণ করেন। এই সনদ অনুযায়ী মদিনার ইহুদীরাও মুসলমানদের মতো স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মপালন করার অধিকার পায়। তারাও নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের বনিয়াদের উপরে হজরত মহম্মদ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতে প্রয়াসী হন। স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় ইসলাম ও অন্য ধর্মগোষ্ঠীদের সহাবস্থানের বিষয়টি অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করে (দ্র. Ameer Ali, Syed, op. cit ; হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, উদার, মানবিক ও যুক্তিশীল মনন পর্যালোচনার ও তাঁর অমূল্য বাণীসমূহ সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য দ্রষ্টব্য পবিত্র গ্রন্থ Al-Hadis)

৬২. Chitta R. Dutta, op. cit ; আবদুল হক ফরিদী, **মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৮২। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি নিয়োজিত হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাশ করা হয়।

৬৩, মু. সেকেন্দার আলী, **দাখিল ইসলামী পৌরনীতি** [নবম-দশম শ্রেণী], ঢাকা, ১৯৮৯ [প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫], বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নবম-দশম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত, পত্র নং পাঠ্য / ৫৩১, এস-৪

তারিখ ৩-১২-৮৪। দশটি অধ্যায়ে লিখিত এই গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে: "ইসলামের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের মন-মগজ ও মানসিকতা এবং স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণকে ইসলামী পথে নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কাজ। এখানেই শেষ নয়, ইসলামী আদর্শের বিকাশ দান ও তা অনুসন্ধান করে চলার পথে যত প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা দূর করা, ইসলাম বিরোধী চিন্তা, সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মতের প্রতিরোধ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য" (দ্র. পৃঃ ৩৭)। এই ধরনের বহু উদ্ধৃতি এই গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠা থেকে দেওয়া যায়। ইতিহাস বিষয়ক যেসব গ্রন্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তাতেও ইসলামের ইতিহাসের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখ করা হলো: (১) **সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ**, ষষ্ঠ শ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৮, (২) **সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ**, ৭ম শ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৭, (৩) **সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ**, অষ্টম শ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৮, (৪) **বাংলাদেশের ইতিহাস**, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য; ঢাকা, ১৯৮৪। তাতে ভারতীয় ইতিহাসের পারস্পরিক সমাদর ও সদৃশকরণের উপাদানগুলো অবহেলিত হয়।

৬৪. মাদ্রাসার পাঠ্য সূচীর বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: (১) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা **পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী**, ১৯৮৬-১৯৮৭; (২) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী, ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৯০; (৩) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৯০-১৯৯১; আবদুল হক ফরিদী, **মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৭০-৭৫, ৮৪-৮৫

৬৫. আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬-৮০

৬৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭। মাদ্রাসায় কত সংখ্যক ছাত্র শিক্ষালাভ করছে, কতজন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন এবং কত সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

(ক) এখানে **এই গ্রন্থ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনামূলক পরিসংখ্যান, ১৯৮০-৮৩ পর্যন্ত দেওয়া হলো:**

স্তর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩ (সাময়িক)	শিক্ষকদের সংখ্যা ১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩ (সাময়িক)	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩ (সাময়িক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
দাখিল	১,৪২৬	১,৫০২	১,৩৬১	১০,৭৯৭	১১,০১৬	১১,৯১০	১,৩১,২১০	১,৫০,২০০	২০০,৭৫৩
আলিম	৪৭৭	৪৯৪	৪৫২	৬,০০১,	৮,৫৩২,	৫,২১৮	৮১,৫৫০	৮৩,৩৫০	৭৯,৮২৬
ফাজিল	৫৯৬	৫৯৬	৫৭৫	৮,৭৪৮	৮,৭৪৮	৮,৯৫২	১,৩২,৩১২	১,৩৬০০০	১,২৭,১৭০
কামিল	৬৩	৬৫	৬২	১,৩১২	১৩১২	১,৩৮২	১৮,৩৯৬	১৮,৫০০	২২,৩১২
মোট	২,৫৬২	২,৬৫৭	২,৪৫০	২৬,৮৫৪,	২৯,৬০৮	২৬,৬৬২	৩,৬৩,৩৬৮	৩,৮৮,০৫০	৪,২০,২৬২

দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ১ : ১৭, ১ : ১৫, ১ : ১৬ এবং ১ : ১৬

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষার (ফাজিল ও কামিল) ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক চিত্র :

Year & Type	Number of Institutions	Number of Teachers Total	Female	Number of Students Total	Girls
Fazil					
1980	596	7324	4	132000	4966
1981	586	7845	5	122312	5113
1982	592	8748	7	136000	5688
1983	591	7908	7	148986	5688
1984*	594 (15)	8149	8	153524	5862
1985	615 (17)	11883	10	155036	5919
Kamil					
1980	56	1075		17366	481
1981	56	1095		17390	492
1982	60	1185		18500	506

1983	61	1195	24987	506
1984*	67 (6)	1308	27301	557
1985**	69	1556	28345	592

Note : Figures in parenthesis indicates number of provisionally permitted institutions. ** Including two Government Kamil Madrasahs.

এখানে আবদুল হক ফরিদী যে পরিসংখ্যাণ উদ্ধৃত করেন তার মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃত আলেমদের ভূমিকা কিভাবে গৌণ হয়ে পড়ছে তার বিষয়েও বাংলাদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রচনা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা হলো। আবু জাফর শামসুদ্দীন, **প্রগতিবাদী আন্দোলনের ধারায় আলেম সমাজ**, দ্রষ্টব্যঃ **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৮-২৪।

এই প্রবন্ধে লেখক বলেন : "ওরা সরকারি অনুমোদন ও অর্থ সাহায্যে ইসলামী শিক্ষার নামে প্রকৃতপক্ষে মূর্খতা ও গোমরাহি প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্যে পল্লী অঞ্চলে এবং শহরেও ব্যাপকভাবে বিশেষ নামের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। বাংলার মুসলমান সমাজকে মধ্যযুগের গোমরাহিতে নিমজ্জিত" করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এখানে লেখক 'মওদুদী জামাতে ইসলামী' ও 'অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের' ভূমিকা আলোচনায় 'ওরা' শব্দ চয়ন করেন। তিনি দুঃখ করে এই কথাও বলেন, "দেওবন্দে মতাদর্শে বিশ্বাসী দেশের প্রকৃত আন্দোলন একটি সংঘবদ্ধ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ" করতে না পারার জন্য ইসলাম ধর্মচর্চায় মওদুদীর জামাতে ইসলামীর প্রাধান্য বজায় থাকছে (ঐ, পৃষ্ঠা ২২-২৪)। এই গ্রন্থের আর একটি প্রবন্ধও উল্লেখ্য : মাওলানা আবদুল আওয়াল, **জামাতে ইসলামীর ধর্মব্যবসা**, দ্রষ্টব্যঃ **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**, পৃষ্ঠা ৪৬-৫৪।

৬৭. **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**, এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; ডঃ কামাল হোসেন, **একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই গণতান্ত্রিক ফোরাম গঠনের লক্ষ্য**, দ্র. **অধুনা**, সম্পাদক মাহবুব-উল-করিম, ঢাকা, বর্ষ ১ সংখ্যা ৬, মার্চ ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬-১২। ডঃ কামাল হোসেন বাংলা দেশে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করার প্রতি বিশেষ-ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন : "আইনের শাসনের মাধ্যমেই

কেবল উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্যে আইনের শাসনই পূর্ব শর্ত” (ঐ, পৃষ্ঠা ১০)। বাংলাদেশে যে আইনের শাসন নেই তা তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা করতে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা সহায়ক। তার জন্য দ্রষ্টব্যঃ **খবরের কাগজ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা** ’৯২, ২৬ মার্চ, ১৯৯২।

৬৮ Chitta R. Dutta. op. cit.

৬৯, **Asa**, Published by **Voluntary Health Services Society**, September 1990.

৭০. Census Reports of 1951, 1961 and 1971; বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ অমলেন্দু দে, **ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা**, কলিকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯২, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭১. Census Reports of 1971 and 1981; Also See for analytical study T.V. Rajeswar, **Across the Border—1, Serious Influx from Bangladesh, in The Statesman**, April 6, 1990.

৭২. **পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার**, নয় বছর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ২১, জুন ১৯৮৬।

৭৩. T. V. Rajeswar, op. cit. এখানে মুদ্রণ ত্রুটির জন্য মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনসংখ্যা ৬৯% উল্লেখিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু টি. ভি. রাজেশ্বর লিখিত প্রবন্ধের প্রথম অংশ পড়ে যে মন্তব্য করেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো : **Statesman (April 7, 1990)** পত্রিকার Staff Reporter লেখেন : Reacting to the first part of Mr. T.V. Rajeswar's article, which we published yesterday, Mr. Jyoti Basu issued a statement in Writers Buildings on Friday saying that the former Governor of West Bengal had based his conclusions on "wrong and unwarranted assumptions." The statement said : "It would have been better if he had tried to base his article on correct facts and figures."

Referring to the report the Chief Minister pointed out that Mr. Rajeswar's figure of the Muslim population in the districts (between 31 per cent and 69 per cent) was incorrect and not based on facts. It is a fact that the population in

some border districts had gone up more compared to the state average. This was inter alia owing to the fact that some boder districts had influx from Bangladesh which comprised both the Hindus and Muslims. This was evident from the figures of infiltrators across the border from Bangladesh who had been pushed back and on local information.

"This only goes to show that Mr. Rajeswar has based his conclusions on wrong and unwarranted assumptions." Mr. Basu stated the problem of the influx had been engaging the attention of the State Government for quite some time. The State Government had suggested certain measures to control this problem like sanction of additional staff for the Mobile Task Force and introduction of restrictions on Bangladesh nationals who visited India, the statement added. —Staff Reporter.

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিবৃতির উত্তরে টি. ভি. রাজেশ্বর বলেন : "I wish Mr. Jyoti Basu had waited for the second and concluding part of my article on the influx from Bangladesh. After my tour in the NorthBengal districts in May 1989, I had written a letter to Mr. Jyoti Basu on June 5 drawing his atention to this serious problem. The exact figures of Muslim percentage of the population, mentioned in that letter were 30·97 per cent from Birbhum ; 35·79 percent for West Dinajpur ; 45·27 percent for Malda ; and 58·66 percent for Murshidabad, as per the figures published in the 1981 Census. (The figure of 69 per cent for Murshidabad published in the first part of my article was a printing error by The Statesman).

"I had also mentioned that the decadal growth rate of the Muslim population in West Bengal, as per the 1981 Census, was 29·6 percent while the overall growth rate for the State was 23·2 percent. I had also cautioned in that

letter against the issue of identity cards in the border districts without a proper Census, as it might result in legalizing a large number of Bangladeshi infiltrants. Mr. Jyoti Basu may kindly refer to this letter and also see the 1981 census report as well as the handbook of statistics published by the state.

"I submit that there are no wrong or unwarranted assumptions in my article, nor was it intended to embarrass the State Government. An impartial reading of the article will show that its purpose was to put forth the problem in proper perspective so that the necessary remedial measures could be taken".

৭৪. Ibid ; Also see Census Report of 1981.

৭৫. Ibid.

৭৬. Sanjoy Hazarika, **Between 10 and 14 million migrants have settled in this country Bangladeshisation of India, in The Telegraph,** Calcutta, February 6, 1992 ; Swapan Das Gupta, **Politics of Infiltration Lebonisation of eastern India should be averted at all costs,** in Sunday, March 22-29 1992. Sanjoy Hazarika's article is based on a study commissioned by the American Academy of Arts and Sciences, Harvard and Toronto Universities. Sanjoy Hazarika is a repoter for The New York Times. সঞ্জয় হাজারিকা তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করেন : "not less than 10 to 14 million migrants and their descendants have over all settled in India." সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের মতে, গত এক দশকে ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশী ভারতকে তাদের আবাসস্থল করেছে। স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে এইসব তথ্য উদ্ধৃত করেন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে স্বপন দাশগুপ্ত লেখেন : "Jyoti Basu has written on numerous occasions to Delhi

to find a way out. 'We are not a dharmasala'; he once told the press". (দ্র. Ibid)।

৭৭. Ibid.

৭৮. Ibid. এম. এম. জেকব যে তথ্য সরবরাহ করেন তার সম্বন্ধে স্বপন দাশগুপ্ত মন্তব্য করেন: "But official statistics underestimate the problem to the point of absurdity" (Ibid)

৭৯. Ibid.

৮০. Ibid; T. V. Rajeswar, **Across the Border—I,** op. cit.

৮১. T. V. Rajeswar, **Across the Border—II,** op. cit.

৮২. Ibid; তাপস সিংহ, **অনুপ্রবেশ,** দ্র. **আনন্দবাজার পত্রিকা,** বুধবার ২৭ মার্চ, ১৯৯১, তাপস সিংহ বিশদভাবে এই সমস্যা আলোচনা করেন। তিনি লেখেন: "সরকারি জনগণনার হিসাব অনুসারে, '৭১ থেকে '৮১-র মধ্যে রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২২.৯ ভাগ। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু '৮৬-র ২২ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় বলেছিলেন, সীমান্তবর্তী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৯ শতাংশ এবং নদীয়া জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৩ শতাংশ। অথচ হাওড়া বা বাঁকুড়ায় এই বৃদ্ধির হার ২০.২২ শতাংশ।

"বেসরকারি সূত্রে পাওয়া একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। সীমান্তবর্তী ন'টি জেলা, যেমন মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের (মিনিষ্ট্রি অব এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স) একটি সমীক্ষার রিপোর্টেও এ কথা বলা হয়েছে। নদীয়া জেলার একটি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, '৮১-তে নদীয়ার লোকসংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ ৭৭ হাজার। অথচ অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবেই '৮২-তে নদীয়া জেলাতে রেশন কার্ড ইস্যু করা হয় ৪৪ লক্ষ।

"যেমন, কলকাতার গার্ডেনরিচ অঞ্চলে '৮৮-তে রেশন কার্ড ইস্যু করা হয় ৩ লক্ষ ১২ হাজার। অথচ '৮৭-তেই এলাকার ভোটারের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫০০ জন। শিয়ালদহ বিধানসভা কেন্দ্রে '৮৭-র ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার। কিন্তু '৮৮-র নভেম্বর পর্যন্ত রেশন কার্ড দেওয়া হয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার। উল্লেখ্য, শিয়ালদহ

কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে রাজাবাজারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও। যা অনুপ্রবেশকারীদের 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল' হিসাবে পরিচিত। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বেলগাছিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র মিলে ভোটারের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৪ হাজার। অথচ '৮৮-র নভেম্বর পর্যন্ত ওই দুটি কেন্দ্রে মোট রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো, কেন এই বিপুল হারে রেশন কার্ড ইস্যু করা হলো, তা নিয়ে রাজ্য সরকার একবারও খাদ্য দফতরের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন না। গোয়েন্দা দফতর একবারও তদন্ত করে দেখল না, কেন এবং কাদের সুপারিশে রেশনিং অফিস লক্ষ লক্ষ রেশন কার্ড ইস্যু করছে?" (দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ মার্চ ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১)।

৮৩. The Statesman, April 1989.

৮৪. Ibid.

৮৫. Ibid, December 1989. ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা মুরলী মনোহর যোশী তাঁর বিবৃতিতে এই কথা বলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কর্নেল সব্যসাচী বাগচী (অবসর প্রাপ্ত) বলেন, ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৫ লক্ষেরও বেশী বাংলাদেশী ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে (দ্র. The Statesman, February 17, 1991)।

ভারতীয় জনতা পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট সিকন্দর বখত বলেন, ভারতে অস্বাভাবিক অনুপ্রবেশ ঘটছে। অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক। তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশ মহাপ্লাবনের রূপ ধারণ করেছে' ('taking the shape of a deluge'). See The Statesman, February 18, 1991.

৮৬. The Statesman, Fabruary 13, 1991. পাকিস্তানের Muhajir Qaumi Movement-এর সঙ্গে বাংলাদেশ মোহাজির সঙ্ঘের কোনো যোগাযোগ রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না (Ibid). আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (২৭ মার্চ, ১৯৯১) তথ্য থেকে জানা যায়, রইসউদ্দিন বিশ্বাস হলেন বাংলাদেশ মোহাজির সঙ্ঘের সভাপতি। মোহাজিররা ভারতের নাগরিকত্ব দাবি করে।

৮৭. Paper Presented by Manik Sen at a Workshop organised by **Bharat Bangladesh Maitri Samiti** at Calcutta

on May 12, 1990. মানিক সেন নিজে সমীক্ষা করে যেসব তথ্য পেয়েছেন তার ভিত্তিতেই বলেন।

৮৮. Ibid.

৮৯. Ibid; আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ তাপস সিংহ, **অনুপ্রবেশ**, **আনন্দবাজার পত্রিকা**, ২৭ মার্চ, ১৯৯১।

৯০. Ananta Kumar, Infiltration from Bangladesh In 1988. Ananta Kumar visited different parts of West Bengal and collected valuable materials on this subject. An unpublished document.

৯১. বদরুল আলম খান (সম্পাদক) **বাংলাদেশ : ধর্ম ও সমাজ**, সেণ্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারী, ১৯৮৮; **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**; **খবরের কাগজ**, ২৬ মার্চ, ১৯৯২—বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বদরুল আলম খান 'সম্পাদকের কথা' অংশে লেখেন: "গ্রামীণ সমাজ ধর্মের যে পবিত্র রূপ লালিত করে, তাকে অপবিত্র করছে ধর্ম ব্যবসায়ীগণ, শোষকের স্বার্থ রক্ষার কারণে" (দ্র. বাংলাদেশ : ধর্ম ও সমাজ)

৯২. বদরুল আলম খান (সম্পাদক), প্রাগুক্ত; মাওলানা আবদুল আওয়াল, **জামাতে ইসলামীর ধর্মব্যবসা**, দ্র. বাংলাদেশে **মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**। বাংলাদেশ রাজনীতিতে ইসলামিক ও সেকিউল্যার উপাদান সম্বন্ধে আনিসুজ্জামান, তালুকদার মনিরুজ্জামান, রাজিয়া আকতার বানু, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাখাওয়াত আলী, বদরুল আলম খান, এম. এম আকাশ, ভুঁইয়া মনোয়ার কবীর, বদরুদ্দীন উমর, আহমদ শরীফ, ডঃ হাসানউজ্জামান প্রমুখ লেখকেরা আলোচনা করলেও, ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহে প্রকৃত ধর্মতত্ত্বমূলক আলোচনার অভাব থাকায় বাংলাদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থ ও বিভিন্ন 'তফসীর' বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এইসব গ্রন্থের লেখকেরা কতটা ক্রপদী যুগের ইসলাম এবং ইসলামের মৌল আদর্শ যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশে জামায়েতে ইসলামী দল বাংলাদেশে 'ইসলামী রাষ্ট্র' স্থাপনের যে আন্দোলন করে তাও লক্ষণীয়। গত এক দশকে এই দলের পক্ষ থেকে বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'ইসলামী বাংলাদেশ' গঠনের বিষয় গুরুত্ব পায়। জামায়াতে ইসলামী নেতা আমীর গোলাম আযম অনেকগুলো

পুস্তিকা লেখেন। তার মধ্যে কুড়িটি পুস্তিকা পড়বার আমার সুযোগ হয়েছে। তিনি ইসলামী বাংলায় কেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মের সঙ্গে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মসমূহের সহাবস্থান হচ্ছে না, এই প্রশ্নটি সযত্নে পরিহার করেন। তাঁর রচিত 'সংক্ষিপ্ত তফসীর' পুস্তিকায় বা অন্য পুস্তিকায় ইসলামের ঔদার্যবোধ, মানবিকতা, সহনশীলতা, নারীদের প্রতি সম্ভ্রমবোধ ইত্যাদি গুণগুলো এমন গুরুত্ব পায়নি যাতে বাংলাদেশে বহুধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্রটি সুদৃঢ় হতে পারে। তাঁর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করছি: **বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী**, ঢাকা, মার্চ ১৯৮১; **ইসলামী আন্দোলন সাফল্য ও বিভ্রান্তি**, ঢাকা, ১৯৮৩; **ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন**; **ইকামাতে দ্বীন**; **জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য**; **ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ**; **গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী**; **ইসলামী বিপ্লবের পথে**; **অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী**, ঢাকা, ১৯৮৪; **বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী**।

৯৩. ডঃ হাসান উজ্জামান, **রাজনৈতিক উন্নয়নে ঐকমত্য এবং বাহাত্তরের সংবিধানে পরিলক্ষিত সম্ভাবনা**, দ্র. **খবরের কাগজ**, ২৬ মার্চ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৬-৪০। জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে 'ইসলামী হুকুমাত' কায়েম করা। এই দল ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রবাদ, পশ্চিমী গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদির বিরোধী। গোলাম আযম লেখেন: "যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলে তাহলে ভারতের আধিপত্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু না হলে রাশিয়ার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এদেশটি রাশিয়ার খপ্পরে পড়ারই প্রবল আশংকা আছে।" (দ্র. **বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়েতে ইসলামী**, পৃ ৩১-৩৩)। কিভাবে জামায়েত ইসলামী দল গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে গোলাম আযম লেখেন: "মসজিদ সমূহকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সাধারণ মুসল্লীগণকেও ইসলামী দাওয়াতের আওতায় আনা যাচ্ছে। ইমাম ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পল্লী অঞ্চলেও জনগণের মধ্যে পৌছাবার ব্যবস্থা করেছে"।

(দ্র. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫)

৯৪. পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত দৈনিক পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে বহু তথ্য প্রকাশিত হয়।

৯৫. Sadeq Khan, State-bound nationalism and development efforts-II The question of Lebensraum, in Holiday, Dhaka, 18. 10. 91 ; পবিত্রকুমার ঘোষ, বাংলাদেশিদের বাসভূমির দাবি, ইতিহাসের পটে সাম্প্রতিক, দ্র. বর্তমান, নভেম্বর ২৮, ১৯৯১; Sunday, March 22-29, 1992. স্বপনকুমার দাশগুপ্ত লেখেন : "The long term threats posed by this human wave, a part of what a Bangladeshi writer has justified as the 'question of Lebensraum' is not unknown to either the State or the Central Government." (Vide Sunday, op. cit,) 'লেবেনস্রাউম' শব্দটি জার্মান। হিটলার জার্মানদের জন্য বৃহত্তর বাসভূমির দাবি উত্থাপন করেন। তখন তিনি 'লেবেনস্রাউম' স্লোগান আউড়ে যুদ্ধের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেন। উল্লেখ্য এই, ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকায় বাংলাদেশীদের জন্য বৃহত্তর বাসভূমির দাবিটিকে রূপদানের উদ্দেশ্যে 'লেবেন-স্রাউম' প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

৯৬. মতিউর রহমান, মুসলিম লীগের 'পাকিস্তানী ঘো'র এবং খাজা খায়েরের আসা-যাওয়া, দ্র. সংবাদ, ঢাকা, সোমবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৩৯৭। পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি খাজা খায়েরউদ্দিন বাংলা-দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানে বসবাস করেন। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তিনি কয়েকবার ঢাকায় আসা-যাওয়া করেন। তিনি বাংলাদেশের মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপের সাথে মিলিত হয়ে পুনরায় একটি দলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের আগে কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন ঢাকার খাজা খায়েরউদ্দিন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের পর ১০ এপ্রিল টিক্কা খানের উদ্যোগে ঢাকায় ১৪০ সদস্যের 'শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। তার আহ্বায়ক ছিলেন খাজা খায়েরউদ্দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানে চলে যান। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে শুরু করেন। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আগা শাহী ঢাকায় এসে 'আনুষ্ঠানিকভাবেই দু'দেশের মধ্যে কনফেডারেশনের প্রস্তাব' দেন। কিন্তু সে আলোচনা আর এগোয়নি। (দ্র. মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত)। বর্তমানে ভারতেও কোনো কোনো মহলে এই 'কনফেডারেশন' গঠনের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ভাঙা-গড়া

অভ্র ঘোষ

দেশভাগের পর বাঙালি মধ্যবিত্ত খুব ভাঙাচোরা একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছিল, একথা তো বহু আলোচিত। উদ্বাস্তু এক বিরাট জনসংখ্যা ছিন্নমূল হয়ে দিশাহারা তখন। এদের ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিই শুধু বিপন্ন হয়নি, বিধ্বস্ত হয়েছিল এ-অঞ্চলের শহর-গ্রামের জন-বিন্যাস, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের হালচাল। রাজনীতিতেও লেগেছিল এক প্রবল ধাক্কা। বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনযাপনে তীব্র আর্থিক হাহাকারের দরুন মূল্যবোধের সংকটও ছিল এক ভয়াবহ সমস্যা। মন্বন্তর, যুদ্ধ ও অব্যবহিত দেশভাগের পর শিকড়ছিন্ন, উৎপাটিত বাঙালি জীবনের এই জটিল ও ক্লিষ্ট ছবিটি স্পষ্টভাবেই ধরা আছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা গল্প-কবিতা-উপন্যাস ও শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে। মন্বন্তরের প্রসঙ্গ উঠলেই তো মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, সোমনাথ হোড় ও চিত্তপ্রসাদের ছবি আর ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা মানে তো দেশভাগের হাহাকার।

মধ্যবিত্ত বাঙালি এই বেসামাল অবস্থাটা কাটিয়ে নিজেকে গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত ছিল স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশকে। নিজেকে গুছিয়ে তোলার পর্বে এই মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ছিল একরকম, ইদানীং যে-স্বপ্নের ধরন পাল্টাচ্ছে অতি দ্রুত। গত পঁচিশ বছরে বাঙালির জীবনযাপনের ইতিহাসে এই পরিবর্তমান স্বপ্নের রকমফেরটি বোধহয় বোঝা যাবে একটু লক্ষ্য করলেই।

অর্থনীতি ও রাজনীতির কথা দিয়েই শুরু করা যাক। সাংস্কৃতিক জীবনের পরিমাপ করতে হলে ওই দুই বৃত্তের হিসাব তো নিতেই হবে। সদ্য-স্বাধীন দেশে তখন নেহরু মডেলের অর্থনীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। নেহরু মডেল মানে পাঁচসালা পরিকল্পনা-মাফিক এক মিশ্র অর্থনীতির ধাঁচ। মিশ্র-অর্থনীতির জোয়ারে এখানে-ওখানে শিল্পোদ্যমের সূত্রপাত তখন। চটকল-চিনিকল-কাপড়ের মিল ছাড়াও ভারী ইস্পাত শিল্প, ডি. ভি. সি-এর প্রকল্প,

বিদ্যুৎ বিকিরণের নানা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের এসব শিল্পসংস্থানে বাঙালি মূলধনের যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, তা কিন্তু নয়। নব্বই-ভাগ মূলধনের জোগান এসেছিল অবাঙালি টাটা-বিড়লা-জৈন-খৈতান জাতীয় পরিবার থেকে। তবে শিল্পস্থাপন মানে তো কর্মসংস্থান, বাঙালি মধ্যবিত্তের সেটুকুই লাভ। উনিশ শতকেও দেখা গেছে—বাণিজ্যে, কলকারখানা স্থাপনে বাঙালি মূলধন খাটাতে চায় নি, মধ্যবিত্তের ভরসা ছিল ওকালতি-মাস্টারি-কেরানিগিরির নিরাপদ চাকরিতে, আর বিত্তশালী স্ফীতকায় শ্রেণী পায়ের ওপর পা তুলে জমিদারিতেই ছিল সিদ্ধহস্ত। শিল্পায়নের অ্যাডভেঞ্চার তার ধাতে সয় না। হয় তো বা এর পিছনে এক ভৌগোলিক কারণ আছে। উর্বরা জমি আর নদীপ্রধান সোনার বাংলায় স্বল্পশ্রমে কৃষিবিপ্লবই যখন সম্ভব, কীই বা দরকার বণিকবৃত্তিতে যাওয়া অথবা শিল্পান্দোলনে! বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও স্বাভাবিকভাবে তাই ধরা পড়ে সহিষ্ণুতা, বদান্যতা, আবেগ আর কল্পনার প্রাবল্য।

ব্যবসা-বাণিজ্যে স্ফীত হওয়ার চেষ্টায় না মাতলেও চাকুরিপ্রেমী বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও যে খুব নিরাপদ হতে পেরেছিল, তাও কিন্তু নয়। বেসরকারি মূলধনের বিনিয়োগ বা আর কতটুকু? দুই বাংলার কোটি কোটি বাঙালির কর্মসংস্থানে তা নিতান্তই সামান্য। ফলে অনিবার্য-ভাবেই ছিল বেকারত্বের জ্বালা, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব আর বাসস্থানের সমস্যা। নেহরু পরিকল্পনায় এই অবস্থাটা সামাল দেবার জন্য গড়ে উঠল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থান, বিশেষত ভারি শিল্প। আর জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দাবি অনুযায়ী শিক্ষা-বিদ্যুৎ-পরিবহন-পোতনির্মাণ ও সেচের জলের ব্যবস্থায় এগিয়ে এল রাষ্ট্রক্ষমতা। আর এসবের সূত্রেই বারংবার ধ্বনিত হতে থাকল নেহরুর সমাজতন্ত্রের আদর্শ। দারিদ্র্য, হতাশা, কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি কতটা সামাল দিতে পেরেছিল নেহরুর অর্থনীতি বা তাঁর সমাজতন্ত্র, সে তো এক বিতর্কের ব্যাপার, আপাতত সে-বিতর্কে যাওয়া প্রাসঙ্গিক হবে না। তবে বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনীতি ও সমাজনীতি যে অনেকটাই নেহরুজির মডেল-নির্ভর ছিল, সে-কথাটা বোধহয় এখন নির্মোহভাবে বলা যায়।

সন্দেহ নেই মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজ সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর। স্বভাবতই কমিউনিস্ট পার্টির এক বড় ভরসা ছিল এই শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তই। পার্টি যে সমাজতন্ত্রের কথা বলত অবশ্যই তা নেহরুর সমাজতন্ত্র ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতাকে ধরে যে-নিয়ন্ত্রণবাদ, ভারি শিল্পের ব্যবস্থা

করে বিকাশমান অর্থনীতির কাঠামো গড়ে তোলা কিংবা সেচ-বিদ্যুৎ-শিক্ষা-পরিবহনের দায়িত্ব নেওয়ার ভিত্তিতে নেহরুর সমাজতন্ত্র যে খুব নিন্দিত ব্যাপার ছিল কমিউনিস্ট মহলে, তা কিন্তু নয়। তবে নেহরু-নীতির দুর্বলতা ছিল তার অসম্পূর্ণতায়, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাঠামোগত দুর্বলতায়। কমিউনিস্টরা কী রকম ভাবতেন নেহরুর পরিকল্পনা বিষয়ে, তার সামান্য একটু পরিচয় দেবার জন্য মান্য এক অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের একটি রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক।

> …পণ্ডিত নেহরু আর্থিক প্রগতির দুই মূল্যবান সূত্রের একটি শিখেছিলেন, অন্যটি শেষ পর্যন্ত তাঁর উপলব্ধির বাইরে ছিল। ইস্পাত—ভারি শিল্প—কলকব্জা তৈরি বাদ দিয়ে আমাদের মতো দরিদ্র, রপ্তানীরহিত দেশের দ্রুত প্রগতি সম্ভব নয়, এটা তিনি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলেন, এবং বিনিয়োগের বৃহদংশ যে ওরকম কয়েকটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন তা মেনে নিতে তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়নি। কিন্তু বিনিয়োগের বিন্যাসে শিল্পাদির প্রাধান্য ঘটলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্দেশ দেবে জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যাওয়ার, অন্যথা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে একদিকে যেমন অসাম্যের সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে তেমনি বিনিয়োগানুগ সঞ্চয়ের অভাব ঘটবে, সব মিলিয়ে জাতীয় প্রগতির হার ব্যাহত হবে। এই দ্বিতীয় সূত্রটি পণ্ডিত নেহরু আদৌ বুঝতে পারেননি, কিংবা পারলেও অবহেলাভরে পাশে সরিয়ে রেখেছেন।
>
> কারণ স্পষ্ট। জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়ানো মানেই তিতিক্ষা কৃচ্ছ্রসাধনা, ভোগবিলাসের মাত্রা কমিয়ে সারল্যে ফেরা, নিরাভরণতায় পুনশ্চারণ। কে করবে এই কৃচ্ছ্রসাধনা? দেশের চাষী, মজুর, নিম্নবিত্তদের জীবনযাত্রার মান নামিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া নিরর্থক, কারণ তারা অধিকাংশই অনাহারের উপান্তে, তাছাড়া সমাজের উপরের ধাপ থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন না-করলে সে-রকম নির্দেশদান অক্ষমার্হ ধৃষ্টতা। সুতরাং জাতীয় সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়াতে হলে অনুরোধ জানাতে হয় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের কাছে, ধনী জমিদারদের কাছে, অন্যান্য নানা উচ্চবিত্তদের কাছে। কিন্তু এখানে হয়তো শ্রেণী-চেতনার ছায়া পড়েছে, পণ্ডিত নেহরুর মন সরেনি; নয়তো অভিজাত পুরুষ জবাহরলাল, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র গঠনের অন্তর্লীন সম্বন্ধে,

> এবং চীনদেশে, সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি-হেতু যে ক্লিন্নতা-মলিনতা দেখেছেন, ভারতবর্ষে উপস্থিত মুহূর্তে তার প্রতিচ্ছায়া দেখতে চান নি, সুতরাং বিরত হয়েছেন। (সমাজসংস্থা আশা নিরাশা / পৃঃ ৫৯)

দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাঠকের কাছে পীড়াদায়ক জানি, তবু এর ব্যবহার করতে হল নেহরু অর্থনীতিকে সামান্য কথায় বুঝে নেওয়ার জন্য। এই চমৎকার বিশ্লেষণের পর অশোক মিত্র সিদ্ধান্ত করেছেন,

> বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ সঞ্চয়ের হার স্থাণু থেকেছে এবং মধ্যবর্তী শূন্যতা পূরণ করার জন্য বিদেশি কুমিরকে খাল কেটে নিমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। পরিণামে সম্প্রতি আমাদের আত্মচলৎশক্তি প্রায় বিলুপ্ত।

এসব কথা লিখেছিলেন অশোক মিত্র ১৯৬৪-তে। খুব তরতাজা প্রামাণ্য বিশ্লেষণ। নেহরু অর্থনীতির এবংবিধ দ্বিধাগ্রস্ততার ছায়া দেখতে পাই বাঙালির সংস্কৃতির চরিত্রেও। ভোগ্যপণ্যের প্রতি স্পৃহা যেমন বাড়তে থাকে মানুষের ক্রমেই, অন্যদিকে বুভুক্ষু জনতা ও নিরাশ্রয় মানুষের আর্তনাদ বাঙালি সংস্কৃতিকে স্পর্শ করে। এর পিছনেও ছিল অবশ্যই এক রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব। প্রগতিবাদী রাজনৈতিক চিন্তা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে, সাহিত্যচিন্তা-চেতনায় কখনই অনুপস্থিত ছিল না। বরং কোন-কোনও পর্বে একটু বেশি মাত্রাতেই যেন ক্রিয়াশীল।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আবর্তে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, যার অপর নাম মার্কসবাদী আন্দোলন, হঠাৎই দ্রুতগতি পেয়েছিল তেভাগাকে কেন্দ্র করে চল্লিশের দশকে, আর ছিল ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের পর্বও। আর স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই গড়ে উঠেছিল কাকদ্বীপ-তেলেঙ্গানার জঙ্গি আন্দোলন। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে এসবেরই অনুসরণে গতিময় হয়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কিষাণসভা গঠন, অফিসে-আদালতে-কলে-কারখানায় শ্রমজীবী মানুষের সমষ্টিবদ্ধ চেতনা উন্মেষের নিরন্তর প্রচেষ্টা। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠার নিদর্শনগুলিও ছিল স্পষ্ট। ওই ওই শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে, ছাঁটাই-লে-অফ চলবে না, মজুতদার আর মহাজনদের শায়েস্তা করতে হবে, ট্রামভাড়াবৃদ্ধি রুখতে হবে—এসব থেকে শুরু করে ভিয়েতনামে মার্কিনী দস্যুতা কিংবা কঙ্গো-কাতাঙ্গায় সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার রুখে দাঁড়াও অথবা কিউবায় কাস্ত্রো-চে গুয়েভারা

জিন্দাবাদ—ইত্যাদি ছিল পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বাঙালির রাজনৈতিক স্লোগান।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির আসরে যেমন, শিল্পসাহিত্য-নন্দন-তত্ত্বেও বাঙালির কালচার তখন একান্তই প্রগতিশীল; শিল্পী-সাহিত্যিকগোষ্ঠীর এক বড় অংশই ছিলেন বামপন্থী কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টভাবাপন্ন। উল্টোদিকে দক্ষিণপন্থী শিবিরও যে ছিল না, তা নয়। যথেষ্ট প্রভাবশালী ও জনচিত্ত আলোড়নকারী ছিল সে-ক্যাম্পও, তবে প্রগতিবাদী সাহিত্যান্দোলন সে-আমলে ছিল রীতিমত এক ঘটনা। ছাত্র-যুব-শিক্ষিত মধ্যবিত্তমহলে তার প্রভাব ছিল অপরিমেয়। চল্লিশের গোড়ায় ও মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের ছবিটা ছিল একটু অন্যরকম। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বাম-ডান নির্বিশেষে তখন এক যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। বাস্তবিকপক্ষে শিল্প-সাহিত্য-গান-ছবি-নাটকে এক মস্ত জোয়ার ছিল তখন। হিটলার-মুসোলিনির বর্বরতার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিকেরা এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছেন সে-সময় শুধু সভাসমিতি-মিছিল করে নয়, নতুন আঙ্গিকে বলিষ্ঠ ছবি-গান-গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্ত বাঙালি কালচার এক নতুন স্বাদ পেয়েছিল, জীবনযাপনে নতুন মাত্রা যোজিত হয়েছিল। আর চল্লিশের এই রেশ ছিল বাংলা সংস্কৃতিতে অনেকদিন, অন্তত ষাট দশকের শুরু পর্যন্ত তো বটেই।

চীন-ভারতের গোলমাল, ক্রুশ্চভের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, পার্টি-ভাগ বামপন্থী সংস্কৃতির মসৃণ গতিকে যেন খানিকটা রুদ্ধ করে দিল। জাতীয়তাবাদের তীব্র জোয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের স্টিরিও-টাইপগুলিকে সংশয়কাতর করে তুলল। তবে মোটের উপরে সংকটাপন্ন হলেও বামপন্থী প্রগতিবাদের জয়যাত্রা কখনই রুদ্ধ হয়ে যায় নি তখনও। ষাটের শেষে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনপর্বে বরং মধ্যবিত্ত বামপন্থী সংস্কৃতির জগতে আবার নতুন করে এক উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল।

বাঙালির প্রগতিশীল সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী সমাজগঠনের স্বপ্ন ছাড়াও ত্যাগ, তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শোনা যেত মুহুর্মুহু। বাগাড়ম্বর যে ছিল না, তা বলা যাবে না, তবে কমিউনিস্ট কর্মী মহলে ত্যাগের, ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধনের দৃষ্টান্ত ছিল কিছু কিছু। ছাত্র-যুব আন্দোলনে গতি ছিল, বৈপ্লবিক কাল্পনিকতার প্রশ্রয় ছিল। উদ্দাম হয়ে উঠত প্রায়শই ছাত্র আন্দোলন, বলিষ্ঠ স্বপ্ন দেখতে উৎসাহী ছিল তারা। খাদ্য আন্দোলন,

ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে লাগাতার বহুদিনব্যাপী ছাত্র-অভিযানগুলিতে আবেগ ছিল, প্রাণবন্ত বিশ্বাস আর মুষ্টিবদ্ধতার অঙ্গীকার টের পাওয়া যেত সেসব আন্দোলনে। বয়সোচিত রোমান্টিক উন্মাদনায় হয়তো অনেকেই ছিল বিভ্রস্ত কিন্তু তবু প্রাণের আবেগ আর আদর্শকাতরতা ছিল এই প্রগতিশীলতার শক্তির উৎস।

এই উন্মাদনার এক ভরা জোয়ার টের পাওয়া গেল ষাট দশকের শেষে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঘটনাগুলিতে। এর বছরচায়েক আগেই নেহরু প্রয়াত, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত, রুশ-চীন বিতর্কের পরিণামে ভেঙেছে কমিউনিস্ট দলও। দাপট বিস্তৃত না হলেও ইন্দিরা উত্থানের পর্ব শুরু হয়ে গেছে ধীরে ধীরে, আর অন্যদিকে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের ভরাডুবি, বামপন্থী দলগুলির জোটবদ্ধতায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভ্যুদয় ঘটে গেছে ১৯৬৭-তে।

দেশবিভাগের পর বাঙালিজীবনে আরেক অস্থিরতার পর্ব এই ৬৮-৬৯ সাল থেকে শুরু হল। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সহ সবকটি বামপন্থী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করার পর স্লোগান তুলল যে সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতা কাজে লাগানো হবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে। কিন্তু গোড়াতেই চোট খেল সে মহৎ বাসনা। নকশালবাড়ি আন্দোলনের মুষল এসে পড়ল সরাসরি তাদের বিরুদ্ধেই। শুরু হল প্রায় আট-বছরব্যাপী এক মহাপ্রলয়পর্ব।

অতিবিপ্লবী ছাত্রযুবার কাছে এ-আন্দোলন যেন এতোদিনকার লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নপর্ব। মেকী বামপন্থার বিরুদ্ধে তাঁদের জেহাদ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট দলগুলি যে প্রগতির মুখোশধারী তারা যে বিপ্লববিমুখ, মধ্যবিত্ততার গ্লানিতে যে আচ্ছন্ন তারা—এসব কথা তোলা হল প্রকাশ্যে, আন্দোলন ধাবিত হল তাদের বিরুদ্ধেই। কৃষকমুক্তি, শ্রমিকমুক্তির স্বপ্নের সঙ্গে মেকী বামপন্থার বিরুদ্ধে ঘোষিত হল রক্তাক্ত যুদ্ধ।

শিক্ষিত বাঙালির সংস্কারেও সোজাসুজি আঘাত করা হল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের শিকার হলেন 'মূর্তিভাঙার রাজনীতি'র দাপটে। গোটা উনিশশতকের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে বরবাদ করে দেওয়ার ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিপন্ন বোধ করল বাঙালি সমাজ তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে এই অতিবিপ্লবী আস্ফালন দেখে। শুধু তাই নয়, ধ্বংস করার ডাক দেওয়া হল সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাও। বুর্জোয়া শিক্ষা ধ্বংস না হলে বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে না। তৈরি হবে না

বৈপ্লবিক নতুন শিক্ষাধারা—এসব স্লোগান শোনা গেল আন্দোলনপ্লাবিত অঞ্চলগুলিতে। স্কুল-কলেজে শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত হল গ্রন্থাগার আর ল্যাবরেটারিগুলি। তাণ্ডব শুরু হল পরীক্ষাব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ার জন্য। বহুদিন ধরে সযত্নে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক শিক্ষার ধাঁচের বিরুদ্ধে দ্রোহ ছিল কিন্তু অনেকেরই, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-ধ্বংসের এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের সমর্থন পায়নি। সমর্থন পায়নি স্বাভাবিক কারণেই। স্কুলকলেজগুলিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিলেই তো হল না, পরিবর্তে কোন্ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে—এই সরল প্রশ্নটির কোনও উত্তর ছিল না চোখের সামনে। বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনরকম ভরসাও মানুষ পায় নি। স্বভাবতই নেতিবাচক আন্দোলনের ঐতিহাসিক যে-পরিণাম এ-আন্দোলনের কপালেও তা জুটল।

প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে কারুর ঐতিহাসিক স্বদেশী পর্বের কথা—১৯০৫-এর আন্দোলনের কথা। বিদেশী বর্জনের সংকল্পে তখনো পোড়ান হয়েছিল গ্রামগঞ্জের হাটে-বাজারে বিলেতি কাপড়সহ অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার। কিন্তু পরিবর্তে সাধারণ মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গড়ে তোলা যায় নি স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের কল-কারখানা। স্বভাবতই সফল হয় নি সে-আন্দোলনও। মাঝখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক সুযোগ বুঝে তীব্র এক ফাটল ধরিয়ে দিল হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে। তবে মনে রাখতে হবে যে, তবু ছিল এক স্বদেশী প্রতিজ্ঞা ওই আন্দোলনের সময়। ছিল রবীন্দ্রনাথ ও ডন সোসাইটির কর্ণধার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়দের আত্মশক্তি উদ্‌বোধনের ব্রত। স্বদেশী কাপড়ের মিল গড়ে তোলার বেশ কিছু আয়োজনও ঘটেছিল। কিন্তু জাতিকে গড়ে তোলার, গঠনাত্মক অভিযানের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার পক্ষে সে-আয়োজন ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর তার ফলেই স্বদেশী আন্দোলন এক তীব্র জোয়ার তুলেছিল বটে, তবে সে-জোয়ারে পলি সংগৃহীত হয়েছিল খুবই কম। তবু স্বদেশী আন্দোলন বাঙালির ইতিহাসে বৈপ্লবিক এক ঘটনা, তার কারণ ওই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি নিজের দিকে তাকাতে শিখেছিল, আত্ম-বোধনের ধারা চিনবার সুযোগ পেয়েছিল। সেটুকুই আমাদের এই আন্দোলনের কাছ থেকে পাওয়া সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

পক্ষান্তরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সবটাই যেন নেতির সাধনা। সমাজ-বিপ্লব কোন্ বিকল্পের সন্ধান দেবে তার কোনও নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত ছিল না

মানুষের সামনে। স্বভাবতই এই ভাঙার খেলা বেশিদূর এগোতে পারল না। আন্দোলনের হাওয়া নিস্তেজ হয়ে এল মধ্য সত্তরেই, আর অন্যান্য আরও কিছু রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে সম্রাটপ্রতিম ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার অভিলাষে পঁচাত্তর সালে ঘোষিত হল শ্রীমতী গান্ধির জরুরি অবস্থা। ঘাড়ে চেপে বসল ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক অপশাসনের আরেক প্রমত্ততা।

পরপর এইসব ঘটনার ধাক্কায় বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনেও এক বড় রকমের পরিবর্তন যেন অবধারিত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে আশির দশকে বামপন্থী দলগুলি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দৃঢ়মূল করে ফেলেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখার তাগিদে বামপন্থার কার্যক্রমেও দেখা দিল নানান আপোসধর্মী সংস্কার, রাস্তা বদলের দৃষ্টান্ত। ভোটের রাজনীতি, বহুজাতিক বাণিজ্যসংস্থা আর দেশীয় পুঁজিবাদের সঙ্গে ক্রমাগত বোঝাপড়ার তাগিদ, দৈনন্দিন প্রশাসনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রাণান্তকারী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতাই হয়ে উঠল বামপন্থীদের গোলকধাঁধার জগৎ। এক অবিমৃষ্যকারী রাষ্ট্ররতি আর ক্ষমতান্ধতা বামপন্থার সংজ্ঞার্থ হয়ে উঠল।

ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের অসাড়তা এবং অন্যদিকে পণ্যরতি আর রাষ্ট্ররতির ঘনান্ধকার পরিবেশে বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নের চেহারাও গেল পাল্টে। আদর্শবাদের রঙীন স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে আমরা হয়ে উঠলাম কট্টর বাস্তববাদী, ইংরেজিতে যাকে বলে প্র্যাগমেটিক। উপযোগবাদ যেন ঘুরে এল আবার সকল সামাজিক দর্শন হিসেবে। কোন্ পথে গেলে কতটুকু লাভ—ব্যক্তিগত স্বার্থের এই হিসেবনিকেশ হয়ে উঠল আমাদের ধ্যানজ্ঞান। সমাজতন্ত্র, দারিদ্রের মুক্তি, সাম্যের গান আর মৈত্রীর দর্শন ইমিটেশন গয়নার মত যেন অঙ্গে শোভা পেল। বনেদী সম্ভ্রান্তরা সেটুকু ভানও আর রাখতে চাইল না। স্বার্থ, হিসেবী বুদ্ধি, বাণিজ্যিক কৌশল রপ্ত করতে পারলেই যেন সবল সার্থক মানুষ। ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা বলতে এখন ওইটুকুই বোঝান হয়। গত কয়েক বছরে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আদর্শগত সংকট, অস্তিত্বের সংকট এবং অবশেষে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিসহ সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার আকস্মিক পতন যেন আরও দৃঢ়মূল করে দিল ওই বিশ্বাস যে অনাগত ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য কোনও স্বপ্নময় আদর্শের সন্ধান নিতান্তই মূর্খতার পরিচয়। ভালভাবে বাঁচার জন্য চাই ভোগ্যপণ্যের তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে লড়াইয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা যেকোন মূল্যের বিনিময়ে। একথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ও জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রযোজ্য বাম-ডান নির্বিশেষে সব মানুষের

ক্ষেত্রে। আজকের সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার তাই ভিন্ন অর্থ, সে-সংস্কৃতির লক্ষ্য মুক্তি অর্জন নয়, নয় ব্যক্তিত্বের অপারবিস্তার। এই সংস্কৃতির লক্ষ্য পণ্য-সামগ্রীর ক্রীতদাস হয়ে ওঠার জন্য নিজেকেই প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য করে তোলা।

সাম্প্রতিককালের শিক্ষার দর্শনে এই আত্মসর্বস্বতার ছবিটি স্পষ্ট। আধুনিক দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারে অনধিক দুই বা এক সন্তানের পিতামাতার কঠিন দৃষ্টি সন্তানের মানুষ হয়ে ওঠার প্রতি। প্রতি মুহূর্তের নজরদারির কারণে অতি সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় বেড়ে ওঠে এখনকার ছেলেমেয়েরা। কোনও সুখের শৈশব তাদের নেই। প্রকৃতির আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত এরা। লড়াই করতে শেখে না তারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে। মাপাজোকা গণ্ডির মধ্যে প্রতিনিয়ত শাসনের মধ্যে থেকে এদের ব্যক্তিত্বের খণ্ডিত বিকাশ ঘটে। শুধু দমন-পীড়ন নয়, নিয়ম-শৃঙ্খলার কড়া শাসনে তাকে শেখানো হয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কীভাবে গড়ে তুলতে হয় আকাশচুম্বী উচ্চাশা, কেরিয়ার তৈরির স্বপ্ন। আত্মগত স্বার্থ, মোহ, উচ্চাশা আর বিকারগ্রস্ত প্রতিযোগিতার আবর্তে শিশু-কিশোরেরা বেড়ে ওঠে, তাদের শেখানো হয় না সামাজিকতার আদর্শ, পরার্থপরতার মহৎ ইচ্ছার কথা। আমাদের আজকালকার গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থার বনিয়াদটাই তৈরি হয়ে গেছে এই আত্মস্বার্থের মূল্যবোধের ভিত্তিতে। ফলে শিক্ষা একপ্রকার মূলধনবিশেষ, সে-মূলধনের জোগান বাড়াতে পারলে সমাজকাঠামোর উঁচু থেকে আরও উঁচু স্তরে গণজাগরণ সহজ হয়ে উঠবে, উল্লম্বী সচলতার ওই একমাত্র উপায়। চোখ কান বুজে নিজের কেরিয়ারটি তৈরি করে ফেলা। একথা ভাবলে ভুল হবে যে গত পঁচিশ তিরিশ বছরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় এই আত্মসর্বস্ব ভোগবাদী শিক্ষার অভীপ্সা তৈরি হয়েছে। আদৌ তা নয়। এই ধারার সূত্রপাত ঘটেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিযোগিতামুখী অর্থসর্বস্বতার ধারা উনিশ শতক থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে ওই ধারার একটা অন্য মুখ সতত সঞ্চরমান ছিল। জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ অনেক ক্ষেত্রে ওই শিক্ষার ধারাকে কিছুটা মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনযাপনে ওই জাতীয়তাবাদী ধারা খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে অন্তত আড়াই দশক ছাত্রমহলকে উজ্জীবিত করেছে জাতীয়তাবাদ ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা—এক অদম্য আদর্শের স্বপ্ন।

সত্তর-দশকের শেষভাগ থেকে সেই স্বপ্ন ক্রমশ অপসৃয়মান। পিছনে কেবল রাজনৈতিক কারণই নয়, ভোগবাদী পণ্যসর্বস্ব বুর্জোয়া অর্থনীতির তীব্র আক্রমণই মূল কারণ। কিন্তু আশ্চর্য, গড়ে উঠছে না কোনও প্রতিবাদী সংস্কৃতির ধারা, কোনও প্রতিবাদমুখর রাজনীতি। বরং অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি একান্ত ভোগাসক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে নির্মমভাবে উপযোগবাদী সংস্কৃতির সমাজ।

বাঙালিসমাজ বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করছে, একথা বলতে আমরা খুব পছন্দ করি। এক অহমিকাবোধও আছে ভিতরে ভিতরে। কিন্তু সত্যিই কি সে-উত্তরাধিকার আছে আমাদের? রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আন্দোলন কি কখনই শিক্ষিত বাঙালির সক্রিয় সমর্থন পেয়েছে? একটু খতিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যে-ধরনের সাংস্কৃতিক শিক্ষার বীজ বপন করে রবীন্দ্রনাথ এই সমাজকে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, এক মৈত্রীর শিক্ষা বিকিরণের চেষ্টা করেছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ তাকে মদত দেয়নি। উল্টে বরং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টিকে নিজেদের আশ্রয়স্থল করে গড়ে তোলার জন্য ভদ্রলোকসমাজ ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ওপর এবং শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ও তার নিজের চরিত্র ক্রমাগত হারিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিদ্যালয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এবং পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কথা অবগত হলে, এটুকু বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না যে শিক্ষার রাবীন্দ্রিক আদর্শ বাঙালি মধ্যবিত্ত গ্রহণ করেনি। তাঁর আন্দোলনে কোনও ভাবেই সাড়া দেয়নি।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, রবীন্দ্রসাহিত্য ও শিল্পের উত্তরাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও আমাদের সংগ্রাম খুবই সংকীর্ণ ও সীমিত। বাঙালির ভাষা, শিল্পবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার যে ভিত তৈরি করে দেন রবীন্দ্রনাথ, তার ব্যবহার করতে পারেন বা পারছেন কতজন বাঙালি? কোথায় সেই নিজেকে গঠন করবার, নিজেকে চিনবার জিজ্ঞাসা? যে অন্তর্জিজ্ঞাসা থাকলে সমাজ সবল হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির ইতিহাস বিস্তৃত হয়—সে-অন্তর্জিজ্ঞাসা আমাদের নেই। আমরা অনুকরণ করতে আর পল্লবগ্রাহিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছি।

উচ্চশিক্ষিত বাঙালি-সমাজের গরিষ্ঠ অংশ আজ নিজের ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এঁদের কাছে বাংলা উচ্চশিক্ষার বাহন হবার যোগ্য ভাষা

নয়, এ-ভাষার চর্চা নিছক বিলাসের জন্য, এর কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। শিক্ষিতজনের এই অভিমান পত্রপত্রিকার প্রবন্ধে-সেমিনারে-সিম্পোজিয়ামে হয়তো ধরা পড়ে না, কিন্তু প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় একথা মর্মান্তিকভাবে সত্য। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষা শুরু করার ক্রমাগ্রসরমান তাগিদে এই সত্যই ধরা পড়ে। ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা অজস্র হয়েছে, এমন কি 'পরিচয়' পত্রিকার পাতাতেও। অতএব বিস্তারের আর কোনও প্রয়োজন নেই।

এ সবকিছুর সূত্রে যে-কথাটি আমরা বলতে চাইছি, তা হল এই যে বাঙালি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি এখন প্রায় সম্পূর্ণতই ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনভিত্তিক, ভোগবিলাসের স্বপ্নে আচ্ছন্ন, পণ্যরতিতে আক্রান্ত। ভয়াবহভাবে 'সাংস্কৃতিক' মূল্যবোধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক এই ডেকাডেন্সের সপক্ষে কোনদিক থেকেই ওকালতি সম্ভব নয়। এই অবক্ষয়ের ছবিটি স্পষ্ট বাংলা গানে, চলচ্চিত্র-নাটকে এবং সাহিত্যে। ক্রীড়াজগতেও টাকা-পয়সার লেনদেন, কোন্দল, ভোগী রাজনীতির রমরমা। উধাও হয়েছে মাঝখান থেকে খেলোয়াড়োচিত মনোভাব, তার উদারতা। সব মহলেই এখন প্রফেশনালিজমের উগ্র দাপট।

পেশাদারি মনোভাব যত বাড়ে বিজ্ঞাপন-ব্যবসাও তত জমে ওঠে। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে বিনয় ঘোষ যথার্থই লিখেছিলেন সেই 'প্রবন্ধ' 'ভুবনমোহন বিজ্ঞাপন বিমোহিত মন'। এ-যুগের সংস্কৃতিকে বোধহয় এক কথায় বলা যায় বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সংস্কৃতি। শিল্প-সাহিত্য-ক্রীড়াজগতে এখন পুরস্কারেরও ছড়াছড়ি, স্পনসারশিপের দাপট ক্রমবর্ধমান। আর ওই পৃষ্ঠ-পোষকেরা সকলেই কোন না কোন বাণিজ্যিক সংস্থা। করছাড়ের রাজনীতি ছাড়াও এও এক নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার রাস্তা কোম্পানির সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা ঘোষণা করে। মূলধন বিনিয়োগের বিচিত্র উপায়ের এটিও একটি। বলা বাহুল্য, এসবই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সমাজে সাংস্কৃতিক লক্ষণ। গত পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে সেইসব লক্ষণগুলিই ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। সত্তর দশক পর্যন্ত ছিল এর বিরুদ্ধে এক সমান্তরাল প্রতিবাদমুখর সংস্কৃতির রেশ, কিন্তু আজ সে-রেশটুকুও বেমালুম লুপ্ত। লোপ পেতে বসেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক, স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা-ভক্তির ধারণাগুলির অর্থও উপযোগিতার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ত্যাগ-তিতিক্ষা-আদর্শে আমাদের ভরসা নেই এখন আর, আমাদের আস্থা প্রতি-

ষ্ঠানের ক্ষমতায় আর ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ক্ষমতা-উদ্ধত গোষ্ঠীতন্ত্রে। আর জীবনে প্রতিষ্ঠান যখন হয়ে ওঠে পরম ভরসাস্থল, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের নিগড় তখন হয়ে ওঠে যুক্তিশীলতার শেষ কথা। মুক্ত হাওয়ার উদার সমাজে আমলাতন্ত্র চোখের বিষ, কিন্তু সেই আমলাতন্ত্রই আবার বহুল প্রচলিত গণতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত রক্ষাকবচ। এ এক অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। আমরা আজ সকলেই তার শিকার। এই স্ববিরোধের ইতিহাস আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সমাজ-সংগঠনে অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-গুলিতে। বহুদিন ধরে আমাদের সংস্কৃতিমনস্ক সমাজে প্রগতিবাদীদের মনে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার এক গুমোর ছিল, ছিল স্বনির্ভরতার আবেগে ভরা অভিমানী এক প্রতিজ্ঞা। এখন সে-প্রতিজ্ঞার কথা তেমন আর শোনা যায় না, প্রতিষ্ঠানতন্ত্রই আপাতত বাস্তববাদীদের আশা-ভরসার উৎস।

এসব হাহাকারের বিবরণ পড়ে কারুর মনে হতে পারে যে এ এক সেই অক্ষম বৃত্তান্তকারের সাক্ষ্য যে কেবলই প্রত্যক্ষ করে গত দু-তিন দশকের বা তার চাইতে বেশি কিছু সময়ের ধসে-যাওয়া স্বপ্নের ছবিগুলি, টের পায় না নতুন প্রজন্মের নতুন সংস্কৃতি, নতুন জীবনযাপনের ভঙ্গি। বলতে দ্বিধা নেই, স্বার্থান্ধতা-অকর্মণ্যতা-বাগাড়ম্বর-ভ্রষ্টতার ইতিহাস ছিল অতীতেও, এমন কি 'স্বর্ণালোকিত' উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসেও, কিন্তু বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে আত্মসর্বস্ব, প্রতিষ্ঠানসর্বস্ব, সমাজবোধহীন, বিকারগ্রস্ত সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠতে দেখতে পাচ্ছি না কোনও প্রতিরোধের সংকল্প, জীবনের প্রতি বিকল্প কোনও দায়বদ্ধতার আয়োজন। বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এইটিই বোধহয় এক নতুন ঘটনা।

সাম্প্রতিক ছোট গল্প : কেন জন্ম কেন নির্যাতন

সুস্মিতা চক্রবর্তী

ছোট গল্প বললে আজ আমরা সকলেই মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট একটি সাহিত্য-রূপবন্ধ বুঝে থাকি। বাংলাভাষায় সবচেয়ে সুচিন্তিত এবং যথার্থ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সুপরিচিত 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে। সেই সংজ্ঞাটি উদ্ধার করে শুরু করা যাক, কারণ আলোচনার সময়ে কখনো সংজ্ঞাটি কাজে লেগে যেতেও পারে। —"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে এক সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"

আমাদের আলোচনার প্রধান সম্পাত-বিন্দু এই 'সাম্প্রতিক' শব্দটি। একেবারে আজ পর্যন্তই সাম্প্রতিকের শেষ সীমা। কিন্তু কবে থেকে? নানা দিক থেকে বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে ধরা যেতে পারে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না একটি সংশয়হীন সর্বগ্রাহ্য অভিমতে পৌঁছনো। কাজেই আমরা এখানে কিছুটা ব্যক্তিগত বিচারের যুক্তিপথ অনুসরণ করে 'সাম্প্রতিক' বলতে বিগত দুই দশক বা মোটামুটিভাবে কুড়ি বছর ধরছি।

সাধারণত এক-একটি প্রজন্মের ব্যবধান ধরা হয় পঁচিশ বছরে। আজকাল প্রযুক্তি বিজ্ঞান সমুন্নত। অল্প সময়ের ব্যবধানে বদলে যাচ্ছে জীবনযাত্রার ধরন। সংবাদ-মাধ্যমগুলি দ্রুততম গতিতে বিশ্বকে প্রতি মুহূর্তে এনে দিচ্ছে জানার পরিধির মধ্যে। সে কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের মানসিকতা পাল্টে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত। ফলে, বিগত দুই দশক নিশ্চিতভাবেই একটি প্রজন্মের ব্যাপ্তি ধারণ করে।

অত্যন্ত বাস্তব একটি সময় বিভাজক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনও

পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে এখন থেকে দুই দশক আগে। নকশালবাড়ির প্রথম কৃষক-অভ্যুত্থানের ঘটনাটি ১৯৬৭-তে হলেও তার প্রকৃত অভিঘাত-চিহ্ন মুদ্রিত হলো ১৯৬৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী গোষ্ঠীর ঘোষিত আত্মপ্রকাশে। তারপর চলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই আন্দোলন দমনের চেষ্টা। ১৯৭০-৭২-এর সময়টিতে এই আন্দোলন এবং তার প্রতিরোধী প্রয়াস—দুই-ই বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

আজ পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি বলে না-ও মনে হতে পারে। ১৯৭৬-৭৭-এর পর যাদের জন্ম তারা খুব ভালো করে জানেও না এই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য। কিন্তু বাংলার সামাজিক পটভূমিতে এই আন্দোলনের প্রভাব যে খুব সামান্য ছিল না—তা বোঝা যায় বিগত দুই দশকের পশ্চিম বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কোনো কোনো দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। আরো বেশি করে তা বোঝা যায় বাংলা কথাসাহিত্যে তার প্রতিফলিত রূপের মধ্যে।

বাংলার বৃহত্তম সাহিত্য-প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের লেখক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন্-এর লেখক পর্যন্ত তাঁদের গল্পে কিংবা উপন্যাসে এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিককে উপস্থাপিত করেছেন—পূর্ণত না হলেও অংশত। কে কতটা পেরেছেন বা কে কোন্ চোখে দেখেছেন সে বিতর্ক সরিয়ে রেখে—এক নিঃশ্বাসে বিভিন্ন মত ও পথের লেখকের নাম করা যায়। যেমন—মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ বসু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম রায়, সৌরি ঘটক, শৈবাল মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর বসু, জয়ন্ত জোয়ারদার এবং আরো অনেকেই।

এমন ঘটনা সম্ভব হয়েছিল হয়তো একারণেই যে, সত্যিই এই রাজনৈতিক বিশ্বাসে আত্মনিবেদিত মানুষেরা—অধিকাংশই তরুণ—একটি আদর্শকে সামনে রেখে নিরাপদ জীবনের ঘেরাটোপ তুচ্ছ করেছিলেন। হাজারো অনভিজ্ঞতা, প্রস্তুতিহীনতা, স্ববিরোধ, বিভ্রান্তি সত্ত্বেও সেই স্বার্থ-সংস্পর্শশূন্য সততার আদর্শটি আমরা উপেক্ষা করতে পারিনি। আর সততার আদর্শ শিল্প-সাহিত্যকে চিরকালই টানে। মানব-মননের ও মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সারটুকুই সম্ভব করে শিল্প-সাহিত্যের সৃজনক্রিয়া। নকশালবাড়ি আন্দোলন সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্পের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে—তা আমরা পরে দেখব।

গল্পের বিষয়-বস্তুর কথাটা যখন এল তখন আরো একটি প্রশ্নের সমাধান করে নেওয়া যাক। ঠিক কোন জিনিসটিকে বলব গল্পের বিষয়? যদি আদি শিল্পতত্ত্বগুরু আরিস্টট্‌ল্-এর কথা মেনে বলি 'অনুকরণই শিল্প' এবং মানুষ ও তার ক্রিয়াকলাপ হল সেই অনুকরণের বিষয়, তাহলে সব গোল মিটে যায়। কিন্তু এই অভিধাটি এতই ব্যাপক যে তাতে সাম্প্রতিকের কোনো প্রচ্ছায় ঘনায় না।

বড় বড় সমালোচকেরা বলে গেছেন যে, প্রকৃত ছোটগল্পের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ই নেই। প্রতিনিধি মানতে পারি এইচ. ই. বেটস (H. E. Bates)-কে যিনি ঈষৎ লঘু চালে বলেছিলেন—তরুণীর প্রেম থেকে ঘোড়ার মৃত্যু—সবই হতে পারে ছোটগল্পের বিষয় (দ্য মডার্ন শর্ট স্টোরি)। কিন্তু এভাবে বললে যেন ছোটগল্পকে দেখি চিরপ্রবহমান এক কালচিহ্ন-হীন পটভূমিতে রেখে। এভাবে বললে 'বিষয়' বলতে কেবল একটি চিদ্‌সংসক্তি বর্জিত ঘটনা মাত্রকেই বোঝাই।

কিন্তু ছোটগল্পের যতগুলি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা আছে সেগুলির সর্বত্রই জোর পড়েছে 'ইমপ্রেশন' শব্দটিতে। কোথা থেকে আসবে এই ইম্প্রেশন? অবশ্যই লেখকের মন থেকে। সামাজিক অথবা বস্তুগত কোনো অবজেক্ট্ বা অবজেকটিভ্ বিষয়ের সঙ্গে লেখক মানসের ঐ দৃষ্টিকোণ ও ইম্প্রেশন্ যুক্ত হলে তবেই যথার্থভাবে গড়ে ওঠে একটি ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। নৈর্ব্যক্তিক 'সাবজেক্ট্' থেকে নিষ্কাশিত হয় শিল্পবিবেক-স্পন্দিত 'কনটেন্ট্'। তখন তার রূপায়ন অবজেকটিভিটি অতিক্রম করে হয়ে ওঠে সাবজেকটিভ। এই ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণটি-ই প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়ায় ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। বহু পরিচিত উদাহরণ ব্যবহারে বলা যায় শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পে পতিতার চরিত্র থাকলেও গল্পটির বিষয়বস্তু পতিতা—সমস্যা নয় আদৌ—বিষয়বস্তু হল 'প্রেম'। আবার রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে শ্রমজীবী মানুষ থাকলেও বিষয়টি ঐ একই—'প্রেম'। কাজেই সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের বিষয়-সন্ধানে আমাদের মূলত লক্ষ্য রাখতে হবে বিগত দুই দশকে শিল্পীর পরিবর্তিত জীবনদৃষ্টির দিকে। দেখতে হবে সেরকম কোনো পরিবর্তন আছে কি না—কাদের মধ্যে এসেছে সেই পরিবর্তন এবং তা কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে গল্প-নির্মাণে।

বাংলা ছোটগল্প চিরকালই মোটের ওপর সমাজমনস্ক। সামাজিক সংকট চিরকালই তার বিষয়। এতকাল প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যবিত্ত মানুষের সামাজিক

সমস্যাগুলি। কিছুটা ব্যতিক্রম হিসেবে কল্লোলপর্বের শৈলজানন্দ প্রমুখ কারো কারো শ্রমিক-জীবন ও সাঁওতাল ইত্যাদিদের নিয়ে লেখা গল্পের কথা স্মরণ করা যায়। মনে পড়ে মনীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালী'। তবে শৈলজানন্দ গল্পগুলিকে তেমন সার্থকতার স্তরে তুলতে পারেননি। যুবনাশ্বের (মনীশ ঘটকের) 'পটলডাঙার পাঁচালী' স্কেচধর্মী হয়েই থেকে গেছে। চল্লিশের দশকে সাম্যবাদ যখন লেখক-শিল্পীদের কাছে এক প্রদীপ্ত বিশ্বাস হয়ে উঠছিল তখন একাধিক লেখক কৃষক-শ্রমিকের দুর্দশা ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে গল্প লিখেছেন। অনেকের লেখাই তেমন জোরালো হতে পারেনি—খানিকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবে, খানিকটা সাম্যবাদী তত্ত্বের আরোপের প্রবণতায়। তবু একমুঠো সার্থক গল্পও বেছে নেওয়া যায় এই সময়ের ফসল থেকে। তারপর আড়াই দশক ধরে বাংলা ছোটগল্পের মূল স্রোতটি বিষয় হিসেবে অবলম্বন করেছে মধ্যবিত্তের সংসারকে। মাঝে মাঝে তারাশঙ্করের লাভপুরের মাটিতে তৈরি কলমটির সৃজনী ব্যাতিক্রম বাদ দিলে দ্বিতীয় উদাহরণ প্রায় নেই। দারিদ্র্যের কাহিনী লেখা হয়েছে অনেক কিন্তু সেই দারিদ্র্য-চিত্র মধ্যবিত্ত বাঙালির সংস্কার ও মূল্যবোধগুলির কাঠামোর মধ্যেই বিন্যস্ত। সেখানে মানুষগুলি সংস্কারে ও বিশ্বাসে নিম্নবর্গের নয়, তারা বিত্তহীন মধ্যশ্রেণী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের ছবি আঁকেন একভাবে, বিভূতিভূষণ আর একভাবে। কচিৎ একটি দুটি গল্প বাদ দিলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসামান্য গল্প-সম্ভারও একই কথা প্রমাণ করে। (কিছু ব্যতিক্রম থাকেই। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক)।

সাম্প্রতিক দুই দশকে দেখা যায় গল্পকারদের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে তাদের ওপর যারা প্রকৃত অর্থেই এই দেশের সর্বহারা মানুষ। হয়তো বা নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঝাঁকুনি এই দৃষ্টি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু সাহায্য করেছে; সেই সব মানুষ যারা একদিনের পর আর দ্বিতীয় দিনের খাদ্য-সংস্থানের সঞ্চয়ে অক্ষম; যাদের বাসস্থান এমন যা কোনোক্রমেই মধ্যবিত্তের মাপকাঠিতে 'বাড়ি' নয়—তা ফুটপাথ এবং তারই হেরফের। যাদের কোনোরকম একটি দেয়াল-ঘেরা সংস্থান আছে তারা তাদেরই মধ্যে সম্পন্ন। এই ধরনের নানা বৈচিত্র্য—দিনমজুর, উপেক্ষিত উপজাতি, মহাজনের কাছে বিকিয়ে যাওয়া ছোট চাষী, দেহজীবিনী, ভিক্ষুক, রক্ত বিক্রেতা, কাগজ কুড়োনো লোক, আধা ও সিকি মজুরিতে শ্রম দেওয়া বালক-বালিকা—এই সব চরিত্ররা আজ বিপুল-সংখ্যক বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম বিষয়।

সত্যিকারের মানুষ থেকে গল্পের চরিত্র হয়ে উঠতে গেলে মধ্যবর্তী বিক্রিয়ার স্তরটিতে লেখকের যে ইম্প্রেশনটির কথা আগে বলেছি তা এই ধরনের মানুষের গল্পে খুব স্পষ্ট। এদের সাধারণ ভাবে ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে ততটা দেখা হয় না—যতটা দেখা হয় সামাজিক শ্রেণী হিসেবে। এখানেই পূর্ববর্তী সময়ের গল্প থেকে এই সময়ের এজাতীয় গল্পের মূল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ পর্যন্ত লেখকেরা যখন গরিব মানুষকে নিয়ে গল্প লিখেছেন তখন তারা ব্যক্তি-চরিত্র রূপে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চমৎকার একটি উদাহরণ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্পের মকবুল। তার অভাবের রেখাচিত্রটি সুলিখিত এবং তা গল্পটির একটি মূল উপাদানও। কিন্তু মকবুলের ঐ পালঙ্ক-আকাঙ্ক্ষাটি তাকে করে তুলেছে আলাদা একটা মানুষ। অনবদ্য এই গল্পটির বিষয় কিন্তু শেষপর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য আর থাকতে পারেনি। হয়ে গেছে অন্য একটি মনোকূট (obsession) এবং তা থেকে মুক্তির কাহিনী। তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' আর 'বেদেনী' এই একই ব্যক্তিত্বের আরোপে স্বতন্ত্র। আসলে সাম্প্রতিক-পূর্ব কালের শিল্পীরা—অন্তত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত—মানুষকে ব্যক্তিরূপে দেখার শিক্ষাই পেয়েছিলেন এবং দারিদ্র্য-জীর্ণ মানুষেরও ব্যক্তিত্ব-সংকটের রূপটাই তাঁদের চোখে পড়ত বেশি। মানুষকে শ্রেণী হিসেবে দেখার শিক্ষাটা এসেছে সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা থেকে। চল্লিশের দশকের লেখকেরা ধারণাটি জেনেছিলেন যতটা, ততটা মিশিয়ে নিতে পারেননি শিল্প-সৃজনের প্রক্রিয়ায়। যুগসঞ্চিত ইম্প্রেশন্ একটি ধাক্কাতেই জায়গা ছাড়ে না।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে ছিল চার দশক ধরে সমাজতন্ত্রবাদী তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়। এই সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়নটি মানুষের শ্রেণী-পরিচয় ও শ্রেণী-সংঘাতের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিল সবচেয়ে বেশি। ফলে ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের শুরুতে যে তরুণ গল্পকারেরা লিখতে আরম্ভ করলেন তাঁদের শৈল্পিক লক্ষ্যই হয়ে উঠল সর্বহারা শ্রেণী এবং শোষক শ্রেণীকে আলাদা করে চিহ্নিত করা। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্পে বড় হয়ে উঠলো শ্রেণী-মানুষের অধিষ্ঠান। মনে হয় এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন। মানুষের ব্যক্তিত্বের চেয়ে লেখায় প্রাধান্য পাচ্ছে সামাজিক সিস্টেম—তার নিষ্ঠুরতা এবং অন্যায্যতা সহ।

এর ফলে মধ্যবিত্ত পাঠক, বিশেষ সামাজিক চেতনা ও শিক্ষার অধিকারী

না হলে, সেসব গল্পের যথার্থ রস গ্রহণ করতে পারেন না অনেক সময়ে। ফলত, মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে—যাঁদের সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছে মূলত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিভূতিভূষণ পাঠ করে—সহসা এই আপাত-নৈর্ব্যক্তিক, সিসটেম-রূপায়ণ—জনিত শিল্পকর্ম কিছু অনাকর্ষক ও ক্লান্তিকর লাগে। মনে হয়—'সারফেস রিয়েলিটিং; মনে হয়—চেতনার গভীরে ডুব দিচ্ছেন না লেখক। (সাক্ষাৎকার, বিমল কর, মুক্তাক্ষর, ১ম বর্ষ ৩য় সংকলন, ১৯৯২) বস্তুত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের রূপও যেমন বদলায়, তেমনই কিছু কিছু বদলে নিতে হয় শিল্প সমালোচনার ধারণাও।

বাংলা ছোটগল্পে মানুষকে দেখবার এই যে দু ধরনের ভঙ্গির স্বীকৃতি দিচ্ছি আমরা তার মধ্যবর্তী একটি পর্যায়ও ছিল। স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই—যখন সমাজ দেহে ফুটে উঠেছে স্বার্থান্ধ রাজনীতি আর বিপর্যস্ত অর্থনীতির বিষচিহ্নগুলি ঠিক তখনই আমরা কিছু কিছু গল্পের সন্ধান পেতে লাগলাম যা আমাদের চকিত করতে লাগল স্বাতন্ত্র্যে।

পঞ্চাশের দশক জুড়ে গল্প লিখছিলেন সাম্যবাদের শিক্ষা নেওয়া শ্রেণী-সচেতন গল্পকারেরা। যেমন সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক এবং সৌরি ঘটক। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের গল্পেই এক ছক দেখা যাচ্ছিল। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা মানুষদের বাস্তব পরিবেশের বর্ণনা—বস্তি, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম (স্টেশনটি প্রায় সর্বত্রই শেয়ালদা, হাওড়া নয়, কারণ সম্ভবত এই—পূর্ব-বাংলার ট্রেন এই শেয়ালদাতেই উগরে দিত ঠিকানা ফেলে আসা উদ্বাস্তদের।), ফুটপাথ—তাঁরা সত্যদৃষ্টি নিয়ে বর্ণনা করতেন। মানুষগুলির সংগ্রাম দেখাতেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখাতেন তাদের মনুষ্যত্বের জয়। গল্প-গুলিতে দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি লেখকের মমতার দৃষ্টিভঙ্গিটি কিছুতেই মুছে ফেলা যেত না।

যে-লেখক নিজেকে প্রথম এই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন তিনি সম্ভবত সমরেশ বসু। 'আদাব' লিখে বিখ্যাত সমরেশ 'আদাব' জাতীয় একমাত্রিক গল্পে স্থিত রইলেন না। পেটের দায়ে বিচিত্র সব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষকে তাদের জীবনের নিষ্ঠুর, প্রায় বীভৎস, বিরূপ প্রতিবেশের মধ্যে রেখেই তাদের অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তি দেখালেন তিনি। মমতার দৃষ্টি মুছে গেল, জাগল জীবন বিস্ময়বোধ। পরিবেশের এক মেটে রঙের ওপর সমরেশ চাপিয়ে দিলেন বেঁচে থাকার হরেক রহস্যের তুলির টান। সুন্দরভাবে কথাটি ব্যক্ত করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—"অন্য বামপন্থী গল্প লেখকেরা কেউ

কেউ যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যর্থ মার্কসবাদী পর্যায়ের অনুবর্তন চর্চায় মগ্ন ছিলেন, অথবা মোদ্দা কথাটাকে গল্প ভেবে সংঘ নির্দেশ পালন করছিলেন, সমরেশ তখন তাঁর গল্পকার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্তির শ্রেণীরূপ ও ব্যক্তি-রূপের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার সন্ধানী হয়েছেন।" (ভূমিকা, সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা ১৯৮৬)।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বাংলা ছোটগল্পের একটি ধারা বদলে যাচ্ছিল—যদিও অল্প কয়েকজন লেখকের হাতেই। তবু আজকের বাংলা ছোটগল্পের ভিত্তি নির্মাণে তাঁদের প্রয়াস সম্পৃক্ত হয়ে আছে অনেকখানি। এই গল্পকারদের মধ্যে পরবর্তীকালেও যাঁরা বিস্মৃত হননি তাঁদের মধ্যে আছেন দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। রীতির দিক দিয়ে এই গল্পকারেরা হয়ত বা চমক দিয়েছিলেন বেশি তাই বারবার শৈলীগত আধুনিকতার প্রসঙ্গেই এঁদের নাম করা হয়। কিন্তু যে-কথাটি বলতে চাইছি এখানে তা বিষয়গত দৃষ্টিকোণের দিক থেকে জরুরি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বটিকে প্রতিষ্ঠা দানই যেখানে ছিল চল্লিশের দশক পর্যন্ত সমাজমনস্ক গল্পকারদেরও অভীষ্ট সেখানে দেবেশ রায় ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভব করলেন এক অনাস্বাদিত পূর্ব মিশ্রণ। ধরা যাক ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত দেবেশ রায়ের 'সাত হাটের হাটুরে' (দেবেশ রায় সমগ্র ১-দে'জ পাবলিশিং) গল্পটির কথা। পান বিড়ি বিক্রি করা একটি তের বছরের বালক সাধনের দিন যাপনের বিবরণ। তার ঘুম থেকে ওঠা, সকালের বাস স্টপ-এ এসে দাঁড়ানো, বাস-এ চেপে হাটে যাওয়া এবং প্রতিদিনের বিক্রি, ট্রেনের কামরায় টিকেট ছাড়া যাতায়াত। দোকান, হাট, বাস-স্টপ-এর লোকজনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার যে-রীতি দেবেশ রায়ের নিজস্ব ধরন—তার প্রয়োগে গল্পটিতে সাধনের সমগ্র শ্রেণীগত অনুষ্ঠানটি নিবিড়ভাবে মূর্ত। তারই মধ্যে এক নিরাশ্রয় রাত্রে ক্লান্ত কিশোর এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রমনীদেহের প্রথম স্বাদ পায়। সেই দেহজীবিনী নারী তার মনে তার দিদির স্মৃতির ও রাত্রির নিরাশ্রয় একাকীত্বের অবলম্বন হয়ে ওঠে। দেবেশ রায়ের বর্ণনা অনায়াসে সাধনকে একটি জীবন্ত ও স্বতন্ত্র চরিত্রে পরিণত করতে পারে। এই সময়ের সব গল্পেই এমন হয়েছে তা নয়। কিন্তু কোনো কোনো গল্প এমন হতে শুরু করেছে যেখানে পরিবেশ-বর্ণনা বা একটি মানুষের বহিরাবয়ব ও হাঁটা-চলা, শারীরিক ভঙ্গিগুলির বর্ণনার মধ্যে দিয়েই চরিত্রটি জীবন্ত হচ্ছে এবং সেই চরিত্রটির ব্যক্তিত্বের আবরণ ভেদ করে তার শ্রেণীটিও জীবন্ত হচ্ছে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও সামাজিক বাস্তবতার জটিল ও ত্বরান্বিত

বিন্যাস সম্পর্কে খানিকটা আপাত-অনাসক্ত (detached) খর দৃষ্টি ও সম্যক উপলব্ধি না থাকলে এ জাতীয় চিত্রণ সম্ভব হয় না। সাম্যবাদী আদর্শ সম্পর্কিত ঐকান্তিক আবেগ এজাতীয় নির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শৈলী' কিছু পৃথক ছিল। বর্ণনার সঙ্গে প্রতি পরতে চিত্রকল্পময় এক ব্যঞ্জনা অসামান্য দক্ষতায় মিশিয়ে দিতেন তিনি। অনুপুঙ্খতার দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁরও কিন্তু ইঙ্গিতে ও প্রতীকী স্পর্শে আবহ ঘনিয়ে তোলার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। চরিত্র নির্মাণে শ্রেণীর ও ব্যক্তিত্বের অনায়াস মিশ্রণ ঘটাতে পারতেন তিনিও যা ছিল তাঁর দায়বদ্ধতার সততায়। 'জটায়ু' গল্পের নিত্যচরণ বা 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র কাঞ্চন এরকমই চরিত্রায়ণ অনেকটা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে।

মানুষের শ্রেণী-পরিচয়কে বিষয় করে নিয়ে কিভাবে পরবর্তীকালে গল্প নির্মাণ করেছেন এক অগ্রজ গল্পকার তার একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। কমলকুমার মজুমদার প্রথম লেখা শুরু করেছিলেন চল্লিশের দশকেই। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যেসব পরমাশ্চর্য গল্প তিনি লিখেছিলেন তার কথা এখানে বলবার অবকাশ নেই। কিন্তু সত্তরের দশকে কিভাবে তিনি সাম্প্রতিক হয়ে উঠেছিলেন তার একগুচ্ছ উদাহরণের একটি হল 'বাগান কেয়ারি' নামে একটি গল্প। জঙ্গলের গাছ কাটার কনট্র্যাকটর এর দিনমজুর এক ব্যক্তির একদিন কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়। লোকটির খোঁজ খবর করতে গিয়ে জানা যায়, পথে জুটে যাওয়া সেই শ্রমিকের কোনো পরিচয় ঠিকানা বা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের কথা কেউই জানে না—এমনকি তার নামও জানা নেই কারোর। তার দৈনিক প্রদেয় শ্রমটুকুই তার পরিচয়। তার ব্যক্তি-পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে তার পরিচয়ের মধ্যে তাই নামহীন এই লোকটির সম্পর্কে কোনো তথ্যই নথিভুক্ত করা সম্ভব হয় না, পৃথিবীতে চিরকালের জন্য নিরস্তিত্ব হয়ে যায় সেই দিনমজুর। 'বাগান কেয়ারি' নামটি থেকে শুরু করে শ্রেণী-ভেদ নির্দেশক গল্পটি যেন অভ্রান্ত-লক্ষ্য এক শিল্পনির্মাণ। সাম্প্রতিক কালে যে ভাবে এই সামাজিক সিসটেমটি গল্পের বিষয় হয়ে উঠছে তা এই সময়ের আগে কখনো এতটা প্রকট ছিল না।

এই সময়ের শতকরা আশি শতাংশ গল্পেই ব্যক্তি মানুষকে ছাপিয়ে ওঠে শ্রেণী-মানুষ। অথবা বলা যায় মানুষের ব্যক্তিত্ব যেন হয়ে ওঠে তার শ্রেণীত্বেরই একটি সংহত বিন্দু। সমাজে ব্যাপারটা চিরকালই এই রকম।

কিন্তু গল্পে তাকে এইভাবে স্পষ্ট করে তোলা হয়নি আগে। ধরা যাক আফসার আমেদের 'পাথর, পাথর' (পরিচয়, শারদীয় ১৯৯০) গল্পটির কথা। রুপো নামের এক বস্তিবাসী মানুষ তার ছেড়ে আসা পুরোনো সঙ্গিনীর কাছে যাচ্ছে—যে মেয়েটির জন্য সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তার 'সর্বস্ব হাহাকার করে উঠেছিল'। মনে হয় প্রথমে—রুপো এবং আলতা—এই দুটি নরনারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের গল্পই পড়ব। কিন্তু ক্রমে গল্পটি রুপো-র কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটি নিখুঁৎ জ্যা-বদ্ধ বৃত্তে ছড়িয়ে পড়ে যেখানে বস্তিজীবনের কণা-কণিকারও সযত্ন বিন্যাস। আমরা যদি স্থিত থাকি পূর্ব-প্রত্যাশায় তাহলে সে বিবরণকে মনে হবে বাহুল্য। আগেকার লেখকেরা একটি দুটি আঁচড়ে এজাতীয় বিবরণ সারতেন। সত্যের স্পর্শ পাওয়া যেত, মধ্যবিত্তের রুচি পীড়িত হত না। আফসার আমেদের রীতি ভিন্ন, যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্যও ভিন্ন। যে-বস্তিগুলি বিপুল সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে শহর কলকাতার উচ্চ মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটগুলির গায়ে গায়েই—তাদের রোগগ্রস্ত অস্তিত্ব স্তূপাকৃতি করেই দেখান তিনি—কারণ সেগুলিও এই কলকাতার বহুল সংখ্যক নাগরিকের শ্রেণী আবাসন। আমাদের সমাজের বুকের ওপর চেপে থাকা 'পাথর, পাথর' এবং পাথর।

অথবা আমরা দেখে নিতে পারি অভিজিৎ সেনের লেখা 'জেহাঙ্গী' (অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৯৮৮)। একটি সর্বতোভাবে শ্রেণীত্ব উদ্ঘাটক গল্প। ডাইনি বিশ্বাসে এক রমণীকে আঘাত করা—পরে তার বেঁচে যাওয়া। বিবেকবান সরকারি অফিসারের তত্ত্বাবধানে পুলিসের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের কিন্তু পরে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের সমঝোতায় মামলা কেঁচে যাওয়া। শিক্ষিত সমাজের এবং প্রশাসনের দুই বিবেকসম্পন্ন প্রতিনিধির নীরব পর্যবেক্ষণ। সমস্ত শ্রেণীটিই মনে করে ডাইনি থাকে, থাকা সম্ভব। হত্যাকারী নিজেই থানায় যায়—অপরাধবোধে নয়, ন্যায়বোধে, হত্যাকারীকে সাজা দিলেও সেখানে বিচার যথার্থ বলে মনে হয় না। কারণ ঐ অন্ধবিশ্বাসই আঘাতকারীর মনে প্রত্যক্ষ সত্য; তার হত্যা প্রয়াস তার কাছে সমাজের হিত-সাধনের চেষ্টা। এই শ্রেণী তার বিপর্যস্ত ভারতবর্ষ গল্পটির মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় আর একটি মনোভঙ্গিজাত বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে এই সময়ের বাংলা গল্পে। যে-প্রশাসনের এক প্রান্তে রাজনীতি, অন্য প্রান্তে পুলিস—সেই প্রশাসনের প্রতি তীব্র অবিশ্বাস। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ইংরেজের

পুলিসের অত্যাচার নিয়ে সামান্য কিছু গল্প লেখা হয়েছে। সামান্য, কারণ গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থায় প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগটা ছিল জমিদারের নায়েব-গোমস্তার—পুলিসের নয়। নায়েব শ্রেণীর অত্যাচার বাংলা গল্পে তাই অনেক দেখা গেছে। কারখানা-শ্রমিক সংক্রান্ত গল্পগুলিতে কারখানা-মালিকেরা হত বেসরকারি ব্যবসায়ী। স্বাধীনতার পর দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের হাত বহু বিস্তৃত। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ অনেকক্ষেত্রেই সরাসরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিপদে সরকারি নিয়ম কানুনের সঙ্গে সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আমাদের প্রত্যেকের সংসারে ঢুকে গেছে। ষাটের দশকের প্রারম্ভ থেকেই অনুভূত হচ্ছিল এই প্রশাসনের অসাধু চেহারাটি। নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময়ে প্রশাসনের অসততা, ক্ষমতা লোভ, অকর্মণ্যতা এবং অত্যাচার বিষয়ে ক্ষোভ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলে এই তীব্রতা জাগেনি। স্বাভাবিক নিয়মেই তা পুঞ্জিত হচ্ছিল। নকশালবাড়ি রাজনীতির অভ্যুত্থান এই মনোভাবের কারণ নয়, ফলাফল। কিন্তু এই আন্দোলন এই মনোভঙ্গিটি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে কিছুটা। ফলে বিগত কুড়ি বছরের বাংলা গল্পে প্রশাসনের প্রতি অবিশ্বাস, বিদ্রুপ, ঘৃণার প্রকাশ যত দেখা গেছে ততটা এর আগে কখনো হয়নি। সাম্প্রতিকতম বাংলা গল্পের প্রতিটি ধারাই এই দৃষ্টিকোণ বা ইম্‌প্রেশন্‌-এর শরিক। 'প্রতিটি ধারা' শব্দবন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে—বাংলা গল্পে কি এখন একাধিক ধারা? বেশি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা চলে—অন্তত দুটি প্রধান ধারা তো আছেই। পঞ্চাশের দশক থেকেই দেশের প্রকাশনা সংস্থার কোনো কোনোটি ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে শুরু করায় এবং ষাটের দশকের প্রারম্ভেই মাঝারি-শিক্ষিত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত একটি পাঠকশ্রেণী তৈরি হয়ে যাওয়ায় বিনোদন-মূলক সাহিত্য-সৃষ্টি বিপুলভাবে বেড়ে ওঠে! এক দল লেখক ব্যবসায়িক প্রকাশ মাধ্যমের অনুকূলতা পেয়ে যান এবং খানিকটা মধ্যবিত্তের ভালো লাগার মতো গল্প-উপন্যাস লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁদের হাতে বাংলা ছোটগল্পের একটি ধারা গড়ে উঠেছে যা সাম্প্রতিক কালে যথেষ্টই পরিস্ফীত। জনপ্রিয় ও বিনোদন-মূলক পত্র-পত্রিকার সহায়তায় তাঁরা অধিক খ্যাতিমান। তাঁদের অনেকেই শক্তিশালী লেখক হওয়ায় তাঁদের কলমে বহু চমৎকার ছোটগল্প লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু প্রধানত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পাঠকের চিত্তরঞ্জন তাঁদের লক্ষ্য হওয়ায় তাঁদের গল্পে মধ্যবিত্ত-জীবন-কেন্দ্রিকতা, মধ্যবিত্ত চরিত্র

অবলম্বন এবং মধ্য বিত্তের মূল্যবোধ সংরক্ষণ—এসবই অটুট আছে। তার সঙ্গে অনেক সময়ে খানিকটা মনোরঞ্জনী উপাদান এবং স্থিতাবস্থা ধরে রাখার অভিপ্রায়ও অনুভব করা যায় যা আমরা পঞ্চাশের দশকের জনপ্রিয় গল্পকারদের মধ্যে তুলনায় কম দেখেছি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ লেখকের কিছু ভিন্নতর এবং কঠিনতর জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল। এই ধারার গল্পকারদের লেখায় শ্রেণীর চরিত্র নয়, ব্যক্তি চরিত্রই প্রধান। এই প্রবন্ধে স্পষ্টতই মূলত লক্ষ্য করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক গল্প-ধারাটিকে। এই ধারাতেই পূর্বে উল্লেখিত শ্রেণী-চেতনার বিশেষ ধরনটি শিল্পিত হয়েছে। তবু সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে এই দুটি ধারার অস্তিত্ব স্বীকার্য। মাঝে মাঝে দুটি ধারার সীমারেখা একাকার হয়ে যায়—তা-ও অস্বীকার করা যায় না। সমরেশ বসুর লেখায় পাই তার সর্বোত্তম উদাহরণ। তবে, এই দুই ধারার গল্পেই এদেশের প্রশাসনের প্রকৃত চেহারাটি প্রায়ই উদ্ঘাটিত হয়। প্রশাসনিক অবস্থাটির অনাবরণ সত্যতা বোঝা যায় তা থেকেই।

ধরা যাক ভগীরথ মিশ্রের লেখা 'বিবর্তন' গল্পটির (পরিচয়, শারদীয় ১৯৯০) কথা। তাঁর প্রতিপাদ্যটি অতীব সরল। রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দল বদল করে এবং সেই পরিস্থিতির সুযোগ নেয় ব্যক্তি ও দল দুই পক্ষই। তবু তিনি গল্পটিকে যথাযথভাবে নির্মাণ করতে পেরেছেন। গল্পের একটি চরিত্র বুদ্ধিমান, পরিহাসপ্রিয়, সদবুদ্ধি সম্পন্ন এক যুবক। তার কথাই হয়ে ওঠে গল্পের 'মেসেজ'। —"বাবা তো ছোড়দাকে প্রায়ই বলছে, 'পল্টু, আর দেরি নয়। সময় থাকতে তুই বিক্ষুব্ধ হইয়া যা। বিক্ষুব্ধরাই ক্ষমতায় আসবে দু'দিন বাদে।' ...ছোড়দা দোটানায় পড়িয়া গ্যাছে। ...এখনতো এ তল্লাটের ডিলারশিপ লাইসেন্স, পারমিট, কাজের সুপারভাইজারি, ব্যাঙ্কের লোন, ব্লকের রিলিফ সব বলতে গেলে ছোড়দার হাতে। ছোড়দা বলছে 'ধর বিক্ষুব্ধ হলাম। তারপর যদি বিক্ষুব্ধরা গদি না পায়? তবে তো পুরা স্যাক্রিফাইসটাই বিফলে গেল।' ...আমি এখনো বাইরে, বাইরেই আছি। ...একেবারে মিঃ ক্লীন। বাবা বলছে, ফ্যামিলির মধ্যে একজনের অন্তত এসবের বাইরে থাকাটা দরকার। যদি কুনো দিন পাশার দান উল্টায়, অমনি 'বেন্দে মাতোরম' 'বেন্দে মাতোরম' জুড়িয়া দিবি।" বিষয়টি খুবই সরাসরি উপস্থাপিত করেছেন লেখক। তবে আজকের ভারতে এই ব্যবস্থাটিই এত সরাসরি চলেছে যে লেখকও কোনো আড়াল—এমনকি শৈল্পিক আড়াল রচনারও চেষ্টা করেন না।

এখনকার ছোটগল্পকারদের মধ্যে অনেকেই জীবিকাসূত্রে প্রশাসন ও গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের লেখায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধৃত ঐ একই চিত্র ছোটগল্পে মূর্ত হয়। নাম করতে পারি অমর মিত্র, ভগীরথ মিশ্র বা অনিল ঘড়াইয়ের।

প্রশাসন ও পুলিসের সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। সরকার বিরোধী যে-কোনো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিরা পুলিসী অত্যাচারের সঙ্গে পরিচিত। সেই যান্ত্রিক অমানবিকতা নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে বহু মনে রাখার মতো ছোটগল্প লেখা হয়েছে। হয়েছে বাংলা ভাষাতেও। একটি অনবদ্য উদাহরণ নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হাওয়া হাওয়া' (প্রমা, শারদীয়, ১৯৮৯)। এক 'কিলার' পুলিস অফিসার ও এক একদা বিপ্লবী মুখোমুখি হয় সব বিপ্লব শেষ হয়ে যাওয়া দেশের একটি দামি হোটেলে। সেদিনের বিপ্লবী এখন নামকরা কাগজের রিপোর্টার। এখন শত্রুতা নেই। এখন সত্তরের শুরু নয়, আশির দশকের শেষ। এখন তারা পরস্পরের কাছে 'দাদা' ও 'ভাই' হতে পারে। নবারুণের গল্পটির নির্মোহ সত্যদৃষ্টি পুলিস অফিসার ও একদা-বিপ্লবী রিপোর্টারকে একই নিক্তিতে বিচার করে দেখেছে। তাদের গুজনের বিশেষ পার্থক্য নেই যেন। তীব্র সংলাপের জ্যাবদ্ধ আকুতি গল্পটিকে আগাগোড়া টান করে রাখে। পুলিসী অত্যাচার ও প্রশাসনের হৃদয়হীনতা নিয়ে একাধিক উত্তীর্ণ গল্প লিখেছেন জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, শৈবাল মিত্র, বিপ্লব রায়, জয়ন্ত জোয়ারদার। লিখেছেন আরো অনেকেই।

সাম্প্রতিক কালের গল্পে প্রায়ই দেখানো হয় সেই চিত্র যেখানে সমাজে প্রতারণার হাতিয়ার হয়ে ওঠে ধর্মের নামে ভণ্ডামি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে শুধু নয়, নিরক্ষর নিম্নবিত্তরা আরো বেশি করে এর দ্বারা প্রতারিত হয়। সেই প্রতারণার পরিচালক হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ—আবার কখনো ওঝা-পুরোহিত জাতীয় নিম্নবর্গের লোকেদেরই কেউ কেউ। বিগত দুই দশকে বিভিন্ন জটিল কারণের সমাহারে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মব্যবসায় বেড়ে গেছে অনেক। সাহিত্যিকেরা কলম ধরেছেন তার বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খুব মোটা দাগের ভণ্ডামিগুলিকেই—প্রায়ই একই রকম মোটা দাগে রূপায়িত করা হচ্ছে গল্পে। সেখানে আমরা হাটে-বাজারে, মন্দির-চত্বরে, নানাধরনের মায়ের ও বাবার 'থানে'—যে-ধরনের প্রতারণা চলে তা-ই দেখতে পাই। বোধহয় নিম্নবর্গের মানুষদেরই প্রধানত এই ব্যবস্থার শিকার হতে হয়। কিন্তু সমস্যাটির সূক্ষ্মতর স্তরে প্রায়ই ঢোকা হয় না। যেখানে ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূল

থেকে এই প্রতারণার উৎস—সন্ধান প্রয়োজন-পৌছোনো যায় না সেখানে। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজের বড়লোক গুরুদের কথা বলা হয় না। পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবার দ্বিতীয় তুলনা' আছে বাংলা সাহিত্যে? তার চেয়েও বড় কথা—মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারের বার-ব্রত, লক্ষ্মীর আসন কে বলা যেতে পারে—বেশ প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়। কিন্তু জড় কি সেখানেই নয়?

যুগটা বিজ্ঞানের। কিন্তু বিজ্ঞান পৃথিবীতে যতটা বিজ্ঞান-মনস্কতা সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে পেরেছে প্রযুক্তিগত সম্পদ। ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই প্রযুক্তিগত সমুন্নতি সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছেই সহায়ক হয়ে ওঠে। কারণ সেসব দেশের গরিবরা ভারতের গরিবদের তুলনায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত। সেসব দেশে যখন এরোপ্লেন চলে তখন গরুর গাড়ি আর চলে না। দূরতম গ্রামেও পাওয়া যায় বিদ্যুৎ, গাড়ি চলার রাস্তা এবং যন্ত্রচালিত গাড়ি। ভারতের মতো দেশে যেটুকু প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটে তা করায়ত্ত হয় কেবল বিত্তশালী শ্রেণীর। এবং অনেক সময়েই বহু কাজের ক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা মানুষের রুজি-রোজগারে টান ধরায়। এর ফলে প্রায়ই দেখা যায়, শ্রেণী-সচেতন গল্পকারেরা প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের দিকে প্রীতির চোখে তাকাতে পারেন না। আবার সমাজ-জীবনে তার অব্যর্থ অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখবারও কোনো উপায় নেই। অতএব একটি সংশয়াত্মক ও কিছুটা বিরূপতাময় দৃষ্টি-কোণ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সাম্প্রতিক ছোটগল্পে স্থান পায়। বিশেষ করে টি. ভি. এবং ভিডিও একালের গল্পে প্রায় একটি প্রতীকী উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগরিক জীবনের গল্পে বহুতল বাড়ির সঙ্গে একটি ভিন্ন তাৎপর্য পেয়েছে 'লিফট'। বস্তুগুলি নয়—এই বস্তুগুলির মধ্যে দিয়ে একটি বিষণ্ণ-জটিল আধুনিক মনোভাবই যেন অভিব্যক্ত।

একাধিক লেখক মাঝে মাঝেই এই দৃষ্টিকোণটিকে বিষয় করে নিয়ে গল্প লেখেন। সাম্প্রতিক কালে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি এ ধরনের গল্প লিখেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। একটি চমৎকার উদাহরণ 'মানুষ কিম্বা কোলবালিশ' (অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৯৯১)। একটি পুরোনো সাইকেল সম্বল করে এক ফিল্ম-ক্যাসেট-বিক্রেতা ব্যবসায়ীর দরিদ্র কর্মচারী তারা দাস খরিদ্দারদের কাছে পৌছে দেয় পছন্দমতো সিনেমা—কখনো কখনো তা 'নীল'। সেই তারা দাসকে একদা এক রহস্যময় বৃদ্ধ দিয়ে যায় 'ফটো (Photo) ইলেকট্রিক সেল' লাগানো একজোড়া ডানা। সূর্যের আলো পড়লে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, মানুষ ওড়ে। বৃদ্ধ বলে যায়—'খারাপ কাজে লাগিও না'। তারপর সততা হারিয়ে ফেলা

এই জাঁহাবাজ সভ্যতায়, ক্ষমতাবান মানুষের কূট দাবার চালের অসহায় বোড়ে গরিব তারা দাস কিভাবে তার ডানাসহ ব্যবহৃত হতে হতে নিরুপায় আত্মহননের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তারই করুণ আলেখ্য এই গল্পটি।

কিছুটা বিতর্কমূলক একটি জিজ্ঞাসা স্থাপন করা যেতে পারে সাম্প্রতিক ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে। বাংলার, বিশেষত গ্রামবাংলার জনগোষ্ঠীর প্রশস্ত একটি অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। যেসব কারণে অবিভক্ত বাংলায় অধিকাংশ লেখক হিন্দু, সেসব বহু-আলোচিত কারণ-আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই।[১] মুসলমান লেখকরা প্রাক্-স্বাধীনতা কালে যে কথাসাহিত্য লিখেছেন তা প্রধানত উপন্যাস যেমন মোজাম্মেল হক (জোহরা) বা নজিবর রহমান (আনোয়ারা); ইমদাদুল হক (অবিদুল্লাহ্) বা আবুল ফজল (চৌচির)। কিন্তু কল্লোল-পর্বে আমরা মুসলমান ছোটগল্পকার প্রায় দেখিই নি। মনে হতে পারে যে কেন এত প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে লেখকের বিশেষ ধর্মটির প্রতি! হিন্দু লেখকের কলমে কি রূপায়িত হতে পারে না মুসলমান সমাজ? হতে পারে এবং কিছুটা সেরকম হয়েছে। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু লিখেছেন মুসলমান সমাজ ও মুসলমান চরিত্র নিয়ে সুসার্থক গল্প। তবু আমাদের দেশের জাতিধর্মভেদ-ভিত্তিক সমাজে, 'স্পর্শ'-সচেতন হিন্দু মানসিকতায় মুসলমান সমাজভুক্ত মানুষের মনস্তত্ত্বটি ঠিকমতো প্রতিফলিত হয় না। দুটি সমাজ, দুটি ধর্ম দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করলেও তারা আলাদা। ঠিক কোথায় কিভাবে আলাদা তা সমাজসত্তার গভীরে গিয়ে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেননি লেখকেরা। ফলে তাঁদের লেখায় মুসলমান চরিত্রও ব্যক্তি রূপেই এসেছে, শ্রেণীগত চালচিত্রের সম্পূর্ণতায় তাদের ততটা অনুভব করা যায় না। ১৯৪৫-৪৬ এর সময়টিতে সাম্প্রদায়িক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেখা হয়েছিল একগুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছোটগল্প। হিন্দু লেখকেরা লিখেছিলেন, কয়েকজন মুসলমান লেখকও দেখা দিয়েছিলেন সেই সময়ে। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মবিন উদদিন আহমদ, সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ, শওকত ওসমান দেখা দিয়েছিলেন সেই সময়ের অবিভক্ত ভারতে। নানাকারণে সেসব গল্প-সংকলনগুলি সাময়িকতা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। একটি কারণ রাজনৈতিক। দেশবিভাগ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে অধিকাংশ বই আর মুদ্রিত হল না। লেখকেরা বেশির ভাগ চলে গেলেন ওপার বাংলায়। তারপরের দুই দশকে কয়েকটি উপন্যাস লেখা

হলেও বাংলা ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ প্রায় অবহেলিত। বিগত দুই দশকে কিন্তু মুসলমান সমাজ নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে অনেক। তার একটা কারণ যে—সামগ্রিক ভাবেই লেখকেরা শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠেছেন। আর একটা কারণ—একদল তরুণ গল্পকার দেখা দিয়েছেন যাঁরা জীবিকার দাবিতে গ্রাম ও ছোটো শহরের সঙ্গে পরিচিত। সচেতন ভাবে তাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চান। ফলে হিন্দু লেখকের হাতেও খানিকটা সত্যতর হয়ে দেখা দিয়েছে মুসলমান সমাজ। এবং একাধিক মুসলিম লেখকের আত্মপ্রকাশেও প্রকৃতপক্ষে সঠিক মাত্রা পেয়েছে এই বিষয়টি। অত্যন্ত সদিচ্ছা এবং সযত্ন নির্মাণ সত্ত্বেও হিন্দু লেখকের হাতে মুসলমান সমাজের যে-চিত্র হয়ে পড়ে ডকুমেন্টেশন—মুসলমান লেখকের কলমে তা-ই হয়ে ওঠে প্রাণবান। একটি জীবন্ত চরিত্র আঁকতে গেলেও সেই চরিত্রের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে সংস্কার থাকা জরুরি—হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দীর্ঘকাল প্রীতি-সম্পর্ক নিয়ে বাস করলেও সেই নৈকট্যের আওতায় যান না হিন্দু লেখক। আজও কজন হিন্দু লেখক জানেন কারবালার সম্পূর্ণ কাহিনী বা ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য? খুবই কম। এজন্য আমাদের মুসলমান লেখকই প্রয়োজন ছিল। তাঁরা এসেছেন এই সাম্প্রতিককালেই। আবুল বাশার ও আফসার আমেদের নাম মনে পড়বে সকলেরই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে-সংজ্ঞাটির উল্লেখ করা হয়েছে আগে—তাতে আছে একটি সংকটের কথা। সাধারণত এই সংকটের সৃষ্টি হয় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। এখনকার ছোটগল্পে মানুষের শ্রেণী-পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই সমাজচিত্রণের তাৎপর্যও অনেক বেড়েছে। ছোটগল্পে আবহ বা পরিবেশ বর্ণনার একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল সবসময়েই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পে দেখেছি সেই পরিবেশ সাধারণত ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাতকে স্পষ্ট করে দেবার সহায়ক আবহ রূপেই ব্যবহৃত হয়। একালের গল্পে কিন্তু পরিবেশ চিত্রণ কিছু ভিন্ন ভূমিকা নিয়েছে। একালের অনেক গল্পেরই প্রতিপাদ্য হল মানুষের বেঁচে থাকার সামগ্রিক সংকট। সেখানে ব্যক্তির সংঘাত ব্যক্তির সঙ্গে ততটা নয় যতটা তার সামাজিক অস্তিত্বেরই সঙ্গে। কাজেই এই পরিবেশ চিত্রণের অনুপুঙ্খতা এই সব গল্পে একটি পৃথক চরিত্রের চেহারাই পেয়ে যায়। ব্যক্তি এবং পরিবেশ হয়ে ওঠে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সাম্প্রতিক লেখকদের পরিবেশ চিত্রণের কুশলতা শ্বাসরোধ করে দেবার মতো। লেখকদের অনেকেই সমাজের সর্বস্তরের, অন্তত সামাজিক চেহারাটি,

ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। বাংলা গল্প যে মধ্যবিত্ত জীবনচিত্রণে আবদ্ধ—একথা একেবারেই সত্য নয় এখন। পরিবেশের বর্ণনাকে অপরিসীম ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তোলেন একালের গল্পকারেরা। কয়েকজনের নাম করতে গেলে মনে পড়ে সৈকত রক্ষিত, নলিনী বেরা, রাধাপ্রসাদ ঘোষাল, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই-এর কথা। আরো যাঁদের নাম করা হয়েছে আগে তাঁরা তো আছেনই। দু'একটি গল্পের উল্লেখ করা যাক রক্ষিতের 'চুর্ণলাও বাবু' (পরিচয়, শারদীয়, ১৯৮৬) এবং নলিনী বেরার 'ঝুমকা' (গল্পপত্র, শারদীয় ১৯৮৯)—দুটি গল্পেই আছে অভাবী মানুষ এবং তাদের হাটে বেচাকেনা করবার বিবরণ। দু'টি গ্রামীণ হাটের দু'ধরনের দু'টি বিবরণে দুই লেখকই আশ্চর্য সফল। গ্রামীণ মানুষের কাছে অন্যতম জটিল সামাজিক একটি ব্যবস্থা হল হাট। মানব সভ্যতার নিজস্ব গড়নটির একটি মূল উপাদান ব্যবসা-বৃত্তি, বাণিজ্যিকতা, কেনা-বেচা, কিছু লাভ করে নেবার প্রবণতা। হাটে আসা ও যাওয়া—হাটের বর্ণনার মধ্যেই সমাজ-চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন দুই লেখক। রাধাপ্রসাদের একটি লেখায় ধাপার মাঠের এক আশ্চর্য ছবি পেয়েছিলাম, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে এরকম বহু উদাহরণ পাই। কখনও রেলব্রিজের তলায় গ্রাস করা জনবসতির জীবন-যাপন, কখনও হাসপাতালের অভ্যন্তর, কখনও মধ্যবিত্তের তালি দেওয়া অস্তিত্ব। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'তাতারসি' (পরিচয়, শারদীয় ১৯৮৪) গল্পে খেজুর রস থেকে গুড় তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকা এক সংসারের চমৎকার ছবি। সে-বর্ণনা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পকে স্মরণ করালেও দেখিয়ে দেয় যে অনুসরণ নেই কোথাও। বিভিন্ন শ্রেণীর জনজাতি-জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের শক্তিতে আমাদের সম্ভ্রম আদায় করে নেন অনিল ঘড়াই। এটাই তাঁর গল্পের মূল শক্তি। 'মুগনি পাথর' (অমৃতলোক ৫১, ছোটগল্প সংখ্যা, শারদীয় ১৯৮৭) বহু উদাহরণের একটি। আদিবাসী ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে রূপায়িত করবার প্রবণতাও একালের লেখকদের মধ্যে বেশ প্রবল। কানাই কুণ্ডুর বহু চমৎকার গল্প মনে পড়ে। প্রায় সব গল্পকারই এক বা একাধিক জন-গোষ্ঠীকে গভীরভাবে চেনেন এবং চেনাতে চান আমাদের মতো পাঠকদের কাছে। অভিজিৎ সেনের উত্তরবঙ্গ থেকে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দরবন সর্বত্রই আজকের লেখকের মানুষের সন্ধান অব্যাহত। আলাদাভাবে বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়তো ঠিক হবে না তবু বলা যায় সম্প্রতিকালের বাংলা গল্পে আঞ্চলিকতা —সবসময়ে গল্পের একতম সম্পাত-বিন্দু না হলেও—অঞ্চলের রঙ

ও রূপ যেন কেবলই প্রেক্ষাপটের চেয়ে কিছু বেশি মূল্য পায়। এমন একাধিক লেখককে দেখি যাঁরা বিশেষভাবে মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গ বা সুন্দরবনকে তুলে ধরেন অঞ্চলটির নিসর্গ, ভাষা, জনজাতি ও বিশেষ জীবিকা-সমস্যার কথা মনে রেখে। চিত্রায়নের অনুপুঙ্খতা যেন কেবল বাস্তবকে ফুটিয়ে তোলার বেশিও কিছু করে। মনে হয়, এই অঞ্চল-সচেতনতা সাম্প্রতিক গল্পকারদের শ্রেণীচেতনারই একটি চেহারা। একটি মানুষ যেমন অচ্ছেদ্যভাবে তার শ্রেণীর একজন তেমনিই অচ্ছেদ্যভাবে সে তার নিজের পরিমণ্ডল—নিজের পায়ের তলার মৃত্তিকা-ভিত্তির সঙ্গেও যুক্ত। খুব স্পষ্টভাবে না হলেও—এমন একটা ভাবনা হয়তো কাজ করে লেখকদের মধ্যে।

বহির্বঙ্গের বা বহির্ভারতের—বিশেষত ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার অভিবাসী বাঙালির সমস্যাও সাম্প্রতিক গল্পে কিছু কিছু পাই—কিন্তু তা কেবল সেই ধারাটিতেই—যাঁরা মূলত বাণিজ্যিক প্রকাশন মাধ্যমগুলির সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়টি মধ্যবিত্ত বাঙালি সংগ্রহে নিয়ে থাকেন—একালের ইচ্ছা-পূরণের কাহিনী হিসেবে। অথচ তা রূপকথা নয়—বাস্তব। খানিকটা আন্তর্জাতিকতাবোধ থেকেও এজাতীয় লেখা সম্পর্কে একটি ভালো লাগা তৈরি হয়।

সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্পের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে যে শ্রেণীচেতনার কথা আগে বলেছি তা থাকা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত জীবনও বহুল পরিমাণে এই সময়ের ছোটগল্পের বিষয়ীভূত। কারণ এ সত্যটি আজও অপরিবর্তিত যে, এই শ্রেণীর মধ্যেই সাহিত্যের সৃজন ও পঠন সীমাবদ্ধ। তাই মধ্যবিত্ত সমাজ ও সংসারের একালীন সমস্যাগুলি—পুরোনো সংস্কার আর আধুনিকতার মধ্যে জট পাকিয়ে যাওয়া, ছোটো পরিবারে ছোটো জায়গায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে রাখা, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, কাজের লোকের বিশিষ্ট ভূমিকা, বহুতল বাড়ির নানাদিক, পেশাগত সমস্যা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-জট—এসবই আসে সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে। এখানেও আগের প্রশ্নটি তোলা যায়। এগুলি বিষয় কিন্তু এই বাস্তব বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোন্ মনোভঙ্গি? মনোভঙ্গিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাশার—বিষাদের—জটিল সংকটবোধের—বৈনাশিকতার। বিশেষত নৈঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ এই ধরনের গল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু বলা যায়। শহর, গ্রাম ও গ্রামপ্রান্তিক দরিদ্রতম শ্রেণী ছাড়াও নাগরিক মধ্যবিত্তের মানসিকতা নিয়ে গল্প লিখে আমাদের দৃষ্টি কেড়েছেন জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ মজুমদার, মানিক চক্রবর্তী,

কিন্নর রায়, কেশব দাস এবং আরো অনেকেই। অবশ্য এঁদের মধ্যে মানিক চক্রবর্তীর লেখার অ্যান্টি গল্পের প্রকরণ ও লক্ষণ রীতিমত আলাদা ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এধরনের গল্পগুলিতে অনেকসময়ে মনোবিশ্লেষণের ধরনটিও গুরুত্ব পায়। নাগরিক অস্তিত্বের প্রতীক রূপে প্রায়ই আসে লটারি, তাসের জুয়া, রেস খেলা, মদ্যপান, রেস্তরাঁ, স্টেশন, লোক্যাল ট্রেন, বি-বা-দী বাগের ব্যস্ততা। মধ্যবিত্ত জীবন-চিত্রণে—সেই জীবনের স্ববিরোধ ও আত্মজিজ্ঞাসাগুলিকে ফুটিয়ে তোলায় সফলতা দেখিয়েছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য এবং আলপনা ঘোষ। আজকের পরিবেশে আশা-উজ্জ্বল অথবা মধুর ভালোবাসার গল্প প্রায় দেখাই যায় না। বহিরঙ্গে ভোগ্যপণ্য-সমৃদ্ধ জীবন আগের চেয়ে বেশি করায়ত্ত করেছে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজ কিন্তু তার চারিদিকের পৃথিবীতে যে প্রগাঢ় অনিশ্চয়তা তা সে অনুভব করে। এই প্রচ্ছন্ন আতঙ্কিত অস্তিত্ব প্রতিমুহূর্তে ছায়া ফেলে যায় আজকের বাংলা ছোটগল্পে।

ষাটের দশকের প্রারম্ভ-কাল পর্যন্ত ছোটগল্প লেখা হয়েছে প্রধানত সহজ বিবৃতির ভাষায়। সাহিত্যে নিত্য নতুন রীতির পরীক্ষা যতই থাক—গল্প বলার আদি শৈলীটি সবসময়েই থাকবে—সব সময়েই তা অভীষ্ট স্পর্শ করে। বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিকতায় নতুন রীতি সম্পর্কে চেতনা জাগতে শুরু করেছিল ১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে। তবে মূল ধারাটিতে তখন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ লেখকদেরই প্রতিষ্ঠা। ক্বচিৎ কখনো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার বা সুবোধ ঘোষের গল্পে কাহিনী-প্লট গৌণ হয়ে গিয়ে কাব্যময় আবহ-বিস্তার বা বিশ্লেষণী গহনতা পরিস্ফুট হলেও মূলত তাঁরা প্রথাসিদ্ধ চরিত্র ও ঘটনা-নির্ভর কাহিনীমূলক গল্পই লিখতেন। পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে কয়েকজন তরুণ-লেখকের রচনায়। অগ্রজ ননী ভৌমিক, অসীম রায় ও তরুণতর কার্তিক লাহিড়ীর প্রথাভাঙার প্রয়াসের পর দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ, মতি নন্দী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কখনো বরেন গঙ্গোপাধ্যায় বা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পা ফেললেন নতুন নতুন পথে। বিক্ষিপ্ত প্রয়াসকে একটু সংহত রূপ দিলেন বিমল কর। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' নামে একটি ছোটগল্প-সিরিজ প্রকাশ করলেন তিনি ১৯৫৯-এ। এই সিরিজে গল্প লিখেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। 'জটায়ু' ও 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পদুটি এই সিরিজে প্রকাশিত হয়ে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস হয়ে উঠেছে। দু' তিন বছরের মধ্যেই লেখা হল কমলকুমার মজুমদারের

'ফৌজ-ই-বন্দুক' এবং 'গোলাপ সুন্দরী'। লেখা হল সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'। পাশাপাশি মনে আসে দেবেশ রায়ের 'দুপুর' এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বরা' এবং মতিনন্দীর 'বেহুলার ভেলা' নামে তিনটি অসামান্য গল্প। 'পরিচয়', গল্প-সংখ্যা 'কৃত্তিবাস', 'এক্ষণ' এবং 'দেশ' পত্রিকাতেও এজাতীয় গল্প প্রকাশিত হল কিছু কিছু। কলকাতার পাঠকদের কিছুটা চোখের আড়ালে ভিন্ন স্বাদ ও রূপের গল্প লিখতে শুরু করলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার—যাঁর মুল্য বহুদিন পরে দেবেন বাংলার পাঠক ও সমালোচকেরা। কখনো গল্পগুলিতে দেহ ও মনের তীব্র সংবেদন প্রকাশিত হল দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষার সীমা ছাড়ানো প্রগাঢ় কবিতার ভাষায়। ভাষার জোরে মূর্ত হয়ে ওঠা একটি আশ্চর্য ছোটগল্প দেবেশ রায়ের 'দুপুর'। কখনো প্রতীকী দ্যোতনায় ঝলসে উঠল গল্প-পরিণাম। ভোলা যায় না দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বর সভা'। তিন বন্ধু ফ্লাশ খেলতে শুরু করে। কাগজে লেখা নামের পাশে কাটা ঘরে জেতা দানের প্রাপ্তির হিসেব জমা পড়ে—খেলার বাজি হল পরিচিত মেয়েদের নাম। তাদের নাম মাত্রে যেটুকু রতি-সুখের কাল্পনিক বুদ্বুদ ওঠে—তাই। বন্ধ্যা সমাজের অতৃপ্ত, অশ্লীল, ভবিষ্যৎহীন, উদ্দীপনাহীন জনতার প্রতিনিধি তিন যুবক। পরিচিত মেয়েদের নিয়ে তাদের যুদ্ধের ভাগ-বাঁটোয়ারা শেষ হয়ে গেলে গল্পের মেয়েদের ধরা হয়। এবং অমোঘ নামটি উঠে আসে—দ্রৌপদী। লেখক গল্প শেষ করেন 'তারপর দ্রৌপদীর জন্য শেষ বাজি আরম্ভ হল।' আসন্ন কুরুক্ষেত্রের অশনি-সংকেতে গল্পের সমাপ্তি।

১৯৬২-র কাছাকাছি প্রকাশিত বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা' সংকলনটির কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অবক্ষয়িত এক সমাজের ছবি বাসুদেব দাশগুপ্ত এঁকেছিলেন তীব্র ভাষায়। সেই তীব্রতার অনেকটাই এসেছিল গল্পের নির্মাণ-জনিত অভিনবত্ব থেকে। লেখক সাবলীলভাবে মিশিয়েছিলেন নানা ধরনের ভাষায় গাঁথা কথা-খণ্ডের কোলাজ। কখনো অধুনা-অপ্রচলিত সাধুভাষায় বা প্রত্ন-বাংলায় রচিত পুরোনো লেখার টুকরো, কখনো একান্ত আধুনিক বস্তির ভাষা, কখনো রিপোর্টাজ-এর আপাত নৈর্ব্যক্তিকতা, কখনো কবিতার মতো আবেগার্ত অনুরণন। সেই সঙ্গেই পচধরা সমাজের প্রতিবিম্ব রূপ পেয়েছিল অবাধ যৌনতাময় অনুষঙ্গে। 'রন্ধনশালা'-র শৈল্পিক স্থায়িত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু সেই সময়ের একটি মানসিক অভিঘাত মূর্ত হয়েছিল তার মধ্যে।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত যে 'হাংরি জেনারেশন' নামের আন্দোলন বেশ কিছুটা ঢেউ তুলেছিল তা মূলত কবিতার হলেও এই লেখকদের কিছু গদ্যরচনাও ছিল। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় সুভাষ ঘোষের গল্পাভাসময় কিছু রচনাও বিশেষত 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অনেকের।

এরপর ১৯৬৬-তে 'এই দশক' নামে একটি গল্প-পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পত্রিকার তরুণ গল্পকারদের সমবেত প্রয়াস ছিল এই বহির্বাস্তব তুচ্ছ করা: গল্প গৌণ-অন্তর্মুখীনতাকে অস্পষ্ট-অবয়বী ভাষায় তুলে ধরা। অবশ্য প্রতীকী অবয়বের সাহায্য তাঁরা নিতেন। রমানাথ রায়, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, আশিস ঘোষ, সুব্রত সেনগুপ্ত, অমল চন্দ, বলরাম বসাক, সুনীল জানা ছিলেন 'এই দশক' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। আরো ছিলেন অতীন্দ্রিয় পাঠক, সুকুমার ঘোষ, সমর মিত্র। ব্যবসায়িক পত্রিকার বিনোদন-প্রধান গল্প বলার ধরনটিকে তুচ্ছ করবার একটা সংকল্পও কাজ করেছিল এই লেখকদের মনে। বিবৃতিময় রীতির প্রাধান্য তাঁরা অবশ্য ভেঙে ফেলতে পারেননি, তবু সে-রীতির সর্বাত্মকতার মধ্যে নিজেদের জায়গাও একটু করে নিয়েছিলেন। সচেতন গল্প-পাঠক দুটি ভিন্ন গল্প-রচনা-রীতি-সম্পর্কেই হয়ে উঠেছিলেন সচকিত ও গ্রহণশীল।

সত্তরের দশকের শুরুতে কিন্তু বাংলা গল্পে প্রবলভাবে ফিরে এল ন্যারেটিভ স্টাইল। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাত মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিল নিষ্ঠুর বাস্তবতার মাঝখানে। বহির্বাস্তবের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে গল্প লিখলেন লেখকরা। স্পষ্ট বিবৃতির ভাষাই প্রধান হল। পরিবেশের প্রত্যক্ষ, অনুপুঙ্খ ছবি—কখনো স্কেচধর্মী—আঁকলেন গল্পকারেরা। তাঁদের ভাষায় কিন্তু কল্লোল-পর্বের কোনো কোনো গল্পকারের গদ্যের তরল-শিথিল ভাবটা রইল না একেবারেই। ভাষার মধ্যে সুন্দরকে নয়—কঠোর, নিষ্করুণ, ভয়াবহ, কদর্য বাস্তবকে দেখাতে চান তাঁরা। তাঁদের আপাতনির্মোহ, তীব্ররেখ বিবরণের মধ্যে দিয়েই একটা প্রতিবাদ যেন ফুটে বেরোয়। এসব গল্পে কিন্তু কাহিনী বা ঘটনা ততটা বড় হয়ে উঠল না। পরিমণ্ডল রচনা, পরিবেশ বর্ণনাকে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব রীতিতে গল্পের মূল শক্তি করে তুললেন। এই লেখকেরা যে ব্যক্তির জীবনের গল্প বলতে আসেননি, এসেছেন একটি ভয়ঙ্কর সময় ও সামঞ্জস্যহীন সমাজের চেহারা তুলে ধরবার জন্য—তা অনুভূত হল পরিবেশ বর্ণনার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁদের বিবৃতিকে বলা যেতে পারে সময়ের ধারাভাষ্য, ঘটনার বিবরণ নয়।

কিন্তু ষাটের দশকের নব্যরীতির গল্পকারেরা—যাঁরা নিজেদের বলতেন 'শাস্ত্রবিরোধী'—কিছুটা ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন ব্যংলা গল্পের নির্মিতিতে। বিষয়ের দিক থেকে তাঁরাও সেই একই কথা বলেন—যে কথা বলেন নব্য বাস্তব-রীতির গল্পকারেরা। সেই বিচ্ছিন্নতার, বিষাদবোধের কথা—যার মূলে আছে এক নিরাপত্তাহীন, ন্যায়বোধবর্জিত সমাজ। ফলত, কাহিনী-গৌণ, অন্তঃসংলাপময়, আপাত-অবাস্তব আবহ রচনার মধ্যে দিয়ে গল্প নির্মাণ করবার পদ্ধতিও কোনো কোনো লেখক মাঝে মাঝেই অবলম্বন করেন। তাঁদের গল্পে উদ্ভট সব প্রতীক ও চিত্রকল্প স্থান পায়। মৃত মানুষ, মৃত রমণীদেহ, শবযাত্রা, স্বপ্ন, সংকীর্ণ গলিপথ, অন্ধকার, ধোঁয়া, অসুখ, দেহের অস্বস্তি, কিছু যৌনতাময় চিত্রকল্প ইত্যাদির প্রতীকী প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায় এসব গল্পে। তবে স্পষ্ট ও বাস্তব বিবৃতির শৈলীই অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় রীতিটি দু-তিনজন লেখকই নিয়মিত ব্যবহার করেন। তবু আশির দশকেও কোনো কোনো তরুণ লেখক এই রীতিতে নতুন করেও আকৃষ্ট হচ্ছেন দেখতে পাই।

বিদ্রূপ-প্রবণতা সাম্প্রতিক কালের গল্প-ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। সমাজের অসঙ্গতি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রয়োগ হয়ে এসেছে চিরকালই। এই বিদ্রূপ একালের গল্পে কোনো অর্থেই কৌতুকময় নয়, চাপা ক্রোধ ও ঘৃণায় তা ব্যঞ্জনাময়। মহাশ্বেতা দেবীর একাধিক গল্পে এই বিদ্রূপ-ভাষা সূচীমুখ হয়ে উঠেছে। আরো কোনো কোনো গল্পকার আছেন যাঁরা সার্থক।

কথাসাহিত্য বাস্তব রসের কারবারী। অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত নিয়ে তার ভাবনা নেই। যখন অতিপ্রাকৃতের স্থান গল্পে থাকে তখন তা ব্যবহৃত হয় একটি উপায় হিসেবে—উপেয় হয় মানব-মনস্তত্ত্বের অত্যন্ত সত্য সংকট-গুলি। এডগার অ্যালান পো বা রবীন্দ্রনাথ—উভয়ের লেখাই তার প্রমাণ।

আধুনিককালে কিন্তু আপাত-অবাস্তবের আর এক ধরনের প্রয়োগ ঘটে কথাসাহিত্যের রীতিতে। আজ বিশ্বের তাবৎ সাহিত্য-পাঠক পরিচিত 'ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম্' রীতির সঙ্গে। প্রধানত লাতিন আমেরিকার উপন্যাসে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই রচনা-শৈলী প্রতিষ্ঠিত। ধারাবাহিক সংকট-সময়ের আক্রমণে বিপর্যস্ত লাতিন আমেরিকায় লেখকেরা সাহিত্যে নিয়ে এলেন এমন কিছু উপাদান, যাকে সহজ বাস্তব বলা চলে না কিছুতেই। ছায়াময়, আলো-আঁধারি পরিবেশ ; মৃত ও অনুপস্থিত মানুষের কণ্ঠস্বর ও সংলাপ ;

ভৌতিক শহর, গ্রাম, ঘরবাড়ি যা হঠাৎ দেখা দেয়, হঠাৎ যায় মিলিয়ে; অশরীরীর উপস্থিতির আভাস; বীভৎস ও ভয়াবহ কল্পদৃশ্য—এই সব অবাধভাবে মিশে যায় এই রীতির কথাসাহিত্যে। কিন্তু ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্‌-এর মূল রীতিটি হল বাস্তবকেই তুলে ধরা। যতই তাতে ফ্যান্টাসি-র অনুপ্রবেশ থাকুক—সে বাস্তব কঠিন, কুৎসিত, নিষ্ঠুর, শ্বাসরুদ্ধ। এইভাবে অতিপ্রাকৃত উপাদানসমূহ এক জটিল বাস্তবতাকে মূর্ত করবার কাজেই লাগান শিল্পীরা এই কালে। সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের ব্যাপারে এই ম্যাজিক রিয়েলিজ্‌ম্‌-এর প্রসঙ্গটি কিছুটা দূরাগত হলেও একেবারে অদৃশ্য নয়। কোনো কোনো গল্পে আমরা মাঝে মাঝে এমন নিদর্শন পাই যেখানে অলৌকিক ব্যবহৃত হয়েছে গল্প-বিষয়ের উপাদান রূপে, কিন্তু গল্পের মূল লক্ষণ যে ইম্‌প্রেশন্‌ বা প্রতীতি—সেখানে অতিপ্রাকৃত নয়—অত্যন্ত বাস্তবই বিশাল ও গভীর হয়ে ওঠে।

আপাত-অবাস্তবকে যে-লেখকেরা নিবিড় প্রতীকী রীতিকে গল্প-শৈলীতে মিলিয়ে দেন এবং বার করে আনেন বাস্তবেরই ভিন্ন মাত্রা—তাঁদের মধ্যে সুবিমল মিশ্রের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। তাঁর বহু লেখাই আমাদের সামনে আছে। বাস্তব ঘটনা-নির্ভর গল্পরীতির তীব্র প্রতিবাদ তাঁর প্রতিটি রচনা। সমাজ ও ব্যক্তির অবক্ষয়, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপোক্তি ও কল্পনার আশ্চর্য মিলন তাঁর গল্পে। তাঁর সাফল্য সম্পর্কে পাঠক-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক কারণেই মিশ্র ধরনের। সুবিমল মিশ্রের সঙ্গেই অতীন্দ্রিয় পাঠকের নাম করা যায়। কিছুটা বাস্তব গল্প রেখেছেন এবং কিছুটা অবাস্তবতা মিশিয়েছেন এমন লেখকদের মধ্যে আরো আছেন চণ্ডী মণ্ডল। আছেন তরুণতরদের মধ্যে দেবর্ষি সারগী, চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু চক্রবর্তী, সুদর্শন সেনশর্মা, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

তবে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনযাপনে প্রতিদিনের কদর্যতা ও অনিশ্চয়তা প্রতিমুহূর্তেই বড় হয়ে ওঠে না আজও। হয়ত কৃত্রিম কিছুটা, হয়ত জোর করে আনা, কচিৎ নিজেকে ভুলিয়ে রাখারও চেষ্টা—তা আজও মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের মঙ্গলচেতনার সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেননি। বহু নিম্নবিত্ত, অভাবী মানুষও আজও ঐশী করুণায় আস্থাশীল। হয়ত জোর করা নয় সবটা—কিছুটা সত্যও সেই বিশ্বাস। পুরনো সংস্কারবশেই হোক বা চিরকালীন মানবস্বভাব বশতই হোক—মানুষ আজও ছড়িয়ে থাকা রক্ত কিছু কিছু মুছে ফেলতেও চেষ্টা করে। হৃৎকেন্দ্রে ধরে রাখা সেই অমল শুভবোধের প্রতীক রূপেও কখনো কখনো কিছু অ-লৌকিক উপাদান চলে আসে বাংলা গল্পে।

অর্থাৎ গল্প জমাবার কারণে নয়—বাস্তবের নিরাশা ও আশা-কে প্রতীকিত করবার জন্য রীতি হিসেবে আসে অ-লৌকিক প্রয়োগ।

সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের সম্ভার দরিদ্র নয়। আছে যথেষ্ট সম্পন্নতা, আছে বিপুলতর সম্ভাবনা, আছেন শক্তিমান ও নিবেদিত লেখকবৃন্দ। তবে ব্যক্তিমনের অনন্ত বৈচিত্র্যের দিকে কিছু কম দৃষ্টি দিয়ে শ্রেণীগত চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার লক্ষ্যটি ধরে রাখায় এই গল্পসম্ভারকে কিছু একঘেয়ে মনে হয়। প্রায় সব গল্পকারেরই লক্ষ্য সমাজ-বাস্তবতা—সেখানেও বৈচিত্র্যহীনতার সূত্র থেকে গেছে। এসব সমস্যার উত্তরণ ঘটবে তাঁদেরই প্রতিভাবলে। এই গল্প-সম্ভার থেকে নিরপেক্ষ কাল যে নির্বাচন করে নেবে তাতে অবশ্যই থাকবে ভবিষ্যতের জন্য স্মরণীয় শিল্পরূপ। ভবিষ্যৎ কাল জানবে যে এই সৃষ্টি-সম্ভারের জন্ম হয়েছিল এক নির্যাতিত পৃথিবীতে।

সমাজের রূপান্তর ঃ আমাদের কথা

অভিজিৎ মিত্র

গত পঁচিশ বছরে বাঙালীর সমাজে যে রূপান্তর ঘটেছে তাই নিয়ে লেখার কথা। পরিবর্তন এসেছে গোটা সমাজ-জীবনেই, কিন্তু আমি লিখছি শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথা। আমি নিজেও এদেরই একজন, পাঠকও নিশ্চয় তাই। তা হলে বলি, লিখছি আমাদের কথা। নিজেদের কাছে নিজেদেরই কথা।

আমাদের কথাই লিখছি, কারণ সেটুকুই আমার পক্ষে সম্ভব, সেটুকুই আমার অধিকার। আমি কেবল আমাদেরকেই প্রত্যক্ষ ভাবে চিনি, অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি। অন্তত মনে হয় যেন চিনি, মনে হয় যেন জানি। বৃহত্তর সমাজ-সম্বন্ধে আমার সেটুকুও মনে হয় না। আমি যে সেই সমাজেরও একজন, একথা আমি শুধু জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে জানি, জীবন দিয়ে নয়। আমার জীবনবৃত্ত মধ্যবিত্তের সমাজবৃত্তেই সীমাবদ্ধ।

আরো একটি কারণ আছে। সেটিও ব্যক্তিগত। মধ্যবিত্তের জন্য আমার বড় মায়া। কারণ আমাদের মতো এমন হতভাগা আর কেউ নেই। সমাজ নিয়ে আমাদের যা মাথাব্যথা তেমন আর কারো নেই। আর কেউ সমাজ নিয়ে এত ভাবে না, ভেবে কষ্ট পায় না, নিজেকে কষ্ট দেয় না। আমাদের জন্য তাই আমার এই আস্বাদর।

সমাজ নিয়ে কেন যে আমাদের মাথাব্যথা, কেন যে আমরা এত সমাজ সমাজ করি, সেও এক ভাববার বিষয়। বোধহয় নিজেদেরকে শিক্ষিত বলেই মনে করি, তাই এমন করি। ভাবি, সমাজ নিয়ে যাবতীয় চিন্তাভাবনার দায় আমাদেরই, নিত্যনতুন জ্ঞানের আলোকে সমাজের অবস্থা বিচার করে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া আমাদেরই কর্তব্য, আর সেকাজ আমরা ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ভাবনার পিছনে হয়তো অহংবোধই কাজ

করছে। সমাজের পক্ষে আমরা যে খুবই জরুরী, আমাদের ছাড়া সমাজের যে গতি নেই, এ ভেবে গর্ব হওয়ারই কথা। তা ছাড়া সমাজের কাছ থেকে কেবলই নেব, দেব না কিছুই, তেমন আত্মমর্যাদাহীন বান্দা আমরা নই। কিন্তু দেওয়ার মতো আমাদের কীই-বা তেমন আছে, এক সমাজ নিয়েই জ্ঞান দেওয়া ছাড়া? সেই সঙ্গে হয়তো হৃদয়টুকুও ধরে দেওয়া যেত, কিন্তু গোটা সমাজ ধরে যাবে, তেমন বড় হৃদয় আমাদের নেই। আমরা তাই মাথাই ধরে দেই, সমাজচিন্তার দায়িত্ব মাথায় ধরে রাখি। হয়তো তাই আমাদের এত মাথাব্যথা।

সমস্যার আরেকটি দিকও আছে। বাঙালীর সমাজ বলতে যা বোঝায় তা যে মূলত আমাদেরই হাতে গড়া, আমরাই যে সমাজের মধ্যমণি, যাবতীয় পরিবর্তনের কর্ণধার, রূপান্তরিত রূপের মডেল, আমাদের রূপই সমাজস্বরূপ এমন একটি বদ্ধমূল ধারণাও আমাদের আছে। ফলে আমরা যে কি হয়েছি আর হইনি, কি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হতে পারিনি, তা নিয়েও আমাদের মাথাব্যথা আত্মসমালোচনা আত্মপীড়নেরও অবধি নেই।

এসবই বোধহয় আমাদের বাড়াবাড়ির ফল। সমাজ নিয়েও বাড়াবাড়ি, নিজেদের নিয়েও বাড়াবাড়ি। হয়তো দ্বিতীয়টিই আসল, তারই অছিলায় প্রথম। আমাদের আত্মপীড়নও আত্মপ্রেমের শামিল। আমরা প্রেম করতেও জানি না, আমাদের প্রেম অসুস্থ, মর্বিড।

কিন্তু রোগের কারণ জানলেই যন্ত্রণার উপশম হয় না, বরং নিজেই যে রোগের কারণ, তা জেনে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই-ই হয়। তবু আমরা ভাঙি তো মচকাই না। বলি, আমরা জেনেশুনেই বিষ করেছি পান, কিন্তু কী আর করা যাবে এ তো আমাদের জন্মগত বংশগত রোগ। জন্ম থেকেই মধ্যবিত্তের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এমনটিই করে আসছে, তাদের এই কীর্তিই তো বঙ্গ সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম-ঐতিহ্য। আমরা এমনি হতভাগা। আমাদের জন্য আমার তাই এত মায়া। লিখছিও তাই আমাদেরই কথা।

পাঠক আমার দোসর, আমারই অনুরূপ, অনুমান করতে পারি তিনি কি ভাবছেন। ভাবছেন আমি দুই দশক পিছিয়ে গেছি, পিছে ফিরে দেখছি, তাই আমার এই মায়া। ঠিক তাই। পরিবর্তন এসেছে, আসছে। আমরা অনেক বদলে গেছি, যাচ্ছি। অবস্থার রদবদলে কামনার রঙ বদলে একই মানুষ একই জন্মে নানাবার জন্মায়, আমাদেরও হয়েছে নবজন্ম। এরই

মোহে আমার ঐ মায়া। কেন এই মোহ, কি আছে নবরূপে, সেই কথাই আমার বলার কথা। বলার কথা আমাদের নয়া জামানার কথা, নবজীবনের কথা। এখন সেই কথাই আমাদের কথা।

জীবন এখন যেরকম, তাতে মনে হয় আমরা সেই মর্বিড হতভাগা মধ্যবিত্ত আর নই। সবাই যে তেমন ছিলেন তা নিশ্চয় নয়, তবে অন্তত হাবে-ভাবে অনেকেই ছিলেন। এখনও আছেন কেউ কেউ, কিন্তু তাদের সংখ্যা হাতে কেন, আঙুলেই গোনা যায়। আমাদের বেশির ভাগই এখন অনেক সুস্থ, স্বাভাবিক। এবং বিচক্ষণ। আমরা বুঝে ফেলেছি সমাজ নিয়ে অত লাফালাফি করে লাভ নেই। অর্থনীতি আর রাজনীতি তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে, আমাদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে, লাফ দিলেও তার নাগাল মিলবে না। বস্তুত, এখন সমাজ বলে কোনো বস্তুই আর নেই। আছে রাজার, আছে সরকার আর তার আগে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে কতকগুলি রাজনৈতিক দল-উপদল। সমাজনীতি বলেও আলাদা করে কিছু নেই, আছে কেবল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কিছু রীতিনীতি। বাজার আর রাজার কথাই শুনে চলা ভালো। তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি। আমরাও এখন তাই-ই চাই, চাই সুখ, তার পরে শান্তি। সুখের সন্ধানই নতুন জীবনানুসন্ধান।

সুখ কে না চায়। আমরাও চিরকাল চেয়েছি। কিন্তু আগের চাওয়ায় সুখের সঙ্গে নারীর সহজাত লজ্জার মতো একটু দুঃখের মিশেলও চলত। বিউটিস্পট বলে মেনে না নিলেও একেবারে না থাকলে যে ভালো দেখায় না, কোথায় যেন লাবণ্যের অভাব, এমন একটা ভাব অন্তত ছিল। এখন আর তা নয়। আমাদের রূপবোধ পাল্টে গেছে ; চাই নিখুঁৎ সুন্দর, একটু উগ্র হওয়াই ভালো, লোকের দৃষ্টি কাড়ে, সম্ভ্রম জাগে। আমরা চাই সর্বাঙ্গীণ সুখ, নির্ভেজাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ, আগ্রাসী সুখ।

আমাদের মনোমত সুখ মনোময় নয়, তনুময়। আমাদের দেহ এখন শুধু মনের আধার নয়, দেহাধারই মন। দেহের সুখেই আমাদের সুখ। সুখ অর্থে সম্ভোগ। সম্ভোগের সামগ্রীসন্ধানই সুখানুসন্ধান।

সন্ধান সহজেই মেলে, বাজারী বিজ্ঞাপনই জানান দিয়ে দেয়। নিত্যনতুন ভোগ্য দ্রব্যের মনমাতানো বিজ্ঞাপন। তাতে ভোগ্যদ্রব্যের সাথে অপরূপ দেহধারী ভাগ্যবান ভাগ্যবতী ভোগীরাও সব আছে, আকারে-প্রকারে মিলে-

মিশে সব একাকার হয়ে আছে। আমরা বুঝতে পারি, ভোগ্যবস্তু শুধুমাত্র দেহের ভোগের বস্তুই নয়,নিজেও এক দেহাধার কি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা দিয়েই ভোগ উপভোগ। অতএব অপরিহার্য, বস্তুকে বাদ দিলে দেহও বরবাদ হয়ে যায়। এও বুঝি, দেহাধার শুধু ভোগের মাধ্যমই নয়, নিজেও সম্ভোগেরই বস্তু। বুঝে শুনে দেহসর্বস্ব, মন আমাদের মেতে ওঠে, দেহবাদ বস্তুবাদ এক হয়ে যায়। দেহ আর মনে কোন ভেদ নেই, দেহ আর বস্তুতে কোনো বিভেদ নেই, আমরা এখন অদ্বৈতবাদী।

এ অদ্বৈতবাদ যে সর্ব্বৈব নতুন, তা নয়। কোনোকালেই আমরা সনাতনী আধ্যাত্মিকতায় আত্মহারা হইনি। কিন্তু আমাদের দেহবাদ বস্তুবাদ নিয়ে একটু চক্ষুলজ্জাও ছিল। কিঞ্চিৎ অধ্যাত্মবাদের আবরণ দিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টাও আমরা করতাম। এখন তার আর কোনো প্রয়োজন নেই, লজ্জা শরমের বালাই-ই আর নেই। কারণ আমরা মন দিয়ে দেখি না, চোখ দিয়ে দেখি, চোখে লাগলে চোখ উল্টে থাকি। সুখের লাগি বস্তুর উপাচারে তন্ত্রের উপাসনায় আমাদের সঙ্কোচ বলে আর কিছু নেই। ফিরিকরা সুখের তন্ত্রে আমরা নির্দ্বিধায় ঘুরিফিরি।

দেহের মতো ব্যক্তিগত আর কিছু নেই,বস্তুওদেহস্বরূপ,আমাদের দেহবাদী বস্তুবাদী সুখ তাই আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য। আপনাকে বাদ দিয়ে আত্মজ আত্মজা আর অর্ধাঙ্গিনীর বাইরে আমরা আর কারো সুখের কথা ভাবতেই পারি না। সুখী পরিবারের পরিসর বড়ই ছোট, আত্মীয় পরিজন এমনকি বুড়ো বাপ মায়েরও সেখানে ঠাঁই হয় না। যৌথ পরিবার অনেকদিনই ভেঙেছে, কিন্তু দু-দশক আগেও জ্যাঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো মাসতুতো মামাতোদের জন্য একটু আধটু মন কেমন করত, দুর্ভাবনা হতো। এখন আর তা হয় না। নিমন্ত্রিত হলে বিবাহানুষ্ঠানে, খবর দিলে খবর পেলে হাসপাতাল নার্সিংহোম বা নিমতলা কেওড়াতলায় গিয়ে একবার দাঁড়াই ঠিকই, কিন্তু ঐ দাঁড়িয়েই থাকি, যেন অপরিচিতদের মধ্যে এসে পড়েছি, সৌজন্যমূলক দু'চার কথা সেরে সরে পড়াই শ্রেয়। অথবা, আত্মীয়তার আঁশটুকুও যে আর নেই আদিখ্যেতা দেখিয়ে তা ঢাকবার চেষ্টা করি। ছোট পরিবারের আমরা সবাই এখন শুধু নিজেদের দুঃখেই দুঃখী, নিজেদের সুখেই সুখী। এই আপনি-কোপনি সুখও কিন্তু সহজলভ্য নয়। পথে অনেক বাধা অনেক লড়াই। দেহ যে দেহ তাকে নিয়েও কি কম ঝামেলা। প্রকৃতির নিয়মে কালের পরশে ক্ষয় তার অনিবার্য, অথচ তাকে ঠিক রাখতে হবে ফিট রাখতে হবে, বয়স

বাড়লেও যেন মনে হয় এখনও ভরা যৌবন। যৌবনই তো দেহাধারীর আদর্শ : যথেচ্ছ সম্ভোগ যৌবনেই সম্ভব, যুবদেহই আকর্ষণীয়, উপভোগ্য। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কালের সাথে পাঞ্জাকষা, চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা এখন তাই খুবই শরীর সচেতন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখা উচিত এই সাদামাটা কথা আগেও আমরা জানতুম, কিন্তু তেমন মানতুম না। ভাবতাম কথাটা খাটো মাথার খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে যতটা খাটে আমাদের ক্ষেত্রে ততটা নয়, মাথার কাজ যারা করে তাঁদের একটু দুবলা হলেও চলে. বস্তুত মাথা নিয়ে ব্যস্ত মানুষের ফেটে পড়া স্বাস্থ্য তেমন মানায় না! শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা তাই একটু উদাসীনই ছিলাম। বিশেষ করে ছেলেরা। মেয়েদের কথা আলাদা, তাদের স্বাস্থ্যই সম্পদ, স্বাস্থ্যহীন ছেলেদের দেখাশোনার কাজেও তা লাগে। নারী-পুরুষে সেই পার্থক্য আর নেই, একই কালে একই সাজে দু'জনে হাত ধরাধরি করে চলি, ক্যালরি মেপে খাই, বিউটি পার্লারে যাই, যোগ ব্যায়াম করি। উদ্দেশ্য দুজনেরই এক—হতে হবে বিজ্ঞাপনের ঐ রূপবান রূপবতী, স্লিম স্মার্ট অলওয়েজ ফ্রেস। দীর্ঘ যৌবন, সুদীর্ঘ সুখ।

যৌবন কলকাতার শীতের মতন, কেবলই যাই যাই করে; কামিনী স্বভাবাও বটে, সঙ্গীর শারীরিক কৃচ্ছ্রতেই সে তৃপ্ত নয়, কাঞ্চনমূল্যও ধরে দিতে হয়। ভোগ্যবস্তুর বাজারও বড় চড়া, ক্রমেই চড়ছে। সুতরাং চাই অর্থ, অঢেল অর্থ। অর্থসংগ্রহের সংগ্রামই প্রকৃত সংগ্রাম, প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়েও বড়। কে না তা জানে। আমরাও জানতাম, কিন্তু এখনকার মতো এমন মর্মান্তিক ভাবে নয়। বাজার কোনোকালেই আমাদের বাধ্য নয়, কিন্তু এমন অবাধ্য হতে আগে কখনো দেখিনি। একের রোজগারে সামলানো অসম্ভব, দুয়ের রোজগার চাই। শুধু ডান হাতের নয়, বাঁ হাতেরও চাই। সব্যসাচী না হলে চলেই না। বাজার আমাদের দুনম্বরি করে ছেড়েছে। আমরাও সুখের মুখ চেয়ে নিজেদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের মতো। আগেকার কোনরকম গোঁড়ামিই আমাদের আর নেই। শিক্ষাদীক্ষা, ভালোমন্দ, সৎ অসৎ, সামাজিক অসামাজিক, এসব নিয়ে আমাদের সাবেকী অন্তর্দ্বন্দ্ব একেবারে ঘুচে গেছে। উন্মুক্ত বাজারের যুক্তি মেনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা এখন সব মুক্ত পুরুষ।

আমরা এখন মানি শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন নয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন নয়, সামাজিকতা মানবিকতায় দীক্ষিত হওয়া নয়, এমনকি সমন্বিত

জ্ঞানানুসন্ধানও নয়। শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের জন্যই শিক্ষা, বাজারের সরকারী বেসরকারী সব বড় বড় ফড়েদের ফরমাইসি ফরমূলা-মাফিক জ্ঞানের জোগান দেওয়াই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাতেই তার মান তাতেই তার সম্মান। উচুদরের সাম্মানিকের আশায় আমরা সবাই এখন এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে চাই, পরবর্তী প্রজন্মকে গ্রহণ করতে বলি। বলি না ভালো মানুষ হও, চরিত্রবান হও, পরোপকারী হও, দেশব্রতী হও, হৃদয়বান হও।

ভালো মানুষ হতে আমরা কেউ চাইনে, কারণ তাকে পাত্তা দেয় না কেউ, ভাবে নির্বোধ নির্বীর্য, তাকে দিয়ে কিস্যু হয় না। গল্পের নায়ক হওয়ারও যোগ্যতা তার নেই। এখন যে হিন্দী ফিল্ম, তারও হিরোরা অবধি থ্রী-ফোর্থ ভিলেইন। যুগটাই ভিলেইনদের, নানা জাতের নানা ছাঁদের নানা ছলের ভুঁধে ভিলেইন, তাদের সঙ্গে লড়তে গেলে ভিলেইন হয়েই লড়তে হয়।

চরিত্রবানেরও একই দশা। সেও মাদামারা, থামুসআপেরও ঝাঁজটুকু নেই। মেজাজও আসে না, পেটও ভরে না, চরিত্র-ধোয়া জল দিয়ে হবেটা কী। মানুষ বিচারের মাপকাঠি এখন বড়ই বেহায়া, চরিত্রহীন শুধু নয় তা নিয়ে আবার বড়াই করে। বলে, কাজের মানুষের আবার চরিত্র কি, কর্ম-দক্ষতাই চরিত্র। কাজ বলতে সেই কাজ বাজারে যার কদর আছে, যে কাজে বেশ পয়সা আছে, সম্মান আছে। চরিত্র নিয়ে আমরা তাই আর চুকলিও কাটি না, ক্লান্তি কাটাতে মাঝে মধ্যে চুটকি ছাড়ি এই অবধি।

পরোপকার? অপরের ব্যাপারে নাক না গলালেই ভালো। যার ব্যাপার সেই বুঝুক, যার লড়াই সেই লড়ুক। গণতন্ত্র সেই কথাই বলে, সেই অধিকারও দিয়েছে। অধিকার যেমন আদায় করে নিতে হয়, অধিকার তেমনি আদায়েরও অস্ত্র। এক অধিকার থেকে আরেক অধিকার, এক সুযোগ থেকে আরেক সুবিধে। সুযোগ-সুবিধে সহজে মেলে না, একের সুবিধা মানে অন্যের অসুবিধা। সুতরাং অনধিকারচর্চা শুধু যে অগণতান্ত্রিক তাই নয়, খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। আর দেশ-দশের কাজ? সরকার আছে কিসের জন্য, পার্টি আছে কি করতে। দেশ-দিকভালের জন্যই না ওদের পোষা হচ্ছে, মাথায় তোলা হচ্ছে, আমরা সব সহ্য করে নিচ্ছি।

হৃদয়বান হয়েও বা কী লাভ? বস্তুতান্ত্রিক মন আমাদের, বস্তু আর তন্ত্র দিয়েই তাকে জয় করতে হয়, নিছক হৃদয় দিয়ে নয়। সুতরাং হৃদয়চর্চার চেয়ে বস্তু সংগ্রহের দিকেই মন দেওয়া ভালো, শরীরচর্চার দিকেই নজর দেওয়া

ভালো। সবচেয়ে ভালো এমন কিছু করা যা দিয়ে রোজগার করা যায়, রোজগার বাড়ানো যায়, তা হলেই সব হয়। হৃদয় টিদয় নয়, বরং সেই কাজেতেই এখন আমাদের মন। তবে এই কাজেতেও হৃদয় কাজে লাগে। কাজের জন্য মিলতে মিশতে হয়, কখন যে কাকে দিয়ে আখের গোছানো যায় তার ঠিক কি! কিন্তু যার যার তার তার এই নিয়মেই সব চলছে, নিজে থেকে কেউ এগোবে না, টোপ ফেলে টেনে আনতে হবে। আনতে হবে এই আশ্বাস দিয়ে যে—সেও কিছু পাবে, তারও লাভ আছে। তবে যার যার তার তার বলে টুপি পরার ভয়ে সবাই সদা সন্দিগ্ধ, সদাই সন্ত্রস্ত। মুরগী খেতে ভালোবাসি কিন্তু কেউ কারো মুরগী হতে চাই না। তাই আশ্বাসে বিশ্বাস আনতে হবে; এই কাজেই হৃদয় কাজে লাগে। হৃদয়হীন বলে বস্তুতান্ত্রিক মনও গোপনে গোপনে হৃদয়েরও কাঙাল। হৃদয়ভার সে চায় না, বইবার শক্তি তার নেই, কিন্তু মাঝে মধ্যে একটু আধটু পরশ পেতে চায়। অচেনা অজানা বলে হৃদয় তার কাছে জটিল রহস্যময়, ভয়েরই ব্যাপার, কিন্তু ভূতের গল্প কি রহস্যকাহিনীর রোমান্স-টুকুও সে চায়; উদাস হওয়ার ভয়ে এক গণ্ডুষ হলেই আকাশ দেখতে চায়, ডুবে যাওয়ার ভয়ে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ খোঁজে। তাই কিছু হৃদয়চর্চা আমাদের করতেই হয়। ধরে দেওয়া ধরা দেওয়া ওসব কিছু নয়, কেবল কাজের খাতিরে যতটুকু লাগে। অতিরিক্তপনা আমাদের নেই, আখেরের খোঁজে যেমন তক্কে তক্কে থাকি তেমনি হিসেব করেও চলি: কি দিলাম আর কি পেলাম, কতটুকু দিলাম আর কতটুকু পেলাম, কার হলো জিৎ কার হলো হার। হেরে যাওয়ার আশঙ্কা যদি থাকে, সামান্য সংকেতও যদি পাই তো চট করে সরে আসি। হৃদয় ধরে দিলে হৃদয়ে ধরা দিলে তা আর হয় না। আমরা ও-সবে নেই। গভীর কোনো সম্পর্ক নয়, আমরা হাল্কা পায়ে হাল্কা চালে চলতে ফিরতে চাই। সুখের সাধনায় যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

ব্যাঘাত কিছু ঘটছেওনা। বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতার মতো দেখা-সাক্ষাৎ, রাজনীতির দাদাদের নির্বাচনী বক্তৃতার মতো কথোপকথন, নাগর-পতিতার মতো হৃদয়ের লেনদেন, এ সবে আর কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। অভ্যেস হয়ে গেছে। সুখের মোহে এই মায়াময় সম্পর্কের জগৎকেই আমরা ইতিমধ্যে ধ্রুব সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি।

ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মোটা রোজগার তো বটেই, মোটামুটিরও তেমন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষাব্যবস্থারও একই অবস্থা। শিক্ষার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু অর্থকরী বিদ্যার যথাযথ জ্ঞানাগারে প্রবেশা-

ধিকার সকলের নেই। খোলা আছে বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাঝারিও নয় কেবল সমুচ্চাসীন মুষ্টিমেয় কৃতী প্রার্থীদের জন্য। অকৃতকার্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সুখ তারাও চায় কিন্তু টিকিটি দেখতে পায় না, পাবেও না কোনো দিন। বড়ই করুণ তাদের অবস্থা। দেখবার তাদের কেউ নাই। মানুষ বলেই গণ্য করে না কেউ। যথার্থ কৃতীর সংখ্যা চিরকালই কম, কিন্তু আগে মাঝারিদেরও মোটামুটি জায়গা হয়ে যেত। অসফল হলেও সবাই এমন হেয় হয়ে যেত না, হীনমন্যতায় ভুগত না। পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের দুঃখের কারণ হয়েও তারা টিকে থাকতে পারত। এমনকি একটু ভালো মানুষ গোছের হলে, পরোপকারী হলে, দেশের কাজে থাকলে, চরিত্র ঠিক থাকলে এক রকমের প্রশ্রয়ও পেত, বিশেষ করে চিরন্তনী দয়া-ময়ীদের কাছে। ওঁরা ভাবতেন : হতো, এদেরও হতো কিন্তু অন্যরকম মানুষ বলেই হলো না ; এরাও ভাবত : হতো, আমাদেরও হতো, অন্যরকম মানুষ বলেই হলাম না, যেন ব্যতিক্রম হওয়াটাও এক রকমের হওয়া এবং কম গৌরবের নয়। এখন ব্যতিক্রম হলে আর রক্ষে নেই, একেবারেই বখে যেতে হবে, হতে হবে—তাও অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে—পাড়ার পার্টিবসেদের অধস্তন চামচা কিংবা সরাসরি সাদা পোশাকী সমাজ-বিরোধী, অন্ধকারের বাদুড় চামচিকে। নতুবা বিষ খেতে হবে।

সেদিক থেকে বড়ই বিষময় দুঃসময় এসময়। সমাজের খুব অসুখ। সিরোসিস অফ হার্টে ভুগছে। সত্তরের দশকেও তার নারীসুলভ হৃদয়ের যে তলানিটুকু অবশিষ্ট ছিল, আশির মাঝে এসে অবকাশের অভাবে অনুশীলনের অভাবে দুমড়ে মুচড়ে কুঁচকে মুচকে এতটুকুন হয়ে গেছে, স্টেথো দিয়েও তার ধুকপুকুনি শোনা যায় কি যায় না। সেই দয়াময়ীরাও উধাও। যে সানন্দা মনোরমারা বাজার আলো করে আছে, তাদের হৃদয়দুয়ার ঝড়বৃষ্টির রাতেও হাজার করাঘাতেও উন্মার্গের জন্য খুলবে না, উলুবনে পরকীয়া চর্চা করার মতো উদ্বৃত্ত করুণা তাদের নেই। খুকুর পরে রাগ করে লাভ নেই। বড়রাই তার ভালোর জন্য তাকে যুগোপযোগী শিক্ষা দিয়ে এমনটি বড় করেছে। কিন্তু নারীও যদি নিষ্করুণ হয়, নিঠুর হতে সমাজের আর একেবারেই বাধে না। মরূদ্যান বলে সমাজে আর কিছু থাকে না, সবটাই মরুভূমি হয়ে যায়।

তবে আমাদের তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। হৃদয় শুকিয়ে যায় যাক সুখ পেলেই হলো, সমাজের বারোটা বাজে বাজুক আমারটা হলেই হলো, এমনি আমাদের মনোভাব। তাই পরিবর্তনকে নতুন খাতে প্রবাহিত করার কোনো

প্রচেষ্টা আমাদের নেই, চিন্তাভাবনাও নেই। যে কৃতী সে কেন করবে, অনেক কষ্ট করে সে কেষ্ট পেয়েছে, যে পায়নি তার কথা সে কেন ভাববে। বরং ভাববে, তার ক্যালি ছিল না বলেই পায়নি, যার ক্যালি নেই তার না পাওয়ারই কথা। যে পায়নি সেও পরিবর্তন চায় না, তার অবস্থার পরিবর্তন চায়, সুখের পথ সুগম করতে চায়, কিন্তু এই সুখের রূপান্তর চায় না। দেহগত বস্তুগত সুখের তামলি আস্বাদ, একান্ত ব্যক্তিগত সুখের এমনি আবেদন।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমন সুখের সাধনা অধুনা পশ্চিমী দুনিয়াতেও চলছে, বস্তুত সারা বিশ্বে। আমরাও আধুনিক হচ্ছি।

পশ্চিমী কায়দায় আধুনিক হওয়ার ইচ্ছে আমাদের অনেকদিনের, সেই ইংরেজ আমল থেকে। ইংরেজের হাতে আমাদের জন্ম, স্বভাবতই ইংরেজ হতেই চেয়েছি। সবটা সম্ভব হয়নি, কারণ পরাধীনতার অহমিকাবশে দেশের আদি বা সনাতনী সংস্কৃতিরও কিছুটা আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে, ফলে কতটা সাহেব হবো আর কতটা দেশী হবো এই নিয়ে আমাদের অন্তরে একটা টানাপোড়েন ছিল। ইংরেজ চলে যাওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পরেও ছিল এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। স্তিমিত হয়ে এলেও ছিল। এখন আর নেই। ইতিমধ্যে আমরা সাহেব বদলেছি, ইংরেজের জায়গায় ইয়াঙ্কি। বদলাবার তেমন কিছু ছিল না, কারণ তদ্দিনে ইংরেজও ডলারের প্রয়োজনে আমেরিকান হয়ে গেছে। মার্কিনীদের দেখে আমাদের মনে সাহস এসেছে, মানতে পেরেছি সনাতনকে ধরে রাখার কোনো মানে নেই, সর্বাঙ্গীণ আধুনিক হওয়াটাই সভ্যতা-সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আধুনিক হয়েও ইংরেজদেরও ছিল তাদের আদি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য। পুরনো একটা সমাজ ছিল বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী হয়েও সমষ্টি নিয়ে কিছু নৈতিক দুর্ভাবনাও তাদের ছিল। তাদের দেখেও হয়তো সাহেব হয়েও দেশী হতে, সনাতনী সামাজিকতার কিছুটা মেনে নিতে আমাদের বাধেনি। কিন্তু ইয়াঙ্কিদের আদি ইতি বলে কিছু নেই, তাদের সমাজ গোড়া থেকেই নতুন, আগাগোড়া বাজারের আদলে গড়া। আধুনিকতায় আবিষ্ট তাদের মন, এক আধুনিকতা থেকে আরেক আধুনিকতায় পৌঁছানোই তাদের জীবনের গতি। প্রকৃত পুঁজিবাদের যা ধর্ম: নিত্যনতুন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন, নিত্যনতুন ভোগাসক্তি। আমেরিকানদের মতো খাঁটি পুঁজিবাদী আর কেউ নয়। ওরা এখন যেভাবে চলছে, অধুনা যা চায়, তার চেয়ে আধুনিক আর কিছু নেই। আমরা এখন তেমনটিই হতে চাই।

টানাপোড়েন নেই বলে বহুকালের অবদমিত ভোগের ভৈরবকে জাগিয়ে তুলতে, প্রকাশ্যে তুলে ধরতে আমাদের আর বাধে না।

আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিশ্চয় আমেরিকার মতো নয়, তুলনা করাও হাস্যকর। কিন্তু তাতে সুখের ধারণা ধার করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। চিরকালই আমরা ধার করা ধারণা সামনে রেখেই এগিয়েছি, কখন কোন অবস্থায় আছি তার তোয়াক্কা করিনি। আজও তাই।

তৎসত্ত্বেও বলব, আমাদের এই সুখের সাধনা নিছক নকলনবিশী নয়, বর্তমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কিছু যোগ তার আছে। আমাদের গণতন্ত্র ব্যক্তিকে স্বীকার করে, কিন্তু একমাত্র ভোটাভুটির সময় ছাড়া একেবারে নৈর্ব্যক্তিকভাবে। জনগণের মুখ চেয়ে ভোটও মোটে একটি। জনগণের চাপে প্রতিজন তাই প্রতিনিয়তই নাচার। আমাদের সমাজতন্ত্রেও রয়েছে সমষ্টির ওপর জোর। ব্যষ্টির হৃদয়ে যেন গায়ের জোরে চেপে আছে। সমষ্টি-সম্বন্ধীয় চিন্তায় ব্যক্তি-মানুষের রক্ত-মাংসের ছিটে-ফোঁটাও নেই। রক্ত-মাংসে বিশ্বাসও যেন নেই, নিরস নিরক্ত নিরামিষ জীবনযাত্রাই তার আদর্শ। সেটুকু উপকরণও সমানভাবে বণ্টন করার অর্থনৈতিক ক্ষমতাও আমাদের সমাজতন্ত্রের নেই। এমন কোণঠাসা দেহধারী ব্যক্তি কি এর ওপরেও সনাতনী সামাজিকতা আধ্যাত্মিকতার বোঝা সইতে পারে? অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাই আমরা এখন অপরের কথা না ভেবে সমাজের কথা না ভেবে মরিয়া হয়ে যে-যার সুখের কথাই ভাবি, উপেক্ষিত অবহেলিত উপোসী দেহটাকেও প্রকট করে তুলি। মনে মনে ভাবি, বেশ করি। আমাদের সুখের সাধনাও এক প্রকার বিদ্রোহ। সনাতনকে তো মানিই না, গণতন্ত্রও মানতে চাই না, সমাজতন্ত্রও না। তার চেয়েও বৈপ্লবিক আমাদের আধুনিকতা। এই বিপ্লবের কথাই আমাদের রূপান্তরের কথা।

রূপান্তরিত সুখী মানুষের চেহারা দেখে, তার সুখের বহর দেখে আমারও দেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভাবি, আগেকার সেই হতভাগাদের কথা। কত কিছুই তারা পেলে না জীবনে, অথচ জীবন তো একটা বই দুটো নয়। মায়া হয় তাদের জন্য। আবার যখন এখনকার হেরো-পার্টিদের দেখি, তাদের দুরবস্থা দেখি, দুঃখের বহর দেখি, তখনও মন আমার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভাবি আগের দিন হলে এদেরও কোনো-না-কোনো গতি হয়ে যেত, কিন্তু এখন

আর তা হবার নয়। কিছুই পেলে না, কিছুই পাবে না এরা এ জীবনে, অথচ জীবন তো একটা বই দুটো নয়। মায়া হয় এদেরও জন্য।

মায়াবশতই লিখলাম আমাদের কথা। নিজেদের কাছে নিজেদেরই সুখ-দুঃখের কথা।

কথা তো পারাপারের খেয়া নৌকো, পার হতে পারলাম, কিনা কি জানি। নিজেদের মধ্যেও তো কত ব্যবধান, ধূ-ধূ করে।

'ওগো, এই সেই শস্যফলনের হাসি'

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কয়েকমাস আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ছেলেমেয়েরা এক ফরাশপাতা ঘরে কবিসভা করেছিল। আমরা তিন-চার জন বয়স্ক কবি-কবিনী ছাড়া আর সব কবিই ছিল তরুণ-তরুণী। বলা বাহুল্য, কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাও ছিলেন রিমোট কণ্ট্রোলার হিশেবে।

এর মুখ থেকে ওর মুখ—কবিতা পড়া যখন ঘণ্টা দেড়েক এগিয়ে গেছে, একটি সদ্য তরুণ, বড় বড় চোখ, কৃশ, লম্বাটে চেহারা, খানিকটা অনির্ভরযোগ্য গলায় পড়তে লাগল—

"আর আমি, এমনই হতভাগ্য, আমি এক কীটনাশক শীতলাথানের
সেবাইৎ হয়ে জন্মেছি
আমার বাড়িতে সারাদিন খিটির মিটির লেগে আছে
সারাবছর কুচুর্কুরে কুটুমেরা আসছে যাচ্ছে
তাদের কথায় নেচে কুঁদে আমাকে অস্থির করে তুলছে আমার বউ
সারাটাদিন কাজ নেই, কর্ম নেই হ্যা হ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে
দামড়া দামড়া মেয়েরা
এইসব মেয়েরা সংসারের সৃষ্টি স্থিতি আর বিনাশের রহস্য বোঝে না
তাই এত লম্ফঝম্ফ, ভগবান করুন, এদের দু-ভুরুর মাঝখানে
একদিন সূর্য উঠুক
এদের কোলে প্যাঁক প্যাঁক করে উঠুক লালা ধোলা নানারঙের
পাঁতিহাস।"

গ্রামবাংলার গারগানতুয়ান অথচ অসম বিকাশের বোলবোলাও-এর পর্বে অপারেশন বর্গা-র মল্লভূমিতে দাঁড়িয়ে 'গ্রাম জগুদাসবাড় পোস্টাপিস মারশদা জেলা মেদ্নিপুর' থেকে কলকাতায় আসা একটি তরুণ 'এতরকম কাজলামি ইয়ার্কির' মধ্যেও হ্যাজাক জ্বালিয়ে পঞ্চায়েতের মিটিং, তার গ্রামের দিকে

মুখ করে কলকাতার লোকজনের সন্দেহজনক ভাবে পেচ্ছাপ করা, 'অলৌকিক তাঁতকলের হেঁচকি', বিদ্যুৎ নয় বাক্‌বিদ্যুতের হাসিতে ঝলসানো গ্রাম আর তার কলকাতার বন্ধুরা যাকে বলে 'পবিত্র সংকট'—এই সব কিছু গোয়েন্দার মত লক্ষ্য করছে, শুনছে। এই সব দেখা-শোনাকে যে কবিতার নোটবইয়ে টুকে রেখেছে ঐ তরুণটি, অর্থাৎ বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, সেই বইটির নাম 'শস্যফলনের হাসি'। মনে রাখতে হবে, বিদ্যুৎ নয় বাক্‌বিদ্যুৎ, শস্যফলন নয় শস্যফলনের হাসি—এ হাসি 'স্মাইল' নয়, 'লাফ'।

কেন এই সবকিছুকে নিগেট্ করা, এই সার্বিক অবিশ্বাস? একদিকে নব্বুই কোটি দিশেহারা মানুষের ভারতবর্ষ, অন্যদিকে স্যাম পিত্রোদা-মার্কা গরীয়ান, বরীয়ানের মাছবাছা নিদান—তারই মাঝখান দিয়ে হাটতে হাটতে আড়াইটি দশক সমাজতাত্ত্বিক কারণেই জন্ম দিয়েছে নতুন যদুবংশের। খুব মনে পড়ে যাচ্ছে রাজীব গান্ধী-মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী সদস্য বসন্ত শাঠে-র একটি মন্তব্য—"আপনার কাছে পাঁচটি রুটি আছে। আপনার সন্তানও পাঁচটি। সবাইকে একখানা ক'রে রুটি বেঁটে দিলে শেষমেশ অপুষ্টিজনিত কারণে একজনও বাঁচবে না। তাই অন্তত একজনকে ভালোভাবে বাঁচানোর জন্য তাকেই পাঁচটি রুটি দিতে হবে।"

এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের ফল এত আশাতীত হবে, এর প্রণেতারাও সম্ভবত ভাবতে পারেন নি। অবশ্য এ-বাস্তবতার উর্দ্ধরেখ-গতিকে আংকিক নয়, জ্যামিতিক আবেগে নভোচারী করেছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন এবং আই এম এফ-বিশ্বব্যাংকের হাড়িকাঠে ভারতীয় সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের সফল বলিদান। আর এই হত্যাকাণ্ডই হল তরুণ ও তরুণতর প্রজন্মের ভারতীয়দের পুঞ্জীভূত হতাশা ও ক্ষোভের কুঁজবাহী উটের পেছনে শেষ খড়, যা যে-কোনো ধরণের আদর্শ আঁকড়ে থাকার শেষ আব্রুটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

আড়াইটি দশকের এই ক্রম-ঘন, ক্রম-বর্ধমান অন্ধকারে জীবনের ওপরতলার সৌধ শিল্প ও কবিতাকে লালন করার 'কঠিন সবিতাব্রত' কি বাঙালী কবিরা পালন করেন নি? করেননি মৃত্যুর আগেও 'আর এক আরম্ভের জন্য' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'শুধু রাতের শব্দ নয়' থেকে 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' হেঁটে আসা অরুণ মিত্র, 'আয়না-আঁটা সপ্ততলা'-র সিদ্ধেশ্বর সেন, 'বাবরের প্রার্থনা' থেকে 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'-র শঙ্খ ঘোষ, এমনকি 'গান্ধীনগরে রাত্রি'-র উষালগ্নকামী মণিভূষণ ভট্টাচার্য? শিল্প ও জীবনের

অন্বয়ের বিরুদ্ধ-সমন্বের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শান্তিবহনের কোনো দীপ্তিই কি ছিল না ষাটের দশকের এক প্রধান কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিযুক্তির স্বেদ-রক্ত' ও 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি', সত্তর দশকের রণজিৎ দাশ-এর 'আমাদের লাজুক কবিতা' এবং 'মাতা ও মৃত্তিকা'র স্তবে মুখর অমিতাভ গুপ্ত-র উচ্চারণে ? ছিল না অকাল-প্রয়াত অনন্য রায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'আলোর অপেরায় মহাজাগতিক থেকে আন্তর্জাতিক চৈতন্য, বিজ্ঞান ও বৌদ্ধিক জটিলতার বিচিত্র রসায়নে ?

২.

তবু কেন, আশা ও আদর্শের দুই ডানায় উড্ডীন গত সাড়ে পাঁচ দশক যাঁর কবিতা, সেই মণীন্দ্র রায়-কে ১৯৯১-এর অন্তিমে এসে স্বীকার করতে হয়, 'এদেশে এসেছে নেমে স্বপ্নের আকাল' ? একই সময়ে প্রবীণ রাম বসু উদ্গীরণ করেন পরম ঘৃণা, "চণ্ডালিনী আগুনের শিখা চেরা জিভে যেন চেটে নেবে / কোটি কোটি কৃমিকীট শ্বাপদ শেয়াল,—যারা / প্রথাগত ভাবে মানুষ মানুষী"।

না, ইতিহাস আমাদের কাছে আর কোনো দৈববাণী করে না, কোনো শূন্য থেকেই আর আশ্বাসের বিপ্‌ বিপ্‌ শোনা যায় না। তাই পুরোনো কবিরা ফিরে যেতে ভালোবাসেন মিথ্‌ থেকে চর্বিত লোকায়তে, কখনো সাবেক ঘিয়ের গন্ধ-মাখা হাত শুঁকে সেই অলীকে—যা নিছক আপ্তবাক্য ছাড়া আর কোনো জলঝর্ণার ধ্বনি ঘনিয়ে তোলে না। কেউ বা বাড়ি ও ট্রাফিক্‌ পুলিশের স্থবিরতায় অনড় থাকেন অতি-ব্যক্তিগত অনুভবে ও একই ফর্ম-এ, এবং, হায়, তাকেই ভাবেন ক্লাসিসিজম্‌! কেউ চটুল গলায়, যা ছাখেন তা নিয়েই হাল্‌কা মস্করা ক'রে ভাবেন, সমাজের নালা-নর্দমা ঝাঁট দিচ্ছেন। ভুলে যান, "মানুষকে ভোলানো সহজ, / বুকে তার ফোটানো সহজ মরু থেকে স্বপ্নের করবী। / তারপর সেই করবীর বৃন্তে বৃন্তে বিষ জন্মে / রেড রোড ফাঁকা পড়ে থাকে" (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)।

খুব মনে পড়ে, মৃত্যুর এক দশক আগে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায় এমনটি লিখেছিলেন, রাজনীতি হচ্ছে সেই রূপসী যুবতী, সে মাথা খারাপ করে দেয় ছেলে-ছোকরাদের, আর শোয় বুড়োদের সঙ্গে। প্রবঞ্চিত, অপমানে রাগে কালোমুখ-তরুণরা তাই যখন রাইফেল তুলে ধরেন যাবতীয় 'হচ্ছে-হবে'র কালহারী আপ্তবাক্যের দিকে, তখন বোঝা যায়, বিশ শতকের ক্রান্তিকালের কবিতা আর কোনো প্রতিশ্রুতিতেই আত্মহারা হবে না।

ফলে এভাবে তো লিখতেই পারেন সুদূর উত্তরবাংলা থেকে তাচ্ছিল্যের দামিনীবিলাস ঠোঁটে নিয়ে তরুণ কবি বিজয় দে—

"পুনরায় দৈববাণী হইল, 'যুবকেরা গোল করিও না। সময় হইলে প্রভু তোমাদের সকল চিন্তা দূর করিবেন। প্রশ্ন করিও না। বিশ্বাস রাখো। মনে রাখিও, প্রভুর বাম হাতে স্কচ, ডান হাতে দেবযানী আপাতত মিঃ স্কচ তোমাদের ভ্রমণসঙ্গী হইবেন। তিনি এখন দেবযানীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন। যাও অপেক্ষা করো।…"(স্কচ ও দেবযানী)। কবিতার শরীর থেকে কবিতার চামড়া যখন পুরোপুরি ছিঁড়ে নেওয়া হয় নি, অর্থাৎ আরও এক দশক আগে রণজিৎ দাশ-এর 'কোরাস' কি মন্থন করে আনে নি ঐ-একই সার্ভনিক মেজাজের পূর্বাভাষ—

"স্থবির শহরে বসে ইতিহাস প্রবাহের ধ্বনি
রাত্রির গভীরে আজো শোনা যায় ; 'চাঁদ প্রভুদাস,
রুটি ও সার্কাস দাও আমাদের, আরো বেশি রুটি ও সার্কাস !'"

আর, এখানে যেটুকু রম্যতা তাকেও তো সরাসরি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তুষার চৌধুরী শাদাসাপ্টা বলেন—

"দ্বিধা হয় কেন যাবো একা একা বেসামাল হুজুগের একুশ শতকে ?
বাদ্যি বাজে, হাজার ঢুলির বাদ্যি, আমরা সব বিসর্জনে যাবো।"

এ এমন এক সময় যখন দূর-পুরুলিয়া থেকে নির্মল হালদার বলেন 'আমার চোখের জল লোহা হয়ে যায়' ও নবীন কবি শ্যামল সিংহ লক্ষ্য করেন, 'মায়ের অন্ধ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে পয়সা'। আবার এরই বিপ্রতীপে, জয়দেব বসু, যিনি লেনিনকে স্মরণ করে লেখেন, 'মধ্যরাতে তোমাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কেঁদেছে কত কবি ও নাবিক' কিংবা অতি-তরুণ ঋজুরেখ চক্রবর্তী যিনি যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ল্যাংস্টন হিউয়েস-এর 'শার্প অ্যাজ স্টীল' হয়ে দাঁড়াতে চেয়ে অভাবনীয় ইতিবাচকতায় আজও বলতে পারেন—

"—এসো, যুবা,
আমাকে সাজাও ফের কুসুমে-চন্দনে-পতাকায়।
হাতে হাত রাখো, বলো : ভালোবাসি।
বলো : বলশেভিক।
বলো : আমাদের এই বিবাহসন্ধ্যায়
প্রাণের সঙ্গীত যেন বেজে ওঠে পৃথিবীতে
আকাশে-আকাশে, চাঁদে, তারায়-তারায় মেঘে মেঘে"
(জীবনস্মৃচি)

এমনকি নাতি-তরুণ শুভ বসু 'নশ্বরতাকে ছুঁয়ো' দেওয়ার সংকল্প ছাড়েন না—তখন সমস্ত নষ্ট অনুভবের কালো মেঘের ওপর ঐ হঠাৎ আলোর ঝলকানি আমাকে যাবতীয় রোমান্টিক অথচ অচরিতার্থ স্বপ্নের অমীমাংসিত বিদিশার দিকেই কেন ঠেলে দেয় ?

৩.

বহুকাল আগে সিদ্ধেশ্বর সেন লিখেছিলেন, 'নিষ্ঠুরতা ঘটে গেছে। রেখো না, রেখো না রক্তক্ষার।' পুরুষশাসিত, বৈশ্য, ধর্ষকামী নগর-সভ্যতার দিকে ট্রিগার উঁচিয়ে, তাও অনেক দিন হয়ে গেল, কবিতা সিংহ লিখেছিলেন 'ভাঙ্গী রমণীর ক্রোধ'-এর মত কবিতা। তীব্র ক্ষোভে যাবতীয় শিষ্ট ও মান্য কাব্যিক বাগ্‌বিধির মুখে নুড়ো জেলে চীৎকার করে উঠেছিলেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য, 'এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ও সি-কে।'

অথচ দশকের রাজনীতির বির্বতনে এই ক্ষোভ, এই ক্রোধ ও মরীয়াপনা, পরাজয় ও ক্রমান্বয়িক ব্যর্থতা থেকে কবিতা চলে যেতে চাইছে বুক থেকে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তুলে ধরা-পরম বিষণ্ণ উচ্চারণে, যেখানে অনুরাধা মহাপাত্র যাবতীয় নারীদের 'ঘুমহীন গর্ভমাস' ভেঙে উঠে এসে বলেন—

"কবিতারচনাহীন প্রতিটি রাত্রির টাটা-শিশুদের চোখে
মাতৃহীন, প্রান্তহীন, তামাটে ডানার প্রান্ত আছড়াতে দেখে
বিপ্লবী সংবাদপত্রের মত মসৃণ নিষ্ঠুরতা দেখে
কবিতা লেখার কথা ভুলে যাই,
সকলেই নারী—কেউ জননী হবে না।"

(পঁচিশে জুন, কলেজ স্ট্রীট)

আর জন্মের কান্না গলায় উঠে আসে শহরতলির যুবক কবি প্রবীর ভৌমিকের, মাতৃকাতন্ত্রের বাহুবন্ধন ছিঁড়ে তাঁর না বলে উপায় থাকে না 'সর্বনাশী, আমাকে, তুই এমন ভাবে নিলি ?' (তুমি আছো বিনাশে নির্মাণে)। যদিও রূপা দাশগুপ্ত-র আকাঙ্ক্ষা থাকে, 'এই দেহ গাছ হোক, হয় হোক পাখি / তবু যেন ষাটকোটি পায় নুনভাত,' তবুও এই চলাটুকুর পেছনে থেকে যায় সেই ধূসর রিক্ততা, 'আমার দেশের নাম ন্যাংটো ভারত / জলখাবারের মত সুখটুকু নেই / ক্যামেরাম্যানের হাতে হাড়গিলে পাখি /' (তোমাকে / ৩০ অক্টোবর '৮৮)।

ষাট থেকে সত্তরে যখন সময় গড়াচ্ছে, আমরা পড়ে ফেলেছিলাম ভাস্কর চক্রবর্তীর ''শীতকাল কবে আসবে, সুপর্ণা ?' তার কয়েক বছর পর,

দেবারতি মিত্র-র 'অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজে', শামশের আনোয়ার-এর 'মা অথবা প্রেমিকা স্মরণে।' ব্যক্তিগত কবিতায় কোথাও কোথাও বা ভারী মৃদু ভাবে, খুবই পরোক্ষে সামাজিক অষ্টাবক্র জীবনের অভিঘাত-ও যে শিল্পকে কোন্ মন্ময় দিগন্তে নিয়ে যেতে পারে তারই কিছু সক্ষম দিকচিহ্ন ঝল্‌সে বা করুণ বিম্বফলের মত জ্বলে উঠেছিল ঐ কবিতাবলিতে। কালীকৃষ্ণ গুহ-র অন্তরঙ্গ নির্মাণের শান্ত দ্যুতি-ও এক নিজস্ব বলয় গড়ে তুলেছিল। শ্রম ও শিল্পের চমৎকার কবিতা-সঙ্গীত শুনেছিলাম দেবদাস আচার্য-র 'মাটির মূর্তি'-তে। চল্লিশের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে গণগণে এবং কিছুটা বর্হিমুখী কবিতার আঁচ ক্রোধে-বিশ্বাসে-প্রশ্নে প্রতিবাদে ধরে রাখতে চাইছিলেন গণেশ বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, করুণাসিন্ধু দে, আনন্দ ঘোষ হাজরা, চিন্ময় গুহ-ঠাকুরতা, জিয়াদ আলি, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দীপংকর চক্রবর্তী, গোবিন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ। হ্যাঁ, অসামান্য নাম দিয়েছিলেন বর্তমানে একেবারে নীরব করুণাসিন্ধু তাঁর কাব্যগ্রন্থের—'কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা'। আবার, প্রধানত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, কিছুটা সুব্রত চক্রবর্তী, গৌণভাবে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ঋজু স্মার্ট গদ্যভাষায় কিছুটা অ্যান্টি-পোয়েট্রির বিচ্ছিন্নতায় লিখে যাচ্ছিলেন নাগরিকতার টুকরো টুকরো আঁতের কথা, যার চরম দেখেছিলাম মানিক চক্রবর্তীর এবং, অংশত কমল চক্রবর্তীর কবিতায়। 'ব্যাণ্ডমাস্টার'-এর তুষার রায় লেখার ভঙ্গি-পড়া-চলনবলনে প্রায় তুলকালাম তুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কাকে ইয়াংকি কবিতা বলে। রত্নেশ্বর হাজরা, সামসুল হক, মৃণাল বসুচৌধুরী, রাণা চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত, বাসুদেব দেব, শান্তনু দাস প্রমুখ ফর্ম-সচেতন, ছান্দসিক কবিদের নীচু গলায় কথা বলা-ও কখনো কখনো হঠাৎ গভীর-কে ছুঁয়ে যেত। তারপর তো, প্রায় রাজবদুন্নত ধ্বনি তুলে 'প্রত্নজীব' হাতে জয় গোস্বামীর আগমন, ছন্দে-অপরাধবোধে-ঠা ঠা যৌনতায় লোকায়তের নিপুণ ব্যবহারে টোট্যাল কবিত্বের প্রতিশ্রুতি জাগানো ও তারপর দুঃসহ নিশিপালন। মনে পড়ে মৃদুল দাশগুপ্ত-র 'জলপাই কাঠের এস্রাজ' ও ব্রত চক্রবর্তীর 'গাজনের মেলা'-র বেশ কিছু সাড়া-জাগানো কবিতা। ভুলে যাই না 'দেবদারু কলোনি'-র সমর্থ কবি, দেশ ও ভাষার শুদ্ধ আবেগে আলোকিত সুব্রত সরকারকেও ভুলি না সব্যসাচী দেবের কিছু আশ্চর্য, ধ্রুপদী দীর্ঘ কবিতার বিভাময় অস্তিত্ব। ভুলে যাই না 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'-র মল্লিকা সেনগুপ্ত ও 'দেবীপক্ষের কবিতা'-র চৈতালী চট্টোপাধ্যায়-কে।

কিন্তু এই সবই, একেবারে নবীন প্রজন্মের কবিকুলের লেখালিখি পড়তে

পড়তে আমার মত প্রবীণ পাঠকের কাছে যতখানি অর্জন বলে মনে হয়, ততখানি অসহনীয় অথচ জরুরী বলে মনে হয় না। কেন? কারণ, চারপাশ ঝেঁপে 'ভালোবাসা থেকে আজ কুঠারের শব্দ শোনা যায়।'

সারা জীবন কবিতার যে তরুণ অগ্নির হাতে হাত সেঁকে নিতে আমি বসে আছি, তাঁদেরই একজন হয়ে তরুণী তমা নন্দিতা চৌধুরী যখন লেখেন, 'হলুদে শরীর ধোয়ার পর / তোমার সন্তানেরা কোনোদিন আগুন ছাখে নি' এবং তারপরও নিয়তির গলায় বলে ওঠেন,

"শেষ পর্যন্ত তুমিই রক্তপাত ঘটালে
আমার বাদামি উরু, গির্জার ঘণ্টা
আর প্রাচীন দেওয়ালগুলির ওপর।
কি করবো, বলো? আমাকে আটকে রাখা হয়েছিল
তোমার মিলন আর মৃত্যু আনন্দকে
খতম করার জন্য"

(পল গঁগ্যার প্রতি)

আর এই ধাতব-ভাষণের সঙ্গে গলা মেলায় নন্দদুলাল আচার্য-র 'শ্যামাঙ্গী ও বাংলাদেশের', অনীক রুদ্র-র 'বামন অবতার' বা ধীমান চক্রবর্তীর 'আগুনের আরামকেদারা'-র কশাতাড়িত কবিতাগুলি, তখন বস্তুতই কবিতার প্রার্থিত আগুন আমার চারপাশে খাণ্ডবদহন, সর্বভুক দাবানল ও লাল দমকলের ভয়ংকরকে পরিত্রাণহীনতায় নিয়ে আসে।

বাংলা উপন্যাস ঃ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

আজকের ঔপন্যাসিকেরা কি গল্প বা কাহিনীর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন? গত কয়েক বছরের বাংলা উপন্যাসের আলোচনা করতে বসে এই প্রশ্নটিকে এড়ানো চলে না। বিশুদ্ধ অনুপ্রেরণার বশে উপন্যাস রচনার দিন অনেককাল আগেই বিদায় নিয়েছে। দেশ, কাল বা মানুষের দ্বন্দ্বটিকেই হয়তো এখন ঔপন্যাসিকদের গুরুত্ব দিতে হয় বেশি, আর চারপাশের দ্বন্দ্ব বা সংঘাতে আজকের ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষ থাকাও সম্ভব হয় না। তাকে একটা পক্ষ নিতেই হয়। হয় তিনি একটি নির্দিষ্ট ধারার পক্ষে অথবা বিপক্ষে। অথচ আজকের ঔপন্যাসিকের সামনে কোন নির্দিষ্ট মডেল নেই। যে বিষয় বা সমস্যা তাঁর কালে প্রধান হয়ে উঠেছে সেটা এই যুগেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব। একে ফুটিয়ে তুলবার ভাষা এবং কাঠামো আলাদা, বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত মডেলে একে ধরা বোধহয় সম্ভব ছিল না। তাই আজকের ঔপন্যাসিককে কেবল নতুন বিষয়ই খুঁজে বের করতে হয় না, নিজের পথ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। আর তা করতে গিয়ে তাকে যে গল্প বা কাহিনী পরিবেশনের ধরাবাঁধা পথ থেকে বিদায় নিতে হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বরং এই নতুন পথের খোঁজ দেবার জন্য আমাদের ঔপন্যাসিকদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কারণ, যুগের মধ্যেই যেখানে কোন নিটোলতা বা ধরাবাঁধা নিয়মকানুন নেই সেখানে ঔপন্যাসিকদের কাছে নিটোল কাহিনী আশা করাই তো অন্যায়।

এইকারণেই উপন্যাস-আলোচনার গতানুগতিক পদ্ধতিও পাল্টাতে হয়। অর্থাৎ বাইরে থেকে ঔপন্যাসিকদের বিচার করা এখন আর বোধহয় সঙ্গত নয়। এমার্সন ক্রিয়েটিভ্ রিডিং বলে একটা কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর বাংলা করা যেতে পারে সৃজনধর্মী-পাঠ। সাধারণ উপন্যাসপাঠের সঙ্গে এর তফাৎ আছে। সাধারণ পড়ায় ঔপন্যাসিক এবং পাঠক আলাদা থেকেই যায়। কিন্তু

সৃজনধর্মী পাঠে উভয়ে যেন একাত্ম হয়ে যান। অর্থাৎ সেই মুহূর্তের জন্য পাঠক নিজেই ঔপন্যাসিক। এই একাত্মতাতে পাঠকের চোখে ঔপন্যাসিকের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরা পড়ে। ঔপন্যাসিকের লেখায় যে জগৎটি ফুটে উঠেছে তা হয়তো পাঠকের পছন্দসই নয়, কিন্তু সেটি যদি সত্য হয়ে ওঠে তাহলে পাঠক এবং সমালোচক উভয়েই কৃতার্থ বোধ করেন। বিগত বছরগুলির তরুণ বাঙালী ঔপন্যাসিকদের কিছু কিছু লেখার কথা মনে রেখেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। পুরনো জগৎটা তাদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে। নতুন জগৎটা কতটা নতুন তাও সঠিকভাবে জানা নেই। তথাপি চোখের সামনে যে দেশকাল বা মানুষকে দেখা যায় তাদের তো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই হবে। তাই বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তির ওপর নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য তাদের অনেকেরই আপ্রাণ প্রয়াস। এই প্রয়াস যে সকলের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে তা নয়, কিন্তু প্রাণপণ প্রয়াসটি যে বিভিন্ন উপন্যাসে চোখে পড়ে এটাই বড় কথা।

আসলে কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটই পাল্টায় নি, পাল্টেছে সাহিত্যের প্রেক্ষাপটও। সত্তরের দশকের রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়ার দিনগুলি একেবারেই বিদায় নিয়েছে। ঝড়ের দাপটে যা কিছু বিধ্বস্ত হয়েছিল তাও যেন আড়ালে পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় কেবল আত্মসমালোচনা, অবলম্বনহীনতা বা শূন্যতাবোধই প্রধান হয়ে ওঠে। রাজনীতি হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী, চারদিকে প্রবল ভাঙনের শব্দ শোনা যায়, আর অবক্ষয়ী মানসিকতা প্রচলিত মূল্যবোধকেই অস্বীকার করে বসে। কেউ কেউ নিরাপত্তার খাতিরে এই সংকটকে এড়িয়ে যেতে চান, কিন্তু অবশ্যই সকলে নয়। কেউ কেউ সামনে দাঁড়িয়েই সংকটের মোকাবিলা করতে চান। মহাশ্বেতা দেবী এবং প্রফুল্ল রায়ের মতো শক্তিমান লেখকেরা রাজনীতিকে উপন্যাস থেকে বিদায় দিতে একেবারেই রাজি নন। মহাশ্বেতা কেবল বিহার-পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতি শোষণ, অত্যাচার এবং তাদের প্রবল প্রতিরোধের কাহিনীই লেখেন না, তিনি নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির সুবিধাবাদ এবং অন্তঃসারশূন্যতাকে তীব্র ব্যঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয়, প্রকাশভঙ্গি, এমনকি ভাষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'মহাকাল' কিন্তু ভাঙনের রাজনীতি ছেড়ে গড়ে তোলার রাজনীতির দিকে সকলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চায়। উপন্যাসের অন্ত্যজ নায়ক মহাকালের পুত্র ভৈরব সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতিতে মেতেছিল।

পুলিশের গুলিতে ভৈরবের মৃত্যুর পর পিতা মহাকাল হত্যার রাজনীতি অথবা নির্বাচনের রাজনীতি উভয়কেই অগ্রাহ্য করে সমাজ সংস্কারকে বড় করে দেখে। বোঝাই যায়, রাজনৈতিক-উপন্যাসে মহাশ্বেতা ক্রমশ এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছেন। তিনি 'সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী' বলে একদা ঘোষণা করেছিলেন। তাই 'অপারেশন? বসাই টুডু'র লেখিকা যখন 'মহাকাল' লেখেন তখন মনে হয় এটাও বোধ হয় সময়ের দাবী।

একই বিষয়কে একটু অন্যদিক দিয়ে তুলে ধরার জন্য প্রফুল্ল রায় জাতপাতের রাজনীতিতে বিধ্বস্ত বিহারকেই তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নেন। আসলে পশ্চিমবাংলাই হোক, অথবা বিহারই হোক, সমস্যা বা সংকট সব জায়গাতেই এক, যেহেতু মূল কারণগুলিও একই থাকে। 'যুদ্ধযাত্রা' বা 'রথযাত্রার' মতো উপন্যাসে এমন সব বিষয়বস্তু চোখে পড়ে বাংলা উপন্যাসে এর আগে তা দেখা যায় নি বলাই ভালো। এতদিন একমাত্র মহাশ্বেতাই ছিলেন এই পথের পথিক। তবে মহাশ্বেতা কেবল সংকটের চেহারাই আঁকেন না, এর একটা সমাধানের কথাও ভাবেন, আর প্রফুল্ল রায় সংঘর্ষ, শোষণ বা অত্যাচারের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে আগ্রহী। তবে তাঁর সমর্থন যে কোন্ পক্ষের প্রতি তা তিনি গোপন রাখেন না। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব, নকশালবাড়ী আন্দোলন বা খতম-অভিযানকে বিষয় করে একের পর এক উপন্যাস বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে চলেছিল। কিন্তু এখন যেন এই ধারা ক্ষীণতর হতে হতে বিলুপ্ত হতে বসেছে। মনে হয় 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের' শব্দ আজ বিলীয়মান। তাই গুণময় মান্নার 'শালবনী', শৈবাল মিত্রের 'অগ্রবাহিনী' 'যৌবরাজ্য', স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' প্রভৃতি উপন্যাসের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। মহাশ্বেতা-র 'হাজার চুরাশীর মা' অথবা সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র মতো অসাধারণ রাজনৈতিক উপন্যাস আপাতত আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। নতুন রাজনীতি হয়তো নতুন ঔপন্যাসিক আর উপন্যাসের খোঁজ এনে দেবে।

রাজনীতি যদি তার প্রাধান্য হারায় তাহলে ব্যক্তিমানুষেরই উপন্যাসে গুরুত্ব পাওয়ার কথা, অথবা মধ্যবিত্ত সমাজের। কেননা, আমাদের ঔপন্যাসিকেরা প্রায় সকলেই এই সমাজের লোক। মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা এই যে তা নিস্তরঙ্গ ও গতানুগতিক। কিন্তু এর অন্তরালে যে জটিলতা রয়েছে, আপাত নিস্তরঙ্গতার গভীরে যে তীব্র ঘূর্ণির অস্তিত্ব

রয়েছে তাকে খুঁজে বের করার জন্য তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। আশ্চর্য এই যে তরুণেরা প্রায়ই কেউ এপথে হাঁটেন নি, মধ্যবিত্তের জটিল মানসিকতার সন্ধান পেতে গেলে প্রতিষ্ঠিত পুরনোদের কাছেই ফিরে যেতে হয়। আর তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন রমাপদ চৌধুরী। এই প্রবীণ লেখক তাঁর স্বশ্রেণীর সমস্যা, সঙ্কট এবং জটিলতাকেই গত কয়েক বৎসর ধরে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করে চলেছেন। আর এব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত ভাবে সফল। কিছুদিন আগের 'বাড়ি বদলে যায়' থেকে সুরু করে আধুনিকতম 'রাজস্ব' পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর একই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। একই সঙ্গে বিমল করের নামও মনে পড়ে যাবে। মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতার থেকেও ব্যক্তিমানুষের চিত্তসংকটটিকে তুলে ধরাতে যেমন একদিকে তাঁর আগ্রহ, অপরদিকে তাঁর উপন্যাসে স্নিগ্ধ রোম্যান্টিক প্রেমের হারানো জগৎটিকে যেন ক্ষণকালের জন্য খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবন কেবল জটিল বা আবর্তসংকুলই নয়, তার মধ্যে অবক্ষয় আছে, বিবেকের দংশন আছে। মধ্যবিত্ত-মানস যতই বিবেককে এড়াতে চায়, ততই তাকে তা বিচলিত করে সবচেয়ে বেশি। তাই এটিকে উপেক্ষা করবার জন্যই সকলের প্রাণপণ প্রচেষ্টা, এমনকি নিজের সঙ্গে নিজেরও প্রতারণা। এ যেন সেই জীবনানন্দীয় জগৎ, 'সকলেই আড়চোখে সকলকে ছাখে,' মধ্যবিত্তের এই অবক্ষয়, সংশয় ও বিবেক-দংশনের উল্লেখযোগ্য রূপকার দিব্যেন্দু পালিত। তিনি তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, যাকে আধুনিক যুগে ওপরে ওঠা বলে মনে হয় তা আসলে নিচেও নামা। তাই তথাকথিত সাফল্যের চূড়ান্ত মুহূর্তেও মধ্যবিত্ত একা। দিব্যেন্দুর উপন্যাসের নায়কদের জীবনের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে ঔপন্যাসিকেরই ভাষায়, 'যার শুরু আছে, শেষটা পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কিংবা, সত্যিই যার শেষ নেই, কোনো দিক-চিহ্ন নেই।' মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের যে নির্দিষ্ট ছক তৈরি হয়ে গেছে, তাকে ভাঙা মোটেই সহজ নয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মানবজমিন' উপন্যাসে দেখা যাবে যে দীপনাথ চেষ্টা করেও শ্রীনাথ ও তৃষার জীবনের ছক ভাঙতে পারে না, আবার বোসসাহেব ও মণিদীপার জীবনের ছকের সঙ্গে তার নিজের জীবনের ছক মেলানোও তার পক্ষে সম্ভব হল না। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায় শীর্ষেন্দু সিদ্ধহস্ত, কিন্তু জীবনের জটিলতার মধ্যেও তিনি যেন এক দার্শনিক সমাধান খুঁজে বেড়ান। মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ বেদনার অন্তরালেও যে একটি স্নিগ্ধ মধুর রসের অস্তিত্ব আছে এটা সাম্প্রতিক

উপন্যাস সাহিত্যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'লোটা-কম্বলই' হোক বা সাম্প্রতিক কালের 'হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ'-ই হোক সর্বত্রই তাঁর একই প্রয়াস। এই প্রয়াসে তাঁর সাফল্য সুবিদিত। কিন্তু সঞ্জীব কেবল বেদনামধুর স্নিগ্ধ মানবজীবনের চিত্র অঙ্কনেই তৃপ্ত নন, তিনি সব সমস্যার দার্শনিক সমাধানেও আগ্রহী। শীর্ষেন্দু এবং সঞ্জীব উভয়ের উপন্যাসেই অত্যধিক দর্শন বা অধ্যাত্মপ্রীতি যেন স্বচ্ছ জীবনবোধে ব্যাঘাত ঘটায়।

শুধু মধ্যবিত্তই নয়, উচ্চবিত্ত জীবনের নরনারীর সমস্যা, প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাত, সমাজের নানা অবক্ষয় বা ফাটল সবই বুদ্ধদেব গুহের চোখে সার্থকভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু তাঁর কলম রোম্যান্টিকের কলম। তাই শেষ পর্যন্ত বেদনা বা তিক্ততাকে তিনি যেন বিদায় দিতে বাধ্য হন। মধ্যবিত্ত জীবনের নির্মোহ ও নিরাসক্ত বিশ্লেষণে দক্ষতা দেখানোর শীর্ষস্থানে বোধ হয় রয়েছেন মতি নন্দী। প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের আড়ালে যে অনেক ফাঁকি আছে তিনি অবলীলায় তার দিকে আঙুল তুলে ধরেন, মুখোশের অন্তরালে মানুষের যে আসল চেহারা তাকে তিনি অনায়াসে টেনে বার করতে পারেন। এইজন্যই তাঁকে অনেক সময় নিষ্ঠুর ও নিরাসক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু এই নির্মম নিরাসক্তিই তাকে আধুনিক মানবজীবনের জটিলতার সার্থক রূপকার করে তুলেছে। 'সাদা খাম' উপন্যাসের বিষয়বস্তু, সেখানকার নির্মোহ জীবনবিশ্লেষণ এবং নায়ক প্রিয়ব্রতের জীবনের পরিণতিই বুঝিয়ে দেয় যে এই উপন্যাসের জাত আলাদা। এর নায়ক নিজেই পাপ ও অন্যায়ের স্রষ্টা, আবার সে নিজেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়। বাংলা উপন্যাস থেকে জীবন যেন ক্রমশ সরে যাচ্ছে, যে কজন ঔপন্যাসিক এখনও গভীর জীবনবোধে অনুপ্রাণিত মতি তাদের অন্যতম। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পটভূমি আলাদা। সমুদ্র বা প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসে প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়, কিন্তু তাঁরও মূল লক্ষ্য দিগ্‌ভ্রান্ত এবং অবলম্বনহীন মানুষকে আশ্রয়ের সন্ধান দেওয়া। মানবসংসার, মানুষের স্নেহ ভালোবাসাই শেষ পর্যন্ত মানুষের শেষ আশ্রয়। তাই মানুষকে বাঁচার জন্য ঘর বাঁধতেই হয়। আবার এই ঘর ভাঙার জন্য হীন প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যাবে। অতীন তাঁর উপন্যাসে মানুষের এই চিরন্তন জীবনসংগ্রামকেই তুলে ধরেন। তবে অতীনের ভাষা রূপকথার জগতের মোহময়তায় আচ্ছন্ন। তাই তা যেন পাঠক-হৃদয়কে আবিষ্ট করে তোলে।

সমসাময়িক দেশকাল বা মানুষের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি

ঔপন্যাসিকদের কাছে পাঠকদের অন্য প্রত্যাশাও থাকে। নতুন বিষয় এবং নতুন আঙ্গিকের জন্য তাঁদের দিকে আমাদের সাগ্রহে তাকিয়ে থাকতেই হয়। আর সম্প্রতিকালে উপন্যাস-সম্পর্কিত সমস্ত বাঁধাধরা ধ্যানধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চেয়েছেন দেবেশ রায়। তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' থেকেই বোধহয় আধুনিক বাংলা উপন্যাস মোড় নিতে আরম্ভ করে। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' এবং 'ইছামতীর' কথা মনে রেখেও বলা চলে যে তিস্তাপারের মানুষের জীবন বৃত্তান্ত যেন একেবারে একালের। এই জগৎ গয়ানাথ জোতদার এবং তার অধীনস্থ আজীবন ক্রীতদাস বাঘারুর জগৎ, গয়ানাথের শোষণ ও বাঘারুর প্রতিবাদের জগৎ। এ এক অনবদ্য জীবন-সংগ্রামের কাহিনী, যে সংগ্রামের পরিণতিতে বাঘারুরই প্রতীকী জয়লাভ। জীবন সম্পর্কে মধ্যবিত্তের নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত ধারণাকেও ব্যঙ্গের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করেন দেবেশ। অথচ, এই ব্যঙ্গটি লুকিয়ে থাকে উপন্যাসের ফর্মের মধ্যে, ভাষার অনবদ্য কাঠামোর মধ্যে, এমনকি অনেক সময় উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেও। যখন কোন উপন্যাসের নামকরণ হয় 'বিচারের সময় আদালতে এরকম ঘটে থাকে' অথবা, 'ধর্ষণের আগে এরকম ঘটে থাকে', তখন বোঝাই যায় যে এদের লেখক বাংলা উপন্যাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন রুদ্ধ ঘরের দরজা জানলাগুলো যেন একের পর এক খুলে দিচ্ছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের নিশ্চিন্তির দিন যে শেষ হয়ে গেছে, সেখানে ঝড় যে আসন্ন আর একজন লেখক তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর নাম অমলেন্দু চক্রবর্তী। 'যাবজ্জীবন' বা 'গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপনের' মতো উপন্যাসে তিনি বিশ্বাসভঙ্গের বেদনার পাশাপাশি বিশ্বাসকে ফিরে পাওয়ার আনন্দেরও ছবি আঁকেন। আরেকজন সতর্ক ও সচেতন লেখক হলেন কার্তিক লাহিড়ী। তাঁর 'অন্ধকূপ' বা 'যুবকের' মতো উপন্যাসে মাঝে মাঝে হতাশার মধ্যে দুএকটি হাল্কা আশার মেঘ যেন ভেসে চলে যায়। এই জটিল অস্থিরতা, সৎ মানুষের বিবেক দংশন এবং আশ্রয় খোঁজার সময়টিকে কার্তিক লাহিড়ী তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন।

বাংলা উপন্যাস কি এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে? এই প্রশ্নটিকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। দেবেশ রায়কে বাদ দিলে বিষয়বস্তু বা কাঠামোর ক্ষেত্রে নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা তেমন কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসটি শেষ হলে বোধ হয় আর একটি মহৎ সৃষ্টি পাওয়া যেত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

'পূর্ব-পশ্চিমের' পটভূমিও বিশাল, এর মধ্য দিয়ে একটা গোটা যুগ যেন কথা বলে উঠেছে। কিন্তু সুনীলের ভাষা এবং গল্প বলার মুন্সিয়ানা যতটা প্রশংসনীয়, জীবনজিজ্ঞাসা ততটা নয়। তাই কোথায় যেন ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর একটা ফাঁক থেকে যায়। সমরেশ মজুমদার বিরাট ক্যানভাসে 'কালপুরুষ', 'উত্তরাধিকার' অথবা 'গর্ভধারিণী' রচনা করেন বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার সংমিশ্রণ তাঁর উপন্যাসে ঘটে না। সমস্ত ব্যাপারটাই মাঝে মাঝে অবাস্তব ও জীবনবিমুখ হয়ে পড়ে। আসলে আমাদের নগরকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিকেরা যে একটা সঙ্কটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং এবং ফ্ল্যাট-নির্ভর যে নতুন উচ্চবিত্ত সমাজ তার সঙ্গে পাড়াকেন্দ্রিক পুরনো কলকাতার এতদিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আমূল্য পার্থক্য। জন-জীবনে ভাষাগত ও অর্থনৈতিক পার্থক্যও ঘটে গেছে। আমাদের ঔপন্যাসিকেরা অনেকেই কেবলমাত্র দূর থেকে এদের দেখে উপন্যাসে রূপ দিতে গেছেন, খুব একটা সফলতা অনেকেই পান নি। বাণী বসু তাঁর দুএকটি উপন্যাসে উচ্চবিত্ত সমাজের ভিতরকার ফাঁকগুলি তুলে ধরবার প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অনেকের চেষ্টাই ব্যর্থ, বোধ হয় এই ব্যর্থতার উপলব্ধিই আমাদের তরুণ লেখকের নতুন বিষয়ের সন্ধানে নিরত করেছে। সহর থেকে আবার অনেকেই গ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। আবুল বাশারের মতো শক্তিশালী ঔপন্যাসিককেও বোধ হয় এই একই কারণে দিগভ্রান্ত মনে হতে থাকে। বিষয়ের অভাব মেটানোর জন্য তপোবিজয় ঘোষের মতো শক্তিমান লেখকও রাজনীতিকেই উপজীব্য করেছিলেন। বোধ হয় এই ধারাকেই অনুসরণ করে সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসে আজকের রাজনীতির চেহারাটি তুলে ধরতে চান। কেবল রাজনীতিই নয়। রাজনীতি-নিরপেক্ষ ভাবেও গ্রামজীবনকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এমন কি আঞ্চলিক বিষয়কে তুলে ধরতে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষাকেও উপন্যাস রচনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টাই এক ঝলক তাজা হাওয়া বাংলা-উপন্যাসের জগতে যে নিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।

আঞ্চলিকতাকে উপন্যাসে নিয়ে আসার প্রচেষ্টার সুরু হয়েছে সেই শৈলজানন্দ এবং তারাশঙ্করের যুগ থেকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দীর্ঘকাল এই পথের পথিক ছিলেন। এঁদের হাতে আঞ্চলিক চরিত্র এবং ভাষা বাংলা উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। পরের দিকেও যে এদিকে একেবারে নজর দেওয়া হয়নি তা নয়। তবে তা বেশি উল্লেখের

দাবী রাখে না। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সুন্দরবন এবং সন্নিহিত অঞ্চলের জীবনকাহিনী তাঁর অনেক উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। আরেকজন শক্তিমান লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জীবনকে উপন্যাসের বিষয় করেছিলেন দীর্ঘকাল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও মুর্শিদাবাদের হিজলবিল অঞ্চলের জীবন কাহিনীর সার্থক রূপকার ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি গোয়েন্দা-কাহিনীর দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই যেন বর্তমানে এব্যাপারে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। তাই বোধ হয় সুন্দরবন ছেড়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় নাগরিক জীবনকে নিয়ে লেখেন 'ঝড়ের পাখি' আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পূর্ণ অন্য জগতের দিকে পা বাড়ান। তিনি লেখেন বিশালাকৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'শাহজাদা দারাশুকো'। এই বিষয়পরিবর্তন কি মনোভাবের পরিবর্তনও সূচিত করেছে? অবশ্যই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। তবে তরুণ সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধুকর' উপন্যাসে শ্রীপুর বলাগড় অঞ্চলের নৌ-কারিগরদের অজানা জীবনকাহিনীর যে অনবদ্য ভাষারূপ দিয়েছেন তাতে মনে হয় আঞ্চলিকতার ধারাটিকে কখনোই একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। কানাই কুণ্ডু, নলিনী বেরা বা অনিল ঘড়াই-রা এই ধারাটিকেই ক্রমশ সমৃদ্ধ করে চলেছেন। এঁদের কারো রচনাশক্তিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বরং উপন্যাসের সঙ্গে জীবনকে আবার মিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা এঁরাই যে সুরু করেছেন তা মেনে নিতেই হবে।

তবে এঁদের পাশাপাশি আর একঝাঁক তরুণ উপন্যাসিকদের কথা না বললে বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিকতম ধারাটিকে যথার্থ ভাবে তুলে ধরা যাবে না। বলা যেতে পারে ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাসের দায়িত্ব নেবার জন্য এঁরা এখন থেকেই যেন প্রস্তুত। এঁরা সরাসরি শহরকে অস্বীকার করে গ্রামের দিকে পা বাড়িয়েছেন, গ্রামের মাটি ও মানুষের মধ্যে আন্তরিকভাবে ঢুকে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে আফসার আমেদের মতো কেউ গ্রামীণ মুসলমান সম্প্রদায়ের অজানা অন্তঃপুরের সংঘাতটিকে যেমন অনায়াস নৈপুণ্যে তুলে ধরেন (সানু আলির নিজের জমি এবং আত্মপরিচয়) তেমনি আবার সম্প্রতি-প্রকাশিত 'খণ্ডবিখণ্ড' উপন্যাসে নাগরিক মানুষের অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত ঘাতপ্রতিঘাতকে তুলে ধরতে চান। আফসারের মতোই আর একজন শক্তিমান লেখক অমর মিত্র। গ্রামজীবনের মূল্যবোধগুলির ক্রমাগত ভাঙ্গন, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। আর এই পর্যবেক্ষণেরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'আলোকবর্ষ', 'পাহাড়ের মতো

মানুষ' বা 'আগুনের গাড়ি'র মতো উপন্যাসে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'সমাবেশ' উপন্যাসে অনুন্নত ও অবহেলিত জনপদ ন-পাহাড়িতে এক নতুন স্বপ্নোজ্জ্বল সমাজ গঠনের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। ভি. আই. পি রোডে অমর অবশ্য গ্রাম ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে পা বাড়িয়েছেন। যদিও সেখানেও গ্রাম ও শহরেরই দ্বন্দ্ব। গ্রামের দিকে শহরের হাত বাড়ানোর বিরুদ্ধে গ্রামীণ মানুষের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদই তীব্রতর হয়ে ওঠে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দর' উপন্যাসে। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী কোনো অঞ্চলে একটি অবাধ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের সরকারী প্রকল্পের কথা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জমি ও মানুষের পুরনো সম্পর্ক কিভাবে পাল্টে যায় তা এখানে দেখানো হয়েছে। আসলে একএকটি সরকারী বা বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রকল্প গ্রামীণ জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে শহরে থেকে তা বোঝা যাবে না। এঁরাই সর্বপ্রথম তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন,এর জন্য পাঠকহিসেবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ।

আগেই বলা হয়েছে যে উপন্যাসের জন্য নতুন নতুন বিষয়ের সন্ধান করে চলেছেন আজকের তরুণ ঔপন্যাসিকের দল। গ্রামীণ রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ক্ষমতার উৎসও যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এটা এঁরাই প্রথমে লক্ষ করেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পক্ষবিপক্ষের' কথা আগেই বলা হয়েছে, ঝড়েশ্বরও 'রামপদর অশন-ব্যসন' উপন্যাসে এই পরিবর্তনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। রাধাপ্রসাদ ঘোষাল তাঁর 'আদিকাণ্ড' উপন্যাসে সঠিকভাবেই লক্ষ করেন যে 'গ্রামে এখন জাতের বিচারের থেকে ক্ষমতার বিচারটি আগে হয়।' বর্গা আইন এবং পঞ্চায়েত গ্রামীণ রাজনীতি এবং অর্থনীতির যেমন আমূল পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি ক্ষমতার একটি নতুন কেন্দ্রস্থল রচিত করে। ফলে একদিক দিয়ে বিচার করলে গ্রামীণ জীবনে এক প্রবল ভাঙনের শব্দও শোনা যায়। এই ভাঙনের চেহারাটি আঁকতে চেয়েছিলেন ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'তস্কর' উপন্যাসে। তস্কর হিসেবে পুলিসের খাতায় চিহ্নিত লোধাদের নিয়ে এই উপন্যাস লিখে ভগীরথ একটি নতুন জানলা খুলে দিলেন। তবে সত্তরের দশকের রাজনীতিকে বোধ হয় একেবারে বাদ দেওয়াও যায় না। তাই তরুণ মানব চক্রবর্তীর 'কুশ' উপন্যাসে অথবা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘোড়া কিংবা ম্যাজিক ডল' উপন্যাসে সত্তরের দশক ঘুরে ফিরেই আসে। 'আমি রাই কিশোরী' উপন্যাস লিখে সুচিত্রা ভট্টাচার্য নিজেকে চিহ্নিত করবার জোরালো দাবি রাখেন, আবার কিন্নর রায় যখন তাঁর এতদিনের প্রিয় বিষয়গুলি ছেড়ে 'পরিবেশদূষণ সমস্যা নিয়ে 'প্রকৃতিপাঠ' উপন্যাস লেখেন তখন বোঝাই যায় যে তরুণদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর শেষ নেই। এই ভরসাটুকু করতেও বোধ হয় তখন আর দ্বিধা থাকে না যে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ এদের হাতে নিরাপদ।

পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ

বাসব সরকার

॥ এক ॥

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে সমকালের রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সমাজচিন্তায় কোন সংশয় নেই। বিশ শতকের শেষ দশকের সুরুতে যদি আজ পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কোন আলোচনা করতে হয় তাহলে তার সুরু কোথা থেকে করতে হবে, সেটা ঠিক করাটাও সমস্যা। কারণ তার পটভূমি দূরবিস্তৃত। উনিশ শতকের বাংলায় রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গলের যুগ থেকে সেই আলোচনার গোড়াপত্তন করা যেতে পারে। কারণ রামমোহন 'ভারত পথিক' রূপে যে চিন্তার সূচনা করেছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালি সমাজের মননশীল অংশ সেই ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

বস্তুত পক্ষে অবিভক্ত বঙ্গদেশ বিশ শতকের অনেক আগের থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলন ও চেতনার এমন এক ঐতিহ্য গড়ে তোলে যা সময় কিম্বা নেতৃত্ব কিম্বা উভয়ের গুণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে কিছুটা তৎকালিক মিল সত্ত্বেও একটা স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে। মোট কথা বঙ্গদেশ নিজের রাজনৈতিক চেতনার স্বাতন্ত্র্যকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের মধ্যে থেকেও বজায় রাখতে পারে। গান্ধী যুগের গণ রাজনীতির অভিনবত্বেও সেই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়নি। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলা সেই উত্তরাধিকার দীর্ঘকাল বহন করে এসেছে।

স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে এমন এক প্রচণ্ড প্রাণশক্তি দেখা গিয়েছিল যার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সারা দেশেই তার পর থেকে দেখা দিতে সুরু করে। তার মূল ধারাটির প্রগতিমুখীনতা, নতুন পথের দিশা খোঁজার আগ্রহ তখন দেশের সমস্ত চিন্তা-

শীল অংশকেই আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ ছিল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গতানুগতিকতার পরিপন্থী, বিকল্প একটি ধারণা। বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ী অভিজ্ঞতা, মন্বন্তর, দেশ ভাগ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুটিল গতি, উদ্বাস্তু শিবিরের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এই রাজ্যের মানুষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণায় ব্যাপক কোন নঙর্থক ছাপ ফেলতে পারেনি। বাঙালি মানসে অস্তিত্বের সংকট তাকে কোথাও সংকীর্ণ, গোষ্ঠীগত স্বার্থ চিন্তার আবর্তে আটকে রাখতে পারেনি। বরং বাঙালি চেতনায় এমন এক ঔদার্য লক্ষিত হয়েছে, যেখানে তার মননশীলতার জগৎ এই খণ্ডিত রাজ্য শুধু নয়, দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। চেতনার সেই প্রাসর্য বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে এমন এক মাত্রা যোগ করে যা বাঙালির আশাবাদ বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল।

বাঙালির রাজনৈতিক বিশ্বাসের স্তর এই চেতনার সূত্রেই তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিশ্লেষণে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এই বিশ্বাসের স্তরে র‍্যাডিকাল ধ্যান ধারণা বাঙালি মানসে যতোটা পরিব্যাপ্ত ও দৃঢ়মূল সম্ভবতঃ ভারতের অন্য কোন রাজ্যে অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু নেই। বিশ্বাসের র‍্যাডিক্যালাইজেশন বাঙালি মননে অনেক আগেই ঘটেছে বলে মানুষের অধিকার সম্পর্কে একটা প্রত্যয় সেখানে সহজেই গড়ে উঠতে পেরেছে। জাতপাতের প্রভাব তার সমাজ ও রাজনীতি চিন্তাকে বেপথু করেনি। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিলেও সমগ্রভাবে বাঙালি সমাজ তার শিকার হয়নি।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বাঙালির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নবর্গের সঙ্গে সহমর্মিতা, যা র‍্যাডিকাল চিন্তা চেতনার সহজাত। এই সহমর্মিতা বাঙালিকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করেছে, জাতীয় সংহতির ধারণাকে মানুষের মনে স্থিতিশীল করেছে। এই রাজ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বে যখন দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার আশায়, তখন "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ" গড়ে উভয় বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াসে মানুষ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়নি। কংগ্রেস ও লীগের তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্বে এই প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে উঠলে কতোটা বিরোধিতা কিম্বা সমর্থন করতেন, সেই আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় বাঙালি সমাজ তার রাজনৈতিক চেতনাকে সারা দেশের প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে এনে সীমিত করার সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে আমল দিতে চায়নি। অথচ

এই বাঙালি চেতনাই আবার ১৯৫৬ সালে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রশ্নে সরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তার থেকেই বোঝা যায় বাঙালির রাজনৈতিক চেতনায় ভারতীয়ত্ব আর বাঙালিত্ব মিশে গেছে। এই রাজ্যের মানুষ ভারতীয় এবং বাঙালি হয়ে থাকতে চেয়েছে, শুধু বাঙালি হয়ে নয়। রাষ্ট্র হিসেবে সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভবের সময় তার প্রমাণ আরেকবার পাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি-আন্দোলন যখন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হয়, তখন সারা ভারতের মানুষের সঙ্গে থেকেও পশ্চিম বাংলা অনেক বেশি আত্মীয়তাবোধে তাতে সাড়া দেয়। তার মধ্যে সন্দেহ নেই অনেকেই নস্টালজিয়া থেকে সামিল হয়েছিলেন, হয়তো বা আশাও করেছিলেন এবার দুই বাংলা এক হয়ে যাবে, ফেলে আসা গ্রামের হাতছানিতে তাঁরা আগের মতোই সাড়া দিতে পারবেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আন্তর্জাতিক সংহতি বোধেই তাতে সাড়া দিয়েছিলেন, ঘরে ফেরার নস্টালজিয়ায় নয়।

কারণ যে বাঙালি ষাটের দশকে কলকাতার রাজপথ থেকে দূর মফস্বলের নিস্তরঙ্গ জীবন 'আমার নাম, তোমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম' ধ্বনিতে মুখর করে তুলেছিল, প্রায় রাবীন্দ্রিক চেতনার তাগিদে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে মুক্তি ও মানবতার সংগ্রামে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল, তার পক্ষে প্রতিবেশী ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বজনের দুর্দিনে নীরব থাকা সম্ভব ছিল না। তার থেকেই বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্থিতাবস্থা বিরোধিতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিশ শতকের সুরু থেকেই বাঙালি মানসে একটা anti-establishment চেতনা প্রায় স্থায়ী রূপ নেয়। স্থিতাবস্থার সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের নাড়ীর টান থাকে বলেই এই রাজ্যে প্রায় সব দশকেই anti-establishment অনুভব এতো ব্যাপক।

এই স্থিতাবস্থা বিরোধী চেতনা বাঙালিকে খুব সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সামিল করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শাসকদের শ্রেণীগত অবস্থানের বিপরীতে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও শুধু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে পদক্ষেপ এই রাজ্যে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ১৯৫২ সালেই বামপন্থী শক্তি নিতে অগ্রসর হয়েছিল শাসক কংগ্রেস দলের বিকল্প মোর্চা গঠনের ডাক দিয়ে। কেন্দ্র বিরোধিতা, সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ, সংবিধানের অধীনে একটা সর্ব ভারতীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে রাজ্য

সরকারের ক্ষমতা কতোটা সীমিত, সেই বিচার ও বিশ্লেষণে গভীরভাবে প্রবেশ না করেই এই রাজ্যের রাজনীতিতে বামপন্থা একটা বিকল্প গড়ার ডাক দিয়েছিল। তাকে বাঙালি চেতনার বিপ্লবী মানসিকতা হিসাবে পঞ্চম বৈশিষ্ট্য রূপে উল্লেখ করা যায়।

বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই আন্তর তাগিদ থেকেই স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে বিক্ষোভের রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হয়। স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে এই বিক্ষোভের রাজনীতি এমনই উত্তাল হয়ে ওঠে না যে বিচলিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান জহরলাল কলকাতাকে "মিছিল নগরী", "দুঃস্বপ্নের নগরী" বলেছিলেন। এই অভিধায় শাসকদলের কি সুবিধা হয়েছিল সেই বিচার বাদ দিয়েও বলা যায় পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পরিভাষায় তার পর থেকেই শাসকদের 'চোখের ঘুম কেড়ে নেওয়ার' ডাক প্রায় নিয়মিতই শোনা যেতে থাকে। এটা যে agitational politics এর নিছক বুলি ছিল না, অচিরে তার প্রমাণও পাওয়া যেতে থাকে। কেবল রাজ্যের প্রথম কমিউনিস্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদিরিপাদের জন্য ময়দানের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান, ২৭ মাস ক্ষমতায় থাকার পর নাম্বুদিরিপাদ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর প্রতিবাদে কলকাতার অবিস্মরণীয় জঙ্গী প্রতিবাদ মিছিল; খাদ্য আন্দোলনের নানা পর্ব যেমন, ১৯৫৯সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর ও ১৯৬৬ সালের মার্চ-এপ্রিলের দিনগুলি মনে করলেই বোঝা যাবে বিক্ষোভের রাজনীতি বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কি বিরাট বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দিয়েছিল। আজ মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার এই শেষ পর্বের খাদ্য আন্দোলনের এক চরম মুহূর্তেই পশ্চিম বাংলায় একটানা ৭২ ঘণ্টা বন্ধ ডাকা হয়েছিল, যাতে দার্জিলিং থেকে সমতট, সারা রাজ্যের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যোগ দেয়। সারা রাজ্যে এই বন্ধ সফল করে তোলার মতো রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি তখনও বামপন্থীদের অনায়ত্ত ছিল। এই পটভূমিতেই পশ্চিম বাংলার বিগত ২৫ বছরের, ১৯৬৭-৯২ সালের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করা দরকার।

দুই

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন সারা ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব গুণগত

ভাবেই পৃথক হয়েছিল। তার মূল কারণ অবশ্যই বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চরিত্রগত পার্থক্য। বাঙালির রাজনৈতিক জীবন ও চেতনার চালিকা শক্তি, ধারক ও বাহক হলো মধ্যবিত্ত, মূলত শিক্ষিত চাকরি ও পেশাজীবীরা, যাঁরা কলকাতাকেন্দ্রিক জীবন ও রাজনীতি চর্যায় অভ্যস্ত। মফস্বলের রাজনৈতিক জীবনও ছিল কলকাতার রাজনৈতিক চেতনার বৃত্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এককথায় বলা যায় কলকাতার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ভাবগত অভিঘাত সারা পশ্চিমবাংলার জনজীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়ে, অর্থনীতি শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে বলে multiplier effect, হয়তো এমনও বলা যায় যে, আবহবিজ্ঞানে ঝঞ্ঝাবাতে যাকে eye of the cyclone বলে, সেই ঝড়ের চোখ রাজনীতিগতভাবে থাকে কলকাতাকেন্দ্রিক। ব্যতিক্রম যে নেই, ছিল না তা নয়, যেমন ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন, যার সূচনা হয়েছিল বসিরহাটে, কৃষ্ণনগরে, হুগলী জেলার গ্রাম ও শহরে। সেটাই ছড়িয়ে পড়ে শুধু নয়, চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে কলকাতার রাজনীতিকে, জীবনকে। তবু অনস্বীকার্য যে সারা পশ্চিমবাংলা কেবল নয়, বাংলাদেশের কর্মী, বুদ্ধিজীবীদের আলাপচারিতেও জানা যায়, কলকাতার রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের কবোষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে কিম্বা পড়তো পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের অনেক শহর ও গ্রামে।

মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনায় দুটি বিষয় প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের উত্তরাধিকার হিসাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালেও বজায় ছিল, সেটি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শ চেতনা। মধ্যবিত্ত বাঙালি দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, রাজনৈতিক মস্তানি অপছন্দ করতো, যারা রাজনীতিতে এইসব প্রবণতা প্রশ্রয় দিতো, তাদের প্রতি ছিল ধিক্কার ও ঘৃণা। এই মধ্যবিত্তের নৈতিক-মূল্যবোধ তাদের আন্তরিকভাবে এই বিশ্বাসে অভ্যস্ত করেছিল যে শাসন ক্ষমতা হলো জনগণের ট্রাস্ট, যার প্রতি অনুগত থাকা তার রাজনৈতিক জীবনের মূলধন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, লাইসেন্স-পারমিট রাজের প্রতি অকুণ্ঠ ধিক্কার কেবল পশ্চিমবাংলা নয়, দেশের ৯টি রাজ্যে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং কেন্দ্রেও কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা হ্রাস করে। তাকেই বলা হয় পালাবদলের পালা। তার নায়ক অবশ্যই এই রাজ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং তার সহযোগী ছিল গ্রামের ছোট ও মাঝারি কৃষক এবং নিম্নবর্গের মানুষ।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার কলকাতা, এই রাজ্যের শহর ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-

শ্রেণী ও মেহনতি মানুষ এর বেশ কিছু আগে থেকেই তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের সংগ্রামে সামিল হতে হতে বামপন্থী রাজনীতির বৃত্তে এসে পড়েছিল। ফলে শ্রেণীগত বিচারে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তখন সমাজের নীচের তলায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষ শুধু অর্থনীতিবাদের কবলে আবদ্ধ না থেকে রাজনীতির আঙিনায় এসে পড়তে থাকে। বলা যায় পশ্চিমবাংলায় নিম্নবর্গের রাজনীতি, দলীয় পরিভাষায় basic masses ক্রমশই রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, এই প্রথম নিম্নবর্গকে এমনভাবে স্পর্শ করে, যা এযাবৎ অভাবিত ছিল। শহর ও শিল্পাঞ্চলের এই পরিবর্তনের জন্য যেমন কংগ্রেসের অপশাসন মূখ্য ভূমিকা নেয়, ঠিক তেমনই পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে কংগ্রেস-ভেঙ্গে-বেরিয়ে-আসা নতুনদল "বাংলা কংগ্রেস" অনুঘটকের কাজ করে। এই ঘটনাটি শুধু ঐতিহাসিক কারণেই উল্লেখ্য, কারণ ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পশ্চিমবাংলাসহ উত্তর ভারতের সবকটি রাজ্যে কংগ্রেসত্যাগী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। আর এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রেই সারা রাজ্যে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের মধ্যে এমন এক রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হয়, যা ২৫ বছর পরেও এখনও অটুট আছে।

কিন্তু যে গণচেতনা, সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি মমত্ববোধ একদা এই রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মৌল লক্ষণ ছিল, রাজনৈতিক দল ও কর্মিদের কাজকর্মের পরিধি নির্ণয় করে দিত, সেটা আগের মতো আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। তাই বিগত ২৫ বছরে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চেহারা এবং গতিমুখ বদলে গেছে কিনা সেটা কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। সেই পর্বগুলি হলো (১) যুক্তফ্রণ্টের রাজনীতি—১৯৬৭-৭০ এর মার্চ-এপ্রিল; (২) ফ্রণ্ট রাজনীতির ভাঙ্গন ও অস্থিরতার পর্ব—১৯৭০ এর এপ্রিল থেকে ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারী মার্চ; (৩) নকশাল রাজনীতির পর্ব—১৯৬৭ এর মধ্যভাগ থেকে ১৯৭৫-৭৬ এর শেষ; (৪) কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়ার পর্ব ১৯৭২-১৯৭৭ এর মার্চ-এপ্রিল; এবং (৫) বামফ্রণ্টের শাসন—১৯৭৭ এর মে-জুন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

তিন

যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি(১৯৬৭-৭০) এই রাজ্যের রাজনীতিতে কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দুই দশক ধরেই তার প্রস্তুতি পর্ব চলে ছিল। এই রাজ্যে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা যেদিন শেষ হয়, সেদিনের শহর কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা এবং দূর মফস্বলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বোধহয় একমাত্র ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের বিশেষ দিনটির তুলনা করা যেতে পারে। এই রাজ্যে বিকল্প শাসন প্রতিষ্ঠা মানুষের কতোটা কাম্য ছিল সেদিন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দী বলয়ের অন্য যে সব রাজ্যে তখন অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, সেখানকার বিধানসভাগুলিতে "সংযুক্ত বিধায়ক দল" নাম দিয়ে যে কংগ্রেস বিরোধী পার্লামেন্টারী জোট গড়ে ওঠে তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের মূলে তফাৎ ছিল।

বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতির মেজাজ ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ তখন যেমন অভূতপূর্ব ঋজুতা প্রকাশ করে তেমনই প্রত্যাশার বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই ঋজুতা দেখা গিয়েছিল প্রথম যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রিয় সরকার ভেঙ্গে দেওয়ায় যখন এই রাজ্যের প্রতিবাদী মানুষ "রাস্তাই একমাত্র রাস্তা" মনে করে মিছিল, আন্দোলনে সামিল হয়। একটা পুতুল সরকারকে খিড়কীর দরজা দিয়ে গদিতে বসানোর অপচেষ্টা তারা মানতে চায়নি। আর প্রত্যাশার বিস্ফোরণ দেখা যায় শ্রমিকদের "ঘেরাও" আন্দোলনে, কৃষকদের জমি দখলের সংগ্রামে। একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি নয় যে নকশালবাড়ী আন্দোলনের সূচনা প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সম্ভবত বিলম্বিত হতো। সন্দেহ নেই ঘেরাও ও জমি দখলের লড়াইয়ে সেদিন অনেক আতিশয্য, বাড়াবাড়ি ঘটেছে। কিন্তু সেটা ছিল এই রাজ্যে বিকল্প রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার হঠাৎ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাওয়ার জন্য, এবং অনভিজ্ঞতার জন্য।

কিন্তু ভ্রান্তি সত্ত্বেও স্বীকার্য যে, বিকল্প রাজনৈতিক সংস্কৃতি চেতনা অত্যন্ত তীব্র না হলে সেদিন কংগ্রেস বিরোধী দুই স্বতন্ত্র বাম নির্বাচনী জোট, ULF আর PULF, নির্বাচনের পরেই তাদের তীব্র বিরোধিতা ভুলে গিয়ে একজোট হতো না। না, সেটা ক্ষমতা দখলের কোন সুবিধাবাদী তাগিদ থেকে ঘটেনি। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তে এই রাজ্যের কোন প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী দল যোগ দেয়নি। তারা নির্বাচনে জনগণের অকংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠার যে নির্দেশ কংগ্রেসের

সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর মধ্যে প্রমাণিত হয়, সেই নির্দেশকেই শিরোধার্য করে। "আয়া রাম, গয়া রামের" রাজনীতি তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই রাজ্যের বামপন্থী বিধায়ক ও সাংসদদের দলে টানতে পারেনি। এটাই হলো বাঙালির সমকালের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বলিষ্ঠ বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মতাদর্শ নিষ্ঠার দিক।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার পনেরো মাস পরে মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি প্রমাণ করে তার রাজনৈতিক চেতনা ও বিশ্বাসে বিকল্প ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ কোন তাৎক্ষণিক বিষয় ছিল না। বস্তুত এই রাজ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের এই বিশিষ্ট দিকটি তখন থেকে এ পর্যন্ত মোটামুটি বজায় রয়েছে। তার পিছনে তাগিদ হিসেবে কাজ করেছে যুক্তফ্রন্ট সমাজে ও প্রশাসনে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করার উপযোগী বলে গড়ে ওঠা একটা বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বস্তুভিত্তি কি ছিল তা নিয়ে চুলচেরা তর্ক হতে পারে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য নির্বাচকরা তাদের ঈপ্সীত লক্ষ্যের দিকে এই বিকল্প ব্যবস্থা অগ্রসর হতে সাহায্য করবে এই ধারণার বশবর্তী হয়েই কাজ করেছিল। যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে মতভেদ, দ্বন্দ্ব সেই সূত্রেই মাথা চাড়া দেয়।

যুক্তফ্রন্টের শরিকদের একটি বড়ো অংশ এই প্রেক্ষিতে মনে করতে থাকেন শ্রেণী আন্দোলন জোরদার করার সময় এসে গিয়েছে। আরেক অংশ মনে করতে থাকেন যুক্তফ্রন্ট শ্রেণী সংঘাত অহেতুক বাড়িয়ে চলেছে, সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যা মোটেই অপরিহার্য নয়। ফলে প্রথম অংশের কাছে মনে হতে থাকে আর পাঁচমেশালী ফ্রন্ট নয়, এখন দরকার হলো শ্রেণী ভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা। প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট যেখানে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, নিছক এই রাজ্যস্তরে আবদ্ধ থাকলেও যার প্রভাব দেশজোড়া হতে পারতো, সেই সম্ভাবনা প্রায় তার জন্ম মুহূর্তে প্রবল ধাক্কা খায়। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার এই যুক্তফ্রন্ট ছিল এই রাজ্যের সমস্ত বামপন্থী শক্তি এবং কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা বাংলা কংগ্রেসের মতো গণতান্ত্রিক শক্তির জোট। এই বাংলা কংগ্রেসই ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের পরাজয়ে অনুঘটকের কাজ করে।

সেই সময়ে বাংলার বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে যে কথা শোনা গিয়েছিল তাহলো যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিতে "যুক্ত কমাণ্ড" প্রতিষ্ঠার কথা, একটা সর্বনিম্ন

কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই রাজ্যের পরিসরে কাজ করার কথা। সেই যুক্তকমাণ্ড কায়েম করা গেলে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যুক্ত হতো! তা করা যায়নি এবং যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিঘাতেই এই সরকারের পতন ঘটে। পরপর দুটি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা বাঙালিকে এই বিশ্বাসে প্রাণিত করে যে, নির্বাচনের মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব। সংসদীয় রাজনীতির দিকে বামপন্থী শক্তি সমূহের আকর্ষণ গড়ে তুলতে এই পর্বের রাজনীতি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। বাঙালির রাজনৈতিক-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দিক থেকে এই চেতনার উদ্ভব ও প্রসার বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়।

চার

ফ্রণ্ট রাজনীতির ভাঙ্গন পশ্চিমবাংলায় এক অস্থিরতার সূচনা করে যা চলেছিল প্রকৃত প্রস্তাবে বামফ্রণ্টের শাসন প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত। এই অস্থিরতার মূলে ছিল বামপন্থী বিকল্পকে একটা স্বীকৃত রূপ দেওয়ার তাগিদ। যুক্তফ্রণ্ট এই রাজ্যে সর্ব প্রথম একটা বিকল্প রাজনীতির পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ এনেছিল, তা ব্যর্থ হলেও সেই প্রচেষ্টার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে অনেকদিন। যুক্তফ্রণ্টের রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই পশ্চিমবাংলায় নিম্নবর্গের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার যুগ সুরু হয়। সন্দেহ নেই প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে এবং স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে দেশে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণীগত আন্দোলন ও সংগ্রাম মাঝে মাঝেই ইতিহাস সৃষ্টির মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্গের স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি তাদের মধ্য দিয়ে আসেনি। তখনো বোঝা যায়নি শাসক শ্রেণীকে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরাজিত করা না গেলেও পিছু হঠতে বাধ্য করা যাবে কিনা। যুক্তফ্রণ্ট শাসকশ্রেণীকে পরাজিত করার দুঃস্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু তাকে কোনঠাসা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। সেই পরিস্থিতিই ছিল নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের অনুকূল। তাই যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে গেলেও নিম্নবর্গ তার পুরানো অবস্থানে আর ফিরে যায় নি। দেশের শাসক শ্রেণীর কাছেও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিস্থিতিটা কাজে লাগানোর আগ্রহ দেখা যায়। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ এর মধ্যে ইন্দিরার পপুলিস্ট শ্লোগানগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তনের প্রশ্নের, সমালোচনার জন্ম দেয়, যা নকশালদের অতি বিপ্লবী হঠকারিতা দেখা না দিলে এখনকার চিন্তা চেতনাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার সুযোগ সৃষ্টি

করতে পারতো। নকশাল আন্দোলন সেই সুযোগ নিতে কিম্বা দিতে চায়নি।

হাওয়া লেগেছে পপুলিস্ট নীতিতে তাকে আরো র‍্যাডিকাল দিকে টানার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের "দক্ষিণপন্থী" নেতৃত্বকে ঘায়েল করা যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। বস্তুত একদিক থেকে দেখতে গেলে চতুর্থ সাধারন নির্বাচন সারাদেশেই একটা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগত অস্থিরতার সূচনা করে আর্থ-সামাজিক কারণগুলির সহযোগে যা তখন দিকপরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গন এই রাজ্যে সেই অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

পাঁচ

যুক্তফ্রণ্টের রাজনীতির বৃত্তেই নকশালপন্থী রাজনীতির উদ্ভব সেকথা আগেই বলা হয়েছে। নকশাল রাজনীতি যুক্তফ্রন্টকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে অগ্রসর হতে পারলে এই রাজ্যের পরিস্থিতি কি হতো সেটা গবেষণার বিষয়। ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নকশাল-পন্থায় যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের কাছে এটাই সত্য হয়ে উঠেছিল যে দেশে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম এখনই এই রাজ্য থেকে সুরু করা সম্ভব এবং অত্যন্ত জরুরী কাজ। বলা বাহুল্য যুক্তফ্রণ্টের কোন শরিক দল এই বিশ্লেষণ মানতে পারেন নি। যুক্তফ্রন্টকে একটা হাতিয়ার হিসাবে আরো কিছু কাল ব্যবহার করা এবং তার জন্য নির্বাচনী রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল। ফলে ১৯৬৯ সাল থেকেই এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি 'নির্বাচন না বন্দুক' এই বিপরীত মেরুর টানাপোড়েনে ক্রমাগত আলোড়িত হতে থাকে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নকশালপন্থী আন্দোলনের যে পথনির্দেশ দিয়েছে বলে তখন মনে করা হতো, সেই বিশ্বাসে সংসদীয় পথ পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। নকশালরা নিম্নবর্গের আন্দোলনে তাদের নেতৃত্ব কায়েম করতে তৎপর হয়।

ফলে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এক বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। তার মূলধারা একটা চরম প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের ঐতিহ্য বিরোধী, জঙ্গীরূপ নিতে থাকে, বাঙালি সমাজ যার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অথচ প্রথম পর্বের নকশালপন্থীদের আদর্শনিষ্ঠায় কারো সংশয় না থাকায় এই নেতৃত্বের বিপ্লবীয়ানায় রাজনীতি সচেতন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। অধিকাংশ বামপন্থীদলের সদস্য ও সমর্থকদের এই দিশেহারা মনোভাব অনেক

'সত্তরের দশক মুক্তির দশক' এই জিগিরে 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস' মাওয়ের এক বিখ্যাত মন্তব্যের অতি সরলীকরণ করে তারা 'চীনের পথ আমাদের পথ' এবং 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে এক বিশেষ ধরণের সংগ্রামের পথ বেছে নেয়, এই রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে যার প্রতি সমর্থনের কোন বাস্তব কিম্বা মনোগত ভিত্তি ছিল না। বামপন্থী দল ও শক্তিসমূহের কোন পক্ষই এই অপরিচিত, অতিজঙ্গী কর্মসূচীর মধ্যে নিজেদের সামিল করার তাগিদ খুঁজে পায়নি। নকশালপন্থীরা শহর থেকে সরে গিয়ে গ্রামে, জনসংখ্যার সবচেয়ে নিপীড়িত অংশের মধ্যে কাজ করতে সুরু করলেও, সেই সব মানুষদের রাজনৈতিক চেতনার মান অত্যন্ত নীচু, এবং তারা মূলত অসংগঠিত থাকায় নকশালদের উদ্যোগ আয়োজন আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারে নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এই রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যবিত্ত শহরকেন্দ্রিক ঘরানা।

অবশ্য স্বীকার্য নকশালপন্থীরা এই রাজ্যের কোন অঞ্চলে নিম্নবর্গের মনে যে পরিবর্তনের হাওয়া এসেছিল তাকে আরো কিছুটা জোরালো করতে পেরেছিল এবং তাদের জঙ্গীনীতি ব্যক্তিগত ভাবে কোন অত্যাচারী, অনাচারী জোতদার মহাজনকে শায়েস্তা করে, হত্যা করে এমন একটা উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যাতে অল্পকালের জন্য হলেও কোথাও কোথাও "মুক্তাঞ্চলের পরিবেশ" কায়েম হয়েছে বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রক্ষমতার মোকাবিলা করার মতো দক্ষ নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না থাকায় এই মুক্তাঞ্চলের ধারণা, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার নীতি, ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাস বহু ক্ষেত্রেই উপায় না থেকে উপেয় হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতি-সচেতন বাঙালি এতোদূর যেতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে শহরে ও গ্রামে জনসংখ্যার যে অংশে নকশালবাড়ীর পথ আরেকটা পথ বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা ছিল, সেই সমর্থনের সামাজিক ভিত্তি সঙ্কুচিত হতে সুরু করে।

নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক চেতনার আন্তর্জাতিক দিক এই রাজ্যের রাজনীতি-সচেতন মানুষের বড়ো অংশ মেনে নিতে পারেনি। সোভিয়েত তথা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী সম্পর্কে তাদের চরম বিরূপতা এদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বোধ ও স্বার্থের সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ ছিল। চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সুস্থিত থাকলে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব হঠকারী হয়ে না পড়লে, ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হলে, আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে চীনের নীতি সমর্থক থাকলে, বাঙালির রাজনৈতিক চেতনায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ

বিরোধিতা এবং আন্তর্জাতিক সংহতির যে সুস্থধারা রয়েছে, সেটি জাতীয় পরিসরে নকশালবাড়ীর পথকে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ দিতে পারতো। এই আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সেটা হওয়ার সুযোগ ছিল না।

নকশালপন্থীদের মধ্যেও স্বল্পমেয়াদী জঙ্গী কর্মসূচীর সাফল্য সম্পর্কে আত্যন্তিক বিশ্বাস যখন ব্যর্থ হতে সুরু করে তখন তার স্বাভাবিক বিপরীত-মুখি প্রতিক্রিয়ায় যেমন ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দেয়, নানা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে, তেমনই চরম সন্ত্রাস সৃষ্টির খেলায়, ব্যক্তিহত্যার কানাগলিতে, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননায় মুণ্ডচ্ছেদের নীতি বাঙালির রাজনৈতিক চেতনায় জঘণ্য অনাচার বলে মনে হয়। নকশালপন্থীদের সেই রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে সব রকমের লুম্পেনরা ব্যাপকভাবে তাদের দলে ও গোষ্ঠীতে ঢুকে পড়ে, সরকার ও শাসক গোষ্ঠী যার সুযোগ নেয়। পশ্চিমবাংলায় বিগত ২৫ বছরের মধ্যে যে পাঁচ বছর কংগ্রেস শাসন ছিল তার ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই আন্দোলনের মধ্যে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক অগ্রগতির যে প্রতিশ্রুতিটুকু ছিল তাকেই নকশালদের ভ্রান্ত insurgency তত্ত্বের মোকাবিলায় Counter insurgency-র নীতিকে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করে যথাসাধ্য পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ছয়

১৯৬৭'র পাঁচ বছর পর ১৯৭২ সালের নির্বাচনে যখন পুরোদস্তুর কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তার পিছনে নীতির দিক থেকে ইন্দিরার 'গরিবী হটাও' এর আবেদন, আবেগের দিক থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ইন্দিরার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য, এবং পদ্ধতির দিক থেকে বাছাই করা ৫০টি কেন্দ্রে নির্বাচনী কারচুপির ব্যাপক প্রয়োগ কাজ করেছিল। দেশের রাজনীতিতে ইতিপূর্বেই যে র‍্যাডিকাল ধারা দেখা দিতে থাকে এই নির্বাচনে কংগ্রেস-সি পি আই জোট গড়ে ওঠায় জনগণের কিছু অংশে তাকেই বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প বলে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাও অংশত কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। নির্বাচকদের একাংশে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির' দ্বন্দ্ব এবং নকশালদের অতি বিপ্লবীপনা অশ্রদ্ধেয় মনে হওয়ায় একটা বীতশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এজাতীয় ধন্দে এর আগে পড়েনি। কংগ্রেসের শাসন এর সবটুকু কাজে লাগাতে চায়।

কিন্তু এই কংগ্রেসী সরকারের নায়করা পশ্চিমবাংলায় মানুষের মনে যে পরিবর্তন এর মধ্যেই ঘটে গিয়েছে তার গভীরতা ও ব্যাপকতা বুঝতে পারেননি। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন এই রাজ্যের মানুষ নানা দলের খিচুড়ী রাজনীতিতে আর আকৃষ্ট হবে না, বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অভ্যস্ত রীতিনীতি মেনে কংগ্রেসকেই তাদের পরিত্রাতা বলে মনে করবে। ফলে সারাদেশের পরিস্থিতির জটিলতা, পরিবর্তনের আগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক সংকটের অভিঘাত কেন্দ্রিয় সরকারের পপুলিস্ট নীতির আন্তর দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলে তাকে যে ক্রমাগত স্বৈরাচারী পথে যেতে বাধ্য করবে, সেটি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। ফলে পশ্চিমবাংলায় সরকার যখন নকশালপন্থীদের ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসের মোকাবিলায় Counter-insurgeucy'র পথকে ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে সমস্ত বামপন্থী প্রতিপক্ষকেই কোণঠাসা ও আক্রমণ করতে সুরু করে, এবং জরুরী অবস্থার সময়ে যখন সেই নীতি লাগাম-ছেঁড়া স্বৈরাচারে পরিণত হয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধকে চূর্ণ করতে থাকে; তখনই বাঙালি মানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে যায়।

জরুরী অবস্থার কল্যাণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন; নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের জন্য জনমতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞানতা, রাজনৈতিক ভাবে রাজ্যশাসনের বদলে প্রশাসনিক পদ্ধতির উপর একান্ত আস্থা, তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্বের বিচারশক্তির ঘাটতি, উদাসীনতা, সাধারণ মানুষ ও সরকারের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, এই রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তা ছিল অভূতপূর্ব। ১৯৭৭ এর সাধারণ নির্বাচনে একেবারে ধ্বসের আকারে সেই বাস্তবতা কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত এবং অভিভূত করে। প্রসঙ্গত বলা দরকার সংসদীয় পথ গ্রহণ করেও শাসকদল হিসাবে কংগ্রেস এই রাজনৈতিক মানসিকতা অন্তত সেই সময় পর্যন্ত গড়ে তুলতে চায়নি যে নির্বাচনে মানুষ কোন সরকারকেই চিরকালীন ভিত্তিতে কায়েম রাখতে নাও পারে। সরকারে থাকতে গেলে জনগণের সঙ্গে থাকতে হয়, কেবল নেতা হয়ে থাকা যায় না। বাঙালির রাজনীতি চেতনা ততোদিনে সেই স্তরে উন্নীত হয়েছে যেখানে রাজনীতিতে পুরানো পুঁজির শক্তি নিঃশেষিত, মানুষ নতুন নীতি, মত ও পথ খুঁজছে, সারাভারতে না হলেও অন্তত এই রাজ্যে।

সাত

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠা ঠিক সেই সময়ের প্রেক্ষিতে

জনগণের কংগ্রেস বিরোধী চেতনার প্রকাশ অর্থাৎ নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া বলে মনে হলেও, ১৯৮২, '৮৭ এবং '৯১র নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে বিকল্প সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এই নেতিবাচক মনোভাবের পিছনে প্রবল ভাবেই ছিল। শুধু ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করলেই সেটা বোঝা যাবে। বামফ্রন্টে সি. পি. আই (এম) এর প্রাধান্য, অনেক সময় কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব ও আচরণ ইত্যাদি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য কোন শরিকই ফ্রন্ট ছেড়ে যেতে চায় না এবং এই দলও শরিক বিতাড়ন করতে চায় না। সি. পি. আই যে বাম রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে আসতে চেয়েছিল, সেটাও এই প্রবণতার জোর প্রমাণ করে, কারণ ব্যতিক্রমে ক্ষতি সকলের। এটাকে ক্ষমতার ভাগ, লোভ ইত্যাদি সরলীকৃত নানা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হলেও এই সত্যিটুকু মানতে হবে এই, রাজ্যের মানুষ চেতনা ও মূল্যবোধের রাজনৈতিক এক বিশিষ্ট মানে বিশ্বাসী, সেখানে বামপন্থার সপক্ষে-তার সহমর্মিতা অনস্বীকার্য। ক্ষমতা হারানোর পর কেন রাজ্য ও সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে ব্যাপক ভাবে কাজে লাগিয়েও কংগ্রেস এই রাজ্যে গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের কাছে আস্থাভাজন হয়ে উঠতে, বামফ্রন্টের বিকল্প হয়ে উঠতে পারছে না, সেটাও বোঝা দরকার। মুখ্যমন্ত্রীরূপে জ্যোতিবসুর ক্যারিস্‌মা নিশ্চয়ই তাঁর নিজের বা দলের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের এমন এক সদর্থক প্রকাশ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ফ্রন্টের নেতারূপে তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিফলিত বলে মানুষ মনে করে যে, কোন বিকল্প গড়ে উঠতে পারছে না। সন্দেহ নেই এটা যেমন বামফ্রন্টের শক্তির, তেমনই ভবিষ্যৎ দুর্বলতার দিক।

কিন্তু বিগত পনেরো বছরে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এই শাসনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যে, অ-বাম কোন নীতি বা কর্মসূচী মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। হয়তো বা এর মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালির বিগত দশকগুলির রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার, প্রত্যাশা, বিশ্বাসের একটা সামগ্রিক চেহারা ধরা পড়েছে। হয়তো বাঙালির কেন্দ্র-বিরোধী, anti-e tablishment মানসিকতা ফ্রন্টের নেতা ও নেতৃত্বের কাজের মধ্যে আশু তৃপ্তি লাভ করেছে। বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় এই রাজ্যের মানুষ তাদের মর্জি, রুচি, বিশ্বাস, মূল্যবোধের যে কাঠামো দীর্ঘকাল ধরে গড়ে তুলেছে, অনেক ব্যর্থতা, হতাশা, ক্ষোভ এমন কি ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও সেখানে কোন ব্যাপক ঘাটতি, অসঙ্গতি এখনও দেখা

যায়নি বলেই মানুষ বিশ্বাস করে। এটাই হলো ফ্রন্টের রাজনীতির বুনিয়াদী শক্তির দিক, যার সবটাই ফ্রন্টের তৈরী করা নয়, বরং অনেকটাই উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া।

একই সঙ্গে বলা দরকার বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের যে বলিষ্ঠ, সদর্থক দিক এই রাজ্যের রাজনীতির মূল পুঁজি সেখানে ধীরে কিন্তু ধারাবাহিক ও জোরালো ভাবে কিছু পরিবর্তনের ধাক্কা লাগতে সুরু করেছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে তাদের উল্লেখ করা যেতে পারে:

প্রথমত, বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আর নৈতিকতা, চারিত্রিক ঋজুতা, সততা, সদাচার, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিকে নীতিসুধার বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না।

দ্বিতীয়ত, মতাদর্শের দিক বাঙালির রাজনীতি চেতনা সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আনুগত্য দেখিয়ে চলার চেষ্টা করলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেগেটিভ বৈশিষ্ট্যগুলি হয়তো দলসমূহ ও নেতৃত্বের অলক্ষ্যে কিম্বা উদাসীনতায় অথবা প্রশ্রয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে। দুর্নীতিকে জলচল করে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টায় আমরা সবাই শরিক।

তৃতীয়ত, একটা চরম সুবিধাবাদী ও ভোগবাদী মানসিকতাকে উন্নত জীবনমানের নামে শহরবাসী শিক্ষিত বাঙালি স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করেছে। তাই সব কিছু মেনে নেওয়া এবং মানিয়েনেওয়ার একটা প্রবণতা এই মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনাকে তার প্রতিবাদী চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট করেছে। অদ্ভুদ্‌ভাবে বাঙালি সমাজ জীবনে line of least নয় no resistanceকে জীবনবোধে, আচরণনীতিতে প্রায় ধ্রুব জ্ঞান করতে সুরু করেছে।

চতুর্থত, বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা বর্তমানে একান্ত ভাবেই দলমুখী। তার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলি দলীয় লাইন ধরেই চলে, অন্তত সমাজের সংগঠিত অংশে সেটাই প্রকট।

পঞ্চমত, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সমস্ত সমালোচনা করেও বাঙালি চেতনায় আমলাতন্ত্রের বিশেষত আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার ব্যাপক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যার যেখানে যতোটুকু ক্ষমতা ও প্রভাব আছে তাকে নানাভাবে জাহির করাই হলো মানুষের লক্ষ্য। তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ থাক বা না থাক, সেটা গৌণ বিষয়।

ষষ্ঠত, বাঙালি চরিত্রের একটা বিরাট স্ববিরোধী রূপ একালে প্রকট। তাহলো দলগত প্রাধান্যকে মেনে নিয়েও সাধারণ মানুষ এখন যতোটা ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যবাদী তেমনটি আগে কখনো ছিল না। এই চেতনাই বাঙালিকে মনের দিক থেকে রক্ষণশীল, স্থিতাবস্থাপন্থী করে তুলেছে; যে পরিবর্তনে ভয় পায়। চলছে চলবে কথাটা মিছিলে সংগ্রামের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা হলেও জীবনে, সমাজে সেটা সংরক্ষণবাদের আকারেই প্রকাশ পাচ্ছে।

সপ্তমত, বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতি তার আচরণে, মানসিক প্রতিক্রিয়ায় অভ্যাসের, অভ্যস্ততার গণ্ডিকে ছেড়ে যেতে চায় না। ভোট দেওয়া, বন্ধের ডাকে সাড়া দেওয়া, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনাকে মেঠো পর্যায়ে নামিয়ে আনা, একথায় চিন্তার ব্যাপক দীনতাকে কাটিয়ে ওঠার অনীহা এখন যেমন দেখা যায় কিছুকাল আগেও তা অভাবনীয় ছিল।

এই ধরণের বৈশিষ্ট্যের তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। কারণ এই বিষয়গুলির কথা সবাই বলে, সব সময়েই বলে। কিন্তু রোগের লক্ষণ নির্ণয় আর নিরাময়ের ব্যবস্থার জন্য সমবেত উদ্যোগ এক কথা নয়। বাঙালি রাজনীতির একটা চারিত্রিক লক্ষণ ছিল মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী। এখন তার স্থান নিয়েছে বিশ্বাস, তার পিছনে যুক্তি, বুদ্ধি ও বস্তুভিত্তি থাক্ বা না থাক্। এই চিত্তদৈন্য বাংলার নবজাগ্রত নিম্নবর্গের মধ্যে দেখা দিলে সেটা কম আশ্চর্যের বিষয় হতো। সেটা দেখা দিচ্ছে বাঙালি সমাজের মধ্যবিত্ত অংশে, যেখানে ভোগবাদ থেকে মৌলবাদ সব কিছুরই ছায়া বড়ো আকারে পড়তে সুরু করেছে। সেকুলার মানসিকতা নিয়ে গর্বিত বাঙালি এখন যেভাবে গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মৌলবাদী প্রচারের শিকার, সেখানে সংশয় জাগে তার সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধে পশ্চাৎমুখীনতার বীজ এতো বড়ো মাপের প্রগতি আন্দোলনের পরেও থেকে গিয়েছিল কিভাবে?

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের সমবয়সী। গণতন্ত্র ব্যক্তির মূল্য স্বীকার করে, ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। দেশের বা সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও তেমনি সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তি চেতনার সাযুজ্য ঘটায়, তার সমীকরণে সাহায্য করে। বাঙালি সমাজে ও রাজনীতিতে যখন মধ্যবিত্তের একছত্র প্রাধান্য ছিল তখন তার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে নিম্নবর্গের ব্যাপক অংশগ্রহণ তার প্রেক্ষিত বদলে দিয়ে বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তবু মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয় এই বিকল্পকে কিছুটা বেপথু করেছে বলেই মনে হয়। আজকের সমাজজীবনে তার ছাপ সুস্পষ্ট।

গণতন্ত্র, রাজনীতি চেতনা মানুষকে নিজেকে দেখতে শেখায় সমাজের পটভূমিতে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সেটাই বিশেষ অবদান। সেটা একটা কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে মানুষকে চলতে প্রাণিত করে। অন্তত ভারতের মতো রাষ্ট্রে, পশ্চিমবাংলার মতো রাজ্যে সেটাই হলো জনজীবনের মূল চেহারা। তারই অন্য নাম সমাজ সচেতনতা, যা এখানকার অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এখন সেটা নিয়েই আশংকা ও সংশয় দেখা দিচ্ছে।

পরিচয়

পঁচিশ বছরের সাহিত্য সময় সংস্কৃতি

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধবিদ্যা সংগ্রহ

* বাঙালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫ টাকা
* বাঙালীর ভাষা ঃ সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন ১৫ টাকা
* বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্তঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৮ টাকা
* কলকাতা তিনশতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর ১২ টাকা
* ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার ৮ টাকা

জীবনীগ্রন্থমালা

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য ৫ টাকা
* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিজিতকুমার দত্ত ২ টাকা
* রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত ৮ টাকা
* সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত ৩ টাকা
* সুকুমার : লীলা মজুমদার ১৪ টাকা
* বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ সরোজ দত্ত ১০ টাকা

সংকলনগ্রন্থ

* সুকুমার পরিক্রমা ঃ পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০ টাকা
* প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ ৪৫ টাকা
* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ ৫০ টাকা

মুখপত্র

* আকাদেমি পত্রিকা ১ ঃ অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

* আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১/১ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
* ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউণ্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
* মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
* দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
* আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা, কল-৭০০ ০১০

মে দিবস

শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতি
দীর্ঘজীবী হোক্

"ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন—গুন্ গুন্ স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র-ধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে॥"

"ওরা কাজ করে"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

"...ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

......রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ...............

SANKHA GHOSH

Emperor Babur's Prayer and Other Poems

translated with an introduction Kalyan Ray

Cover Design : Purnendu Pattrea — Rs. 50·00

NIRENDRANATH CHAKRAVARTI

The King without Clothes

tr. Sukanta Chaudhuri

Cover Design : Purnendu Pattrea — Rs. 20·00

BISHNU DEY

History's Tragic Exultation

tr. Bishnu Dey and others

Cover Design : Hemanta Mishra

First Akademi Edition — Rs. 50·00

SAHITYA AKADEMI

Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road,
New Delhi-1

Jeevantara Bhavan, 23A/44X, Diamond Harbour Road,
Calcutta-53 (Ph : 49-7406)